শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ষোড়শ ভাগ

গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ষোড়শ ভাগ

মানুষের মন চায় আনন্দ, খোঁজে শান্তির নীড়। অনন্ত তার যাত্রা 'চির আপনের' সন্ধানে। মা আমাদের সেই চির আপন। অতি নিবিড় স্নেহের বন্ধনে আমরা সকলে মায়ের সঙ্গে বাঁধা। কত শোকসন্তপ্ত মন তাঁর চরণ-ছায়ায় এসে পায় শান্তির আস্বাদ। কত অভাগা তাঁর মাঝে পায় সমস্ত জীবনের সার্থকতা।

শ্রীমা'র ভাগবতী ভ্রমণলীলার প্রবাহ দেশ দেশান্তর প্লাবিত করে চলেছে। এই গ্রন্থ তারই এক অংশ মাত্র।

এই ভাগে আগরপাড়া, দিল্লী, কাশী, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, এলাহাবাদ, পুণা, বাঙ্গালোর, বৃন্দাবন, জয়পুর, শুকতাল, দেরাদুন প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং পণ্ডিত নেহরু, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জগৎগুরু শংকরাচার্য্য প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎকার ও কথাবার্ত্তা এবং নানা ভ্রমণ ইতিহাসের সাথে সাথে অমূল্য উপদেশ ও বাণীর প্রকাশনের মাধ্যমে মায়ের আত্মপরিচয়ও ফুটে উঠেছে।

[জানুয়ারী ১৯৬১—ডিসেম্বর ১৯৬৩]

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ষোড়শ ভাগ

[জানুয়ারী ১৯৬১—ডিসেম্বর ১৯৬৩]

গুরুপ্রিয়া দেবী

প্রকাশক :
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ
ভাদাইনী, বারাণসী।

প্রথম সংস্করণ
মে, ১৯৭৩

মূল্য—চার টাকা

মুদ্রক :
বৈদ্যনাথ দত্ত
দি ইউরেকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় এবং আশীর্ব্বাদে শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী (দিদি) লিখিত "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী" গ্রন্থের ষোড়শ ভাগ প্রকাশিত হইল।

অনুক্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের সেবাকর্ম্ম এবং আশ্রম-সংক্রান্ত নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও লেখিকা মায়ের জীবনের ঘটনাবলী ও উপদেশাদি যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভক্তবৃন্দের বিদিত আছে। তাঁহাদের নিকট এই পুস্তকের সকল খণ্ডই অমূল্য সম্পদ।

গ্রন্থের বর্ত্তমান খণ্ডে ১৯৬১ হইতে ১৯৬৩ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ তিন বৎসরের শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকথা স্থান পাইয়াছে। পুস্তকের বাঁধাই, আবরণ পৃষ্ঠা এবং চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকটি যথাসাধ্য সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অক্ষয় তৃতীয়া
মে, ১৯৭৩

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

আগরপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীমা	...	১
হরিদ্বারে শিবরাত্রি	...	১২
কুসুম, ভরত ও তপনের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচার্য্য ব্রত গ্রহণ ও নামকরণ	...	১৯
জলন্ধর ও হোসিয়ারপুরে শ্রীশ্রীমা	...	৩৫
হরিদ্বারে ভাগবৎসপ্তাহ ও নবাহ রামায়ণ পাঠ	...	৪১
এলাহাবাদে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং ইন্দিরাজী সহ পণ্ডিত নেহরুর সৎসঙ্গে যোগদান ও মাতৃদর্শন	...	৪৭
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথজীর অসুস্থতা, বম্বেতে অপারেশান ও অলৌকিক ভাবে জীবন রক্ষা	...	৫৩
পুণায় মাতৃসকাশে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শিবপ্রকাশ এবং নানা প্রশ্নোত্তর	...	৬৩
শ্রীমার বাঙ্গালোর গমন ও অপূর্ব্ব সৎসঙ্গ	...	৭৭
কলিকাতায় গুরু পূর্ণিমা	...	৮২
বৃন্দাবনে ঝুলন পূর্ণিমা	...	৮৭
বাঘাট হাউসে জন্মাষ্টমী	...	৯২
দিল্লীতে মাতৃসকাশে ইন্দিরাজী	..	৯৪
শ্রীমার জয়পুরে আগমন	...	৯৯
বিশেষ আহ্বানে পণ্ডিত নেহরুর গৃহে মায়ের আগমন	...	১০৫
কানপুরে স্বদেশী হাউসে দুর্গাপূজা	...	১০৯
শুকতালে দ্বাদশ সংযম সপ্তাহ মহাব্রত	...	১১৮
বাজিতপুরের একটি ঘটনা	...	১২৯

স্পর্শদোষে শক্তিক্ষয় ... ১৫৩
বিশ্বজোড়াই মায়ের আশ্রম ... ১৫৭
জপে মন বসে না ... ১৬৩
একটি অলৌকিক ঘটনা ... ১৬৬
কাশীতে অর্দ্ধোদয় যোগ ও ভাগবত সপ্তাহ ... ১৭০
হরিদ্বারে শিবরাত্রি ও পূর্ণকুম্ভ ... ১৭৪
ক্রিয়া যোগ ও ক্রিয়া ভোগ ... ১৭৮
দোলপূর্ণিমাতে মা'র বাঁধ যাত্রা ... ১৮২
মাকে নিয়া হরিদ্বারে শোভাযাত্রা ... ১৮৮
দেরাদুনে মায়ের জন্মোৎসব ও তিথিপূজা ... ১৯২
জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য্যের মায়ের নিকট আগমন ... ১৯৮
শিবমন্দিরই এ শরীরের ঘর ... ২০৩
পরমার্থ ভাগবতী সংঘ ... ২১১
কিষণপুরে ঝুলন পূর্ণিমা ... ২১৫
কনখলে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব ... ২১৭
মায়ের বিচিত্র ভাব ... ২১৯
কলিকাতায় দুর্গাপূজা ... ২২১
বৃন্দাবনে গীতাজয়ন্তী ... ২২৩
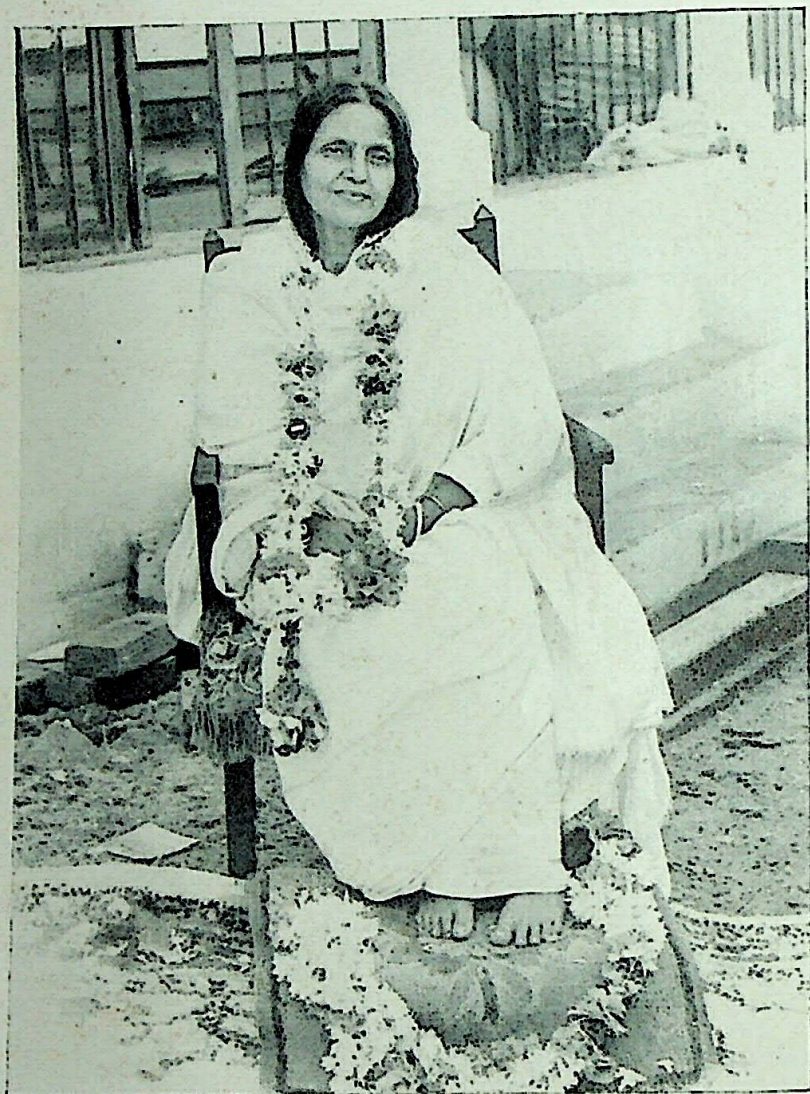
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী
ষোড়শ ভাগ

১লা জানুয়ারী ১৯৬১।

মা আগড়পাড়া আশ্রমেই আছেন। বেলা প্রায় ১১টায় ও বৈকাল ৫টায় এবং রাত্রিকালে মৌনের পূর্ব্বে মা দোতলার বড় 'হল'-ঘরে বসেন। তখন বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়। প্রতিদিন প্রসাদও পাইতেছে অনেক লোক—কমবেশী ২।৩ শত। আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে।

৮ই জানুয়ারী ১৯৬১।

২।৩ দিন যাবৎ মায়ের শ্বাসের গতি একটু খারাপ চলিতেছে। কিন্তু ইহা লইয়াই হাসি খুশী আনন্দ। বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই।

৯ই জানুয়ারী ১৯৬১।

আজ মায়ের শরীর একটু বেশী খারাপ চলিল। অন্যান্য দিন হইতে একটু কড়া নিয়ম করিয়া মাকে বিশ্রাম দেওয়ার চেষ্টা হইল। খাওয়ার শোওয়ার ভাবই নাই। খাওয়াইতে বসিলাম; বলিলেন 'ভিতরে নিতেছে

না।' আবার আস্তে আস্তে বলিতেছেন—"দেখ্, শরীর আজ কি রকম যেন—ময়দা মাথার ভিতর বেশী জল পড়িয়া গেলে যেমন ময়দা নেতিয়ে পড়ে, শরীরও সেই রকম যেন নেতিয়ে পড়তে চায়, যেন সিধা বসে না। আজ দু/তিন দিন যাবৎ অল্প অল্প এই রকম চলছে।" তপন বলিল—'মা, কাল যখন তুমি সকলকে নিয়া 'হলে' বসিয়াছিলে, এইরূপ মনে হইতেছিল যেন শরীর সিধা করিয়া বসিতে পারিতেছ না।' মা বলিলেন—"ঐরূপই হইতেছিল, শ্বাসের গতিটাই ঐরূপ চলিতেছিল। তবে অসুবিধা বা কষ্ট কিছু নাই। শরীরটা ঐরূপ হইয়া যাইতেছে দেখা যাইতেছিল।"

১০ই জানুয়ারী ১৯৬১।

আজ বহুলোক শিবপূজা করিবে। রেখা বিশেষভাবে ভোলানাথজীকে সোনার সাপ দিয়া পূজা করিতেছে। ১০৮ পদ ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছে। ছবি ব্যানার্জি, উৎপলা সেন এবং আরও অনেকে কীর্ত্তন করিতেছে। সকলেরই মহা আনন্দ। মা আগামী পরশু কাশী রওনা হইবেন—ইহাই সকলের দুঃখ।

১১ই জানুয়ারী ১৯৬১।

আজ সকাল এগারোটায় তুফান এক্সপ্রেসে আমরা কাশী রওনা হইলাম। গতকাল রাত্রেই অনেকে রওনা হইয়া গিয়াছে। আমরা রাত্রি প্রায় একটায় মোগলসরাই পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে আশ্রম হইতে কয়েকজন আসিয়াছিল। আশ্রমে আসিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া শুইতে শুইতে মায়ের রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল।

১২ই জানুয়ারী ১৯৬১।

আজ সকালে দুইজন মেমসাহেব দিল্লী হইতে প্লেনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মাতৃদর্শনের জন্য তাঁহারা আসিয়াছেন—একজন ফ্রান্স হইতে, অপরজন আমেরিকা হইতে। মাত্র ৮।১০ দিন হয়তো এদেশে থাকিবেন, এই সময়টুকু সম্পূর্ণভাবে মায়ের নিকট থাকিতে চান। কিন্তু আশ্রমে তাঁহাদের সুবিধা হইবে না বলিয়া স্থানীয় ক্লার্কস্ হোটেলে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

আজ রাত্রে ইটালীর একজন বিশিষ্ট মেমসাহেব মায়ের সহিত একান্তে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য আসিলেন। তিনি UNESCO-র একজন বিশিষ্ট পদাধিকারিণী। মায়ের সঙ্গে কথা বলিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বয়ং ইউরোপের একজন খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ্। মায়ের সঙ্গে তিনি অনেক জটিল বিষয়ে কথা বলিয়াছেন। বারবারই বলিতেছেন যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করাই তাঁহার কাজ। পৃথিবীর বহু নেতা, বহু সন্ত মহাপুরুষ এবং মণীষীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবার সৌভাগ্য হইয়াছে, কিন্তু মায়ের মত এইরূপ দ্বিতীয় একজন অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বপূর্ণ মহিলার দর্শন আর কখনও হয় নাই।

১৪ই জানুয়ারী ১৯৬১।

আজ পৌষ সংক্রান্তি উৎসব। সকাল হইতে না হইতে যজ্ঞশালার নিকট মেয়েদের কীর্ত্তনধ্বনি শোনা গেল। আজ সাবিত্রী মহাযজ্ঞের ত্রয়োদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান আজই শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে হইয়া গেল। স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী (সংজ্ঞা মা) আজ

বিশেষভাবে মায়ের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকলে আজ প্রসাদও পাইলেন।

কলিকাতা হইতে রায় বাহাদুর সুরেন ব্যানার্জির দুই কন্যা—ননী ও কমলা আসিয়াছে। তাহারাও সোনার বেলপাতা ও তুলসী দিয়া বিশেষ পূজার আয়োজন করিয়াছে। আজ বাহির হইতে স্বদেশী বিদেশী প্রায় সাড়ে তিন শত স্ত্রী-পুরুষ আশ্রমে আসিয়াছেন। তাঁহারাও প্রসাদ পাইয়া গেলেন।

১৬ই জানুয়ারী ১৯৬১।

সকালে মাকে একটি প্রশ্ন করিলাম যে মায়ের শরীরের উপর কিম্বা ছবির উপর যে পূজা করা হয়, এই বিষয়ে মায়ের মত কি? এরূপ প্রশ্ন অনেকেই অনেক সময়ে করিয়া থাকে। মা হাসিয়া বলিলেন—"এই শরীরকে যদি জিজ্ঞাসা করো, এখানে কোনও মত অমত হাঁ না-র কোনও প্রশ্নই নাই। কিছুই বলিবার নাই। শুধু শরীরকেই কেহ পূজা করে কি? তোমরা যে যাহা মনে কর।"

আমি বলিলাম—"মা, তোমার এই কথায় কিছু বুঝিলাম না। অনেকে জিজ্ঞাসা করে, কী জবাব দিব? আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বল।"

মা—"একদিকে কিন্তু আবার কেহ কাহাকেও পূজা করে না। নিজেকে নিজেই পূজা করে। কি নিজ—কি নিজ নয় এখন ভাব। তিনিই বল, তুমিই বল—ঐ যে প্রাণের প্রাণ আত্মা। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি তোমরা বলো ত! যে-ধারায় যা'র ধরা, সেই দিক নিয়েই কথা। ভগবান নিরাকার সর্ব্বদানন্দ বলো ত? জলই যেমন বরফরূপে। এই যে আবার সাকাররূপ স্বয়ংই। উপমা সর্ব্বাঙ্গীন হয় না। যেটুকু ধরিয়া লওয়া। নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াশক্তি রূপাদি যেখানে, সেখানে নানারূপ নানাভাব যাহার যে দিক। সব-কিছু তাহাতেই।

তোমাতেই। পর, অপর, আপন যা'-কিছু। পূজার দিকটা ধরো এখন। নিজেকে নিজে জানার জন্য, পাওয়ার জন্য নিজেকে নিজে পূজা। এখন, পূজাটা কাহার, কে কাহাকে পূজা করে বোঝ। তোমাকে তুমিই পূজা করিতেছ। তিনিই পূজা, তুমিই পূজা। আপনাকে আপনি পাইয়া নিজেই তৃপ্তি। যেখানে তৃপ্ত, প্রাপ্ত, নিজেকে জানা পাওয়ার দিক, সেইখানেই এই কথা। আরও ভাবিয়া দেখ, ঐ যে পরম পিতা, পুরুষোত্তম, ইষ্ট, গুরু, সর্ব্বরূপেতে ঐ তাঁহারই পূজা। বিগ্রহাদি তৈয়ার করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা। বৃক্ষ, গঙ্গা, যমুনা, অগ্নি, গোমাতা ইত্যাদি, কুমারী, বটুক-ভৈরব, বালগোপাল-ও পূজা কর। পূজা মাত্রেই ঐ তাঁহারই পূজা। এই অর্থ—নানা ভাব রূপে যে বিভিন্ন আছে সেই পূজা। দেখ না, পূজা করিয়া পূজক নিজেই প্রাপ্ত, পরমতৃপ্ত! আরও বুঝ নিজ বন্ধুর সঙ্গে বা নিজ পরিজনের সঙ্গে নানা কথায় আলোচনায় ভাল লাগে। এখানেও অপ্রাপ্ত প্রাপ্ত হইয়াই তৃপ্ত। এদিকেও দেখ—সৎ আলোচনায় সাধুসন্ত পরমানন্দ।"

আজ এই প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া মায়ের মুখ হইতে অনেক অমূল্য কথা বাহির হইল; ইহাতে খুবই আনন্দ হইল।

১৭ই জানুয়ারী ১৯৬১।

আজ সকাল আটটায় মা মোটরে এলাহাবাদ রওনা হইলেন। সঙ্গে সেই মেমসাহেব দুইজনও গেলেন। তাঁহারা শুক্রবার পর্য্যন্ত মায়ের কাছে থাকিয়া সেই দিনই বিকালে প্লেনে দিল্লী হইয়া স্বদেশ অভিমুখে রওনা হইয়া যাইবেন।

প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার পূর্বে তিনদিন মাকে এলাহাবাদে সত্যগোপাল আশ্রমে লইয়া যায়। এবার মায়ের শরীর সুস্থ না থাকায় ঐ সময়ে সেখানে যাওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে সত্যগোপাল আশ্রম হইতে ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা এবং ভক্তরা আসিয়া মাকে প্রার্থনা জানাইয়া গিয়াছেন মা যেন কৃপা করিয়া সুযোগমত তিন রাত্রি সেখানে থাকিয়া আসেন। সেই অনুসারেই মা আজ রওনা হইয়া গেলেন। ১৯শে পর্য্যন্ত এলাহাবাদে থাকিয়া ২০শে সকালে মায়ের দিল্লী রওনা হওয়ার কথা। দিদিমাকে ও আমাকে মা এখানে থাকিতে বলিলেন। আমাদের আগামী ১৯শে এখান হইতে সোজা দিল্লী যাওয়ার কথা।

এখানে একদিন একজন প্রশ্ন করিয়াছিল—'মা, মনস্থির করবার উপায় কি?' উত্তরে মা বলিলেন—'যতোক্ষণ পারা যায়, ভগবানের নাম করা' পরে একটু হাসিয়া বলিলেন—"আর, যাত্রীদের সঙ্গ করা। যাত্রী হইল—যাহারা সেই পথে যাত্রা করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গ করা।"

২০শে জানুয়ারী ১৯৬১।

আজ বেলা প্রায় ১১টায় আমরা দিল্লী পৌঁছিলাম। রাত্রি প্রায় ১০টার সময়ে মা আসিয়া পৌঁছিলেন।

২১শে জানুয়ারী ১৯৬১।

আজ সকালে হরিবাবা মাকে নিতে আসিলেন। হরিবাবার জন্য উপরে যে নূতন ঘর করা হইয়াছে, তাহাতে হরিবাবা, মা ও অন্যান্য সকলে বসিলেন;

ফল মিষ্টি বিতরণ হইল। মাকে নিয়া হরিবাবা সাঙ্গোপাঙ্গসহ উৎসবের স্থানে চলিয়া গেলেন। বেলা প্রায় ১টায় মা ফিরিয়া আসিলেন। এখান হইতে যাওয়া-আসার অসুবিধা বলিয়া হরিবাবা আশ্রমে থাকিতে রাজী হইলেন না। মায়েরও শরীর ভাল নয়, তাই হরিবাবার সঙ্গে কথা হইয়াছে প্রতিদিন মা প্রায় দশটায় ওখানে যাইবেন এবং প্রায় বারোটায় ফিরিয়া আসিবেন। আর সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টায় আশ্রমে সকলের মাতৃদর্শন হইবে। আগামী ৩১শে পূর্ণিমা পর্যন্ত মায়ের এখানে থাকিবার কথা হইয়াছে। এখান হইতে হরিদ্বার যাওয়ার কথা। হরিদ্বারেই মায়ের উপস্থিতিতে এবার শিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হইবার কথা।

২৫শে জানুয়ারী ১৯৬১।

মা দিল্লীতেই আছেন। শরীর ভাল নয়। শ্বাসের গতি ঠিক চলিতেছে না। ইহা নিয়াই সকলের আবদার রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। কেহ দুঃখিত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি।

কলিকাতার বিনয় সেন ২রা মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি মায়ের বহু পুরাতন ভক্ত। মা যখন এলাহাবাদে, তখন কাশীতে টেলিগ্রাম আসে; পরে লোক দিয়া সেই টেলিগ্রাম এলাহাবাদে পাঠানো হয়। বুনির মুখে শুনিলাম মা নাকি সকালে উঠিয়াই বলিয়াছেন—'মৃত্যু খবর। কাহারও তার আসিয়াছে'। কিছু পরেই তার আসিল।

আজও ৬টা হইতে ৭টা মাতৃ-দর্শনের সময়। তার পরই মা 'হল্' হইতে উঠিয়া দিদিমার ঘরে গিয়া বসেন বা শুইয়া সকলের 'প্রাইভেট' কথা শোনেন। ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত এক এক করিয়া 'প্রাইভেট' চলিল। তারপরও আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীদের ও আমাদের সঙ্গে কথায় কথায় রাত্রি

প্রায় ১২টা বাজিল। তারপরে মা ও অন্য সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন। আজও দিদিমার ঘরে বসিয়া মা তপনকে বলিতেছেন—'তোর হাতে কি টাকা ছিল? তুই হরিদ্বার হইতে যে এখানে আসিয়াছিস্?' সে বলিল— 'না, টাকা ছিল না, ওখান হইতে নিয়া আসিয়াছি।' মা হাসিয়া বলিলেন 'এই জন্যই জিজ্ঞাসা করা হইল। দেখিতেছিলাম, হাতে টাকা নাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া নিতেছিস্।' এই রকম ব্যাপার নূতন নয়। সর্ব্বদাই হইতেছে। তবুও লিখিতে ইচ্ছা হইল, তাই লিখিলাম।

৩০শে জানুয়ারী ১৯৬১।

মায়ের শরীর ভাল যাইতেছে না। কিন্তু কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে কথাবার্ত্তা ব্যবহার করিয়া যাইতেছেন। নিজেই বলিলেন—"যতোক্ষণ শরীর চলে চালাইয়া যাওয়া, আবার যখন চলিবে না চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল; কোনও গোলমাল নাই।" এই বলিয়া শিশুর মত হাসেন।

শ্রীডোরাইস্বামী মাতৃদর্শনে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ছিলেন, কালীদার কাছে কখনও কখনও যান এবং তাঁহাকে খুব মানেন। তাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করা হইল। তিনি আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ পাইয়া, মায়ের সঙ্গে বসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। মায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। আমাদের ইঞ্জিনীয়ার বর্ম্মাজী-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডোরাইস্বামী মাদ্রাজের লোক। একটু একটু বাঙ্গলা বলিতে পারেন। মা-ও তাঁহার সঙ্গে সেই ভাবে কথা বলিতেছেন। মা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন। তাঁহার মহা আনন্দ।

কাশী হইতে খবর আসিয়াছে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের শরীর অসুস্থ। মা তাঁহার জন্য নানারকম পথ্যের ব্যবস্থা ও নিয়মিত থাকিবার ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠাইতেছেন। এখন বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে মা করুণাময়ী মমতাময়ী মা। মায়ের যেন কতো না চিন্তা। টেলিগ্রাম করিয়া খবর নিবার কথা বলিতেছেন।

হরিবাবার বিশেষ ভক্ত জমিদার গোলাপ সিং হরিবাবার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিলেন। গতকল্য ভোরে হরিবাবার কীর্ত্তনে যাইবেন বলিয়া রাত্রি প্রায় ৩টায় উঠিয়া পায়খানা যাইবার পথে পড়িয়া গিয়াই হঠাৎ মারা যান। মা গতকল্য দশটার সময়ে সৎসঙ্গে এই খবর পান নাই; মা ফিরিয়া আসিবার সময় হরেকৃষ্ণ পরমানন্দ স্বামীর নিকট এ খবর দিয়াছিল। স্বামীজী আশ্রমে আসিবার পথে মোটরে মাকে এই খবর দেন। মা বলেন—"পূর্ব্বে কেন ওখানে এই খবর দিলে না?" আশ্রমে আসিয়াও মায়ের ঐ কথা। স্বামীজীকে মা বলিতেছেন—'এখন যাই বাবার কাছে? ওখানে বলিলে তো একবার দেখিয়াও আসা যাইত।' স্বামীজী বলিলেন—'এখন আর যাওয়ার দরকার কি? বাবাও তো তোমাকে কিছু বলেন নাই।' মায়ের শরীর তো খারাপই—সেই দিক ভাবিয়াও স্বামীজী এই কথা বলিলেন। বৃষ্টি পড়িতেছে। ঠাণ্ডা যথেষ্ট। মা-ও উপস্থিত মানিয়া নিলেন। আবার বিকালে যাবার খেয়াল। তখনও স্বামীজীর সঙ্গে ঐরূপ কথায় কথায় আর যাওয়া হইল না। কিন্তু মায়ের সেখানে যাওয়ার খেয়ালটা যাইতেছে না দেখিতেছি।

রাত্রে দিদিমার ঘরে মা অনেককে নিয়া বসিয়াছেন। ঐ কথাই বলিতেছেন। নারায়ণ দাস আসিয়া বলিলেন—"মা, গোপাল সিং-এর গ্রাম হইতে অনেক লোক আসিয়াছে। বেলা প্রায় ৩টায় মৃতদেহ নিয়া যাওয়া হয়। হরেকৃষ্ণ বলিয়াছিল মায়ের কাছে এই সব খবর দিতে। আমার যেন সাহস হয় নাই, স্বামীজীর কাছে বলিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতেই মায়ের কাছে খবর পৌঁছিবে মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মায়ের নিকট হইতে কেহ

আসে নাই। আমি বলিলাম—আমিই মায়ের নিকট হইতে আসিয়াছি। সব ব্যবস্থা আমিই করিয়া দিতেছি। আমি সৎকারের সব ব্যবস্থা এবং তাহাদের লোকদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সব করিয়া দিয়া আসিয়াছি।”

প্রথম হইতেই ওখানে যাওয়ার খেয়াল মায়ের চলিতেছিল। নারায়ণ দাসের কথা শুনিয়া মা বলিলেন—‘এই শরীরের কেমন একটা বাবার কাছে যাইবার খেয়ালটা যাইতেছে না। উহারা মানা করায় যাওয়া হয় নাই। যাক্ তুমি একটু অপেক্ষা করো।’ এই বলিয়া উপস্থিত সকলকে যাহা বলিবার বলিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন। রাস্তায় নারায়ণ দাসের গাড়ী ছিল। তাঁহাকে ও স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া মা হরিবাবার কাছে রওনা হইয়া গেলেন। নিজের শরীর খারাপ, বৃষ্টি পড়িতেছে—সেদিকে লক্ষ্যই নাই। রওনা হইবার সময়ে স্বামীজী বলিলেন—‘হরিবাবা কোথায় থাকেন জানা নাই।’ মা সেদিকে না চাহিয়াই বলিলেন—‘নারায়ণ দাস সব ঠিক করিয়া নিবে।’

মা ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম হরিবাবা যখন আহারে বসিতে যাইতে-ছিলেন সেই সময়ে মা গিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। বাবার সঙ্গে কথা বলিয়া মা শুনিলেন—গোলাপ সিং-এর স্ত্রী ও ভগিনীরা এখানেই আছেন; তাঁহাদের চলিয়া যাইবার কথা ছিল কিন্তু বাবা যাইতে দেন নাই, সৎসঙ্গে থাকিতে বলিয়াছিলেন। তাই তাঁহারাও রহিয়াছেন। মা তাঁহাদের কতো ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মাথা রাখিয়া ‘মা মা’ বলিয়া ডাকিয়া সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছেন। গোলাপ সিংএর স্ত্রী নাকি মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ‘মাইয়া মাইয়া’ বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিলেন। মায়ের কৃপায় ও স্পর্শে পরে তিনি বেশ শান্ত হইয়াছিলেন। অনেক রাত্রিতে মা বিশ্রাম করিতে গেলেন। মা ইহাও নাকি গত পরশু বলিয়াছিলেন যে একটি মৃতদেহ দেখা যাইতেছে।

৩১শে জানুয়ারী ১৯৬১।

মা আজ দিদিমার ঘরে বসিয়াছেন। ঘরে কেহ কেহ আছেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন—'কাল যখন বাবার কাছে যাওয়া হয়, শরীর এতো খারাপ যে টলিতেছিল, আর গলা শুকাইয়া যেন কাঠ। কিন্তু খেয়াল হইল যাইব। যদি তেমন কিছু হয়, রাস্তায় কাহারও বাড়ীতে ঢুকিয়া বলিলেই হইবে একটু জল খাওয়াইয়া দাও। সবই তো এক-ই! এক ঘর-ই তো! যতোক্ষণ শরীরটা চলে, ব্যবহার যতোটা পারা যায় করা হয়; আর, যখন চলে না তখন যেমন হইয়া যায়।' ছোট্ট একটু হাততালি দিয়া একটু হাসিয়া মা বলিতেছেন—"ব্যস্! কোনও কথাই নাই।" আমাকে দেখাইয়া মা বলিতেছেন—"ইহারা সকলে চলিয়া গেলে কখনও কখনও ঘরে শ্বাসের গতি কেমন হইয়া যায়। তাহা দেখিয়া ভয় পায়, তাই সকলকে বলে মায়ের শরীর ভাল নয় এবং মাকে বিশ্রাম দিতে হইবে বলিয়া সকলকে শীঘ্র শীঘ্র উঠিতে বলে। সকলে এই শরীরের ব্যবহার দেখিয়া বলে—মা তো বেশ হাসিখুশিভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, অসুস্থ তো মনে হয় না, ভক্তেরাই এই রকম বলে।"—এই বলিয়া মা হাসেন।

কথা হইয়াছে ৪ঠা তারিখে মা হরিদ্বার রওনা হইবেন এবং শিবরাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া আবার এখানে আসিয়া দোল অবধি থাকিবেন। কারণ হরিবাবা প্রতি বৎসরই দোলের সময়ে নিজে যেখানে থাকেন মাকে সেখানেই নিয়া যান। এবারও শ্রীপঞ্চমী হইতে দোল অবধি মাকে এখানে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তবে কিছু বিশেষ কাজ আছে জানিয়া বলিয়াছিলেন—'প্রথম দিক দিয়া মা থাকিবেন আবার দোলের পূর্ব্বে আসিলেই হইবে।' তাই করা হইতেছে।

মায়ের নির্দ্দেশ অনুসারে এই পূর্ণিমা হইতে দোল পূর্ণিমা অবধি একমাস সারাদিন অর্থাৎ বারো ঘণ্টা কীর্ত্তন ও রাত্রিকালে বারো

ঘণ্টা জপ চলিবে। বৃন্দাবন হইতে ছয় জন কীর্ত্তন করিবার জন্য গায়ক আনা হইয়াছে। রাত্রিকালে সাধু ব্রহ্মচারীগণ এক জনের পর এক জন জপ করেন। মা বলেন—"এখানে তোরা নামব্রহ্ম মন্দির করিয়াছিস, বেশী সময় নাম হওয়ার কোনও ব্যবস্থাই তো করিস্ নাই। যাক্ এখন তো এই একমাস চলুক।" ভোর ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা অবধি

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

—এই নাম চলিতে আরম্ভ হইল। আবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৬টা অবধি জপ চলিতেছে।

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

মা প্রায়ই নৈমিষারণ্যের কথা বলেন। মহাত্মা গান্ধীর দেহত্যাগের স্মরণে প্রার্থনা ইত্যাদির ব্যবস্থা যেখানে হইয়াছে, আজ মাকে সেইখানে বিশেষ আগ্রহে নিয়া গেল। হরিবাবার ওখান থেকে সেই প্রার্থনার স্থান হইয়া মা আশ্রমে ফিরিলেন। শুনিলাম তথায় মায়ের অভ্যর্থনার যথারীতি ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

মা আজ দুপুরেই সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করিয়া মোদিনগরে চলিয়া গেলেন। মোদিজী একটি মন্দির করিতেছেন; চার বছর যাবৎ তাহার কাজ

চলিতেছে। মাকে তাহা একটু দেখাইয়া কোথায় কী করিবে তাহা তাহাদের জিজ্ঞাস্য ছিল। তাহাদের ইচ্ছা মন্দিরটি শাস্ত্রীয় বিধিমত এবং অতি সুন্দরভাবে হয়। তাহাই চেষ্টা করিতেছে। পাথরের মন্দির। অনেক কিছু কারুকার্য্য। মা রাত্রিতে মোদিনগরে থাকিয়া পরদিন সকালে গাড়ী ধরিলেন। আমরাও আজ ভোরে এই গাড়ীতেই হরিদ্বার রওনা হইয়াছি। আজই বিকালে হরিদ্বার পৌঁছিলাম। যোগীভাই এবং আরও কেহ কেহ ষ্টেশনে ছিলেন। বিদ্যা-পীঠের ছেলেরাও এখন এখানেই আছে।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

মা আসিয়াছেন। আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। অনেক বিদেশীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ মায়ের দর্শনে আসিয়াছেন। শুনিলাম ইঁহারা ঋষিকেশে শিবানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে আসিয়াছিলেন। মা আসিবেন শুনিয়া মাতৃ-দর্শনের আকাঙ্খায় এখানে আসিয়াছেন। বহুক্ষণ তাঁহারা সকলে মায়ের নিকট কাটাইয়া যান। এইখানেই প্রসাদ পান। মায়ের দর্শনে, মায়ের ব্যবহারে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। মায়ের সঙ্গে কেহ একান্তে কথা বলিয়াও বিশেষ তৃপ্তি পাইতেছেন। আমাদের আত্মানন্দজী এখানেই আছেন। ইহাতে তাঁহাদের খুবই সুবিধা হইয়াছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

আজ একটি বিশেষ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। তবে মায়ের যেমন কার্য্যপ্রণালী—শুভ

কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বিষয়ে বাহিরে বিশেষ বলা কহা না হয়। যাহাদের প্রয়োজন অথবা যাহারা শুনিয়া ফেলিল, তাহারাই মাত্র জানিল। এই সব কথা বাহিরে বেশী হৈ চৈ করিতে মা নিষেধ করেন। বলেন—'চুপ থাক্, এখনই হৈ হৈ করিবার কি আছে? তাঁর ইচ্ছায় কাজ হইয়া যাক তারপর যাহা হইবে সকলেই জানিবে, দেখিবে। এই সব কাজ পূর্ব্বে হইতে হৈ হৈ করিতে নাই। ইহা তো দেখাইবার শোনাইবার জন্য নয়। নিজ নিজ জীবনের উন্নতির অনুকূল ক্রিয়া নেওয়া।'

যাক্ কথা হইল এই—ভরত ভাই, কুসুম ও তপনকে নিয়মিত ভাবে ব্রহ্মচর্য্য দেওয়া হইতেছে। বাটুদা ও বিশু আসিয়াছেন। মায়ের সব কাজই এই—কেহ হয়তো বলিল মা যাহা বলিবেন তাই হইবে। কিন্তু মা বলেন—'শাস্ত্রীয় বিধিমত সব করা।' সেইরূপই সব ব্যবস্থা হইতেছে। আজ তিন জনই নিরম্বু উপবাস করিয়া রহিল। সন্ধ্যায় তুলসী পত্রে ঘি নিয়া মুখে একটু ছিটাইয়া দেওয়া।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

আজ একটি ঘরে মা ক্রিয়াদির ব্যবস্থা সব ঠিক ঠিক ভাবে করিয়াছেন। বাটুদা ও বিশু করাইবে। প্রথমে অনাশ্রমী থাকার জন্য প্রায়শ্চিত্ত, পরে পার্ব্বন শ্রাদ্ধাদি হইল। ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সব হইল। পরে ব্রহ্মচারীরা শাস্ত্রীয় বিধিমত এক বেলা আহার করিলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

আজ ব্রহ্মচারীরা একাদশীব্রত করিলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

আগামীকল্য শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত। শিবরাত্রিতেই ব্রহ্মচারীদের দীক্ষা, নামকরণ ইত্যাদি হইবে। পৈতার পর সমাবর্ত্তন না করিয়া যিনি দণ্ডাদি নিয়া বিধিমত থাকেন তাঁহাকেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হয়। আবার তাহা না করিয়াও যাঁহারা সেইরূপ নিষ্ঠাদি নিয়া থাকেন, প্রায় সেইরূপই ক্রিয়াদি করেন, তাঁহাদিগকেও ঠিক বিধিমত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা না গেলেও, উহাও প্রায় সন্ন্যাসেরই মত; সেরূপভাবে জীবন যাপন করিবার বিধিও আছে। তাঁহাদের শিখা সূত্র থাকে, বিরজা হোমও তাঁহাদিগকে করিতে হয় না প্রেষমন্ত্রও শোনানো হয় না; তাই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারীই বলা হয়। এইভাবে ক্রিয়া ইতিপূর্ব্বে আমাদের আশ্রমে হয় নাই। যোগী ভাইয়ের ও আমাদের সকলের বিশেষ আনন্দ। যোগীভাইয়ের উদ্যোগেই বিদ্যাপীঠ। তপন শিশুকাল হইতে বিদ্যাপীঠে লালিত পালিত হইয়াছে ও শিক্ষাদি পাইয়াছে। তারপরেও যোগীভাইয়ের কাছে থাকিয়া সে শাস্ত্রী হইয়াছে ও বি, এ, পাশ করিয়াছে এবং তারপর মায়ের নির্দ্দেশে দিল্লীতে থাকিয়া এম, এ, পাশও করিয়াছে। কুসুম তো এম, এস, সি, পাশ করিয়াই আশ্রমে আসিয়াছে। আর ভরত ভাইও বি, এ; বি, এল, পাশ করিয়া ওকালতি করিতেছিল। ইহারা আপাততঃ মনোরম প্রতিষ্ঠা প্রশংসাদি সব ছাড়িয়া বহুদিন হইল মায়ের চরণে আসিয়াছে। আজ ইহাদের এইসব কাজে সকলেরই মহা আনন্দ। মায়ের কৃপাতেই এই রূপটা সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের তিনজনেরই স্বভাব খুব ভাল।

আজ দুপুরে মা শুইয়া আছেন। আমি ঘরে আছি। মা হঠাৎ বলিতেছেন "দেখ দিদি! আজ সকালে কি কাল রাত্রে দেখিতেছি কি আশুর বাবা (ভোলানাথের বড় ভাই) একবার কাশীতে দেখা গেল দরজায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে 'আমাকে আপনার কিছু দিতেই হইবে।' শেষে কি

জানি সব দেওয়া হইয়া গেল। আর এখন দেখা হইল তাহার যেন শরীরের ভাব বদলাইয়া যাইতেছে। তাহার পরিবারের সঙ্গে যেন সব বন্ধনই ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এই শরীরের কাছে আসিয়া যেন এই শরীরের কাছে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছে। যেন তাহার আর কোনও দিকে দৃষ্টিই নাই, একমাত্র এই শরীরই যেন তার আছে।" আমি বলিলাম—"সব ছাড়িয়া একেবারে শরণাগতভাব। তোমারই কাছে আশ্রয় নিয়াছে।" মা এই কথায় কোনও জবাব না দিয়া বলিয়াই যাইতেছেন—"কেমন আশ্চর্য্য দেখ্! চোখে একটা মাছি যাইতেছে, তথাপি তাহার যেন কিছুই করিবার বা দেখিবার নাই, এই শরীররই ব্যবস্থা করিয়া মাছি বাহির করিয়া দিল, মাছি তাড়াইতেছে। সে যেন চোখ বুজিয়া সব ছাড়িয়া দিয়াছে। কী আশ্চর্য্য, মরিয়া গিয়াও ছাড়া নাই।" এই বলিয়া মা একটু হাসিলেন এবং বলিলেন 'হরিদ্বারের মত জায়গায়।' আমি বলিয়া বসিলাম—'মা! এই তিন ব্রহ্মচারীর এই সব ক্রিয়া হইতেছে। এই সব ক্রিয়া তো ছাড়িয়া দিই। গুরুর শরণাপন্ন এই ভাবই। ইহাদের জন্মের পূর্ব্বেই তো আশুর বাবার মৃত্যু হইয়াছে। কি জানি ইহাদের সঙ্গে কোনও সংশ্রব আছে কিনা।' মায়ের যেন এই কথায় এই দিকে একটু খেয়াল হইল। সেই ভাবে মা বলিলেন—'তাইতো কে জানে কত রকমটা থাকে ত! আশ্চর্য্য ত, এই সময়েতেই এইরূপটা দেখা।'

যোগী ভাইয়ের বিমাতার এক বৃদ্ধা দাসী যোগী ভাইকে বলিয়াছে—'আমার শিব পুরাণ শুনিতে ইচ্ছা, আপনি আমাকে শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন।' যোগী ভাই তখনই সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা এখানে আসিয়াই দেখি একতলার সৎসঙ্গের 'হলে' শিব পুরাণ পাঠ হইতেছে। আগামীকল্য শিবরাত্রিতে তাহা সমাপ্ত হইবে। এই সব কাজ যোগী ভাইয়ের প্রায় লাগিয়াই আছে।

আজ নিতাই ভাই তাহার কনখলের বাড়ীতে বৈকালে মাকে ও ভক্তদিগকে নিয়া গেলেন। সেইখানে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী তিনজনও গিয়াছেন। তাঁহারা মাকে বলিলেন—'আপনাকে দর্শন করিবার জন্য আমরা দুই তিন দিন যাবৎ এখানে আপনার আসিবার কথা শুনিয়া আসা যাওয়া করিতেছি।' মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। একজন সন্ন্যাসী একটি গান শুনাইলেন। যাওয়ার সময়ে তিনি মাকে প্রণাম করিতে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—'কৃপা করুন। কিছুই ত হইতেছে না।' মা বলিলেন—'ঠাকুর নিয়া পড়িয়া থাক। তিনিই সব ব্যবস্থা করিবেন।'

মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় একজন সন্ন্যাসী বলিলেন— 'মা! আগামী পরশু সময় পাইলে আপনার ওখানে যাইব।' মা বলিলেন— 'যখন ইচ্ছা হয় আসিবে। তোমরা এই পথের। তোমাদের জন্য ত সব সময়ে দরজা খোলা।' তাঁহারা মাকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন— 'সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। কাজ তো আছে। এখন আসি।' নিজের স্বাভাবিক মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিয়া মা তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

আগামী কল্য শিবরাত্রি। কতো লোক পূজা করিবে তাহার স্থিরতা নাই। তাহাদের সকলেরই পূজার ব্যবস্থা হয় মায়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। তা'ছাড়া ব্রহ্মচারী তিনজন কালই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিবেন। নাম, কাপড় সবই বদল হইবে। মায়ের তো সব কাজই নিখুঁৎ হওয়া চাই। এই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা যে কতো ভাবে হইতেছে! অথচ তাহা প্রায় কেহই জানে না। আজও রাত্রিতে যাহার যাহার সঙ্গে এই বিষয়ে যে যে কথার দরকার, তাহাকে তাহাকে ডাকিয়া শুধু তাহারই সঙ্গে মা সেই কথা বলিতেছেন। শাস্ত্রীয় বিধানমত সব ব্যবস্থা চাই; তাই বাটুদাকে ডাকিয়া সব জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। মা বলিতেছেন—'যাহা যাহা করা, ঠিক ঠিক মতোই করা উচিত।' তা'ছাড়া ব্রহ্মচারীরা সকলেই শিক্ষিত; মায়ের কৃপায় ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে আসিয়াছে সত্য কিন্তু কতো সন্দেহ সংশয়, কতো

প্রশ্নই না তাহাদের মনে আসিতেছে—ইহা ত স্বাভাবিক। পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় বিধানে তাহাদের মন শান্ত নিঃসংশয় হয় না। তাই কতো কথার আলোচনা হইতেছে। অবশ্য মায়ের আদেশ পালন করিতে তাহারা প্রস্তুত। তাই তো এতো বৎসর ধরিয়া মায়ের চরণে আশ্রয় নিয়া রহিয়াছে। কিন্তু জীবের পক্ষে নির্বিচারে আদেশ পালন সহজ কথা নয় ত! এই সব বিষয়ের সমাধান মা-ই করিতেছেন। ছেলেরা ইহাও চায়—"মা শাস্ত্রের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? আদেশ দিলেই ত হয়। তবে তো আমাদের কোনও প্রশ্ন থাকে না! কেন মা সেরূপ করেন না?" কিন্তু মা জানেন ইহা সহজ কথা নয়। ইহা কতো বড়ো আত্ম-সমর্পণের কথা! বিশেষ গুরুকৃপা ছাড়া এভাব আসা সম্ভবই নয়। যাক্, যাহাই কথাবার্ত্তা হউক, মায়ের কাজ মা করাইয়া যাইতেছেন—নীরবে, প্রায় সকলেরই অজ্ঞাতসারে। যাহাদের জন্য করিতেছেন, তাহারাও জানে না মা কতোখানি কৃপা করিতেছেন। অথচ আমরা কতোটুকুই বা এই কৃপা বুঝিতে বা নিতে পারিতেছি। এই ব্যাপারে দুই তিন দিন ধরিয়া রাত্রি অনেক হইয়া যাইতেছে। আজও তাহাই হইল।

কাল প্রাতে ৮টা/৮॥০টা হইতে ব্রহ্মচারীদের কাজ আরম্ভ হইয়া যাইবে। তার পূর্ব্বেই মা ঐ ঘরে পৌঁছাইবেন। আজ রাত্রিতে ঐ ঘরেই অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া মা সব ঠিক করিয়া রাখাইলেন। সকাল হইতেই ঐ ঘরে গুছাইবার কাজ চলিতেছে। এমনভাবে গুছানো যে কাহারও এসব কথা ধারণাতেও আসিবে না হয়তো। তাহাদের যজ্ঞাদির ও নিয়মিতভাবে রান্না, খাওয়া, থাকা, শোওয়া সব ব্যবস্থা হইতেছে। যজ্ঞের ঘি, কাঠ, বালু, হবন সামগ্রী ইত্যাদি ঝাড়াইয়া বাছাইয়া অনেক দিন হইতেই তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। কাহাকে দিয়া, কী কারণে, কোন্ কাজ করাইতেছেন, তাহা কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। কাজের সময়ে সকলেই অবাক্ হইয়া দেখে—কখন্ এমনতরো ব্যবস্থা হইল? শাস্ত্রীয় বিধানও তেমনিই বাটুদাকে

হয়তো জিজ্ঞাসা করা হইল—বাটুদা কতকটা বলিলেন, কতকটা তাঁহার মনে নাই। অথচ ইতিপূর্ব্বে মায়ের নির্দ্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তখন বাটুদার স্মরণ হয়, তিনি বলেন—'ইহাই তো শাস্ত্রীয় বিধান, আমার বলিতে মনে ছিল না।' এই রকমই অনেক কাজ চলিতেছে। মা যে সব দিক দিয়াই কতো ভাবে রক্ষা করিতেছেন, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের কোথায় ?

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

আজ শিবরাত্রি। ব্রহ্মচারীগণকে প্রথমেই বিধিমত পুনরায় গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হইল। তপন শিশুকাল হইতে আশ্রমে বিদ্যাপীঠে পালিত বলিয়া তপনের ক্রিয়াই প্রথমে হইল। কুসুম ও ভরত ইহা অনুমোদন করিলেন। দেরাদুন হইতে যোগেশদাকে আনা হইয়াছিল—কিভাবে অগ্নি রক্ষা করিলে সুবিধা হয় তাহা দেখাইবার জন্য। কান্তিভাইকে দিয়া কাশী হইতে অগ্নি আনা হইয়াছে। সেই অগ্নিকে যোগেশদা বহুকাল রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রদীপরূপে অগ্নি রক্ষিত হইবেন। যোগেশ দাদারও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করানো হইল। ভূর্জ্জপত্রে গায়ত্রী লিখিয়া তাহা যোগেশদাদাকে দিয়াই দেওয়ানো হইল। ব্রহ্মচারীদের ও যোগীভাইয়ের বিশেষ ইচ্ছা অনুসারে মা-ও স্পর্শ করিয়া রহিলেন। যথাক্রমে প্রথমে তপন, কুসুম ও ভরতকে যথারীতি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য দেওয়া হইল। ঐ দিকেই ইহারা নিয়মিত চলিবে। নূতন নামকরণ হইল—যোগেশদার নিরঞ্জনানন্দ, তপনের নির্ম্মলানন্দ, কুসুমের নির্ব্বাণানন্দ এবং ভরতের ভাস্করানন্দ। গেরুয়া বস্ত্র, গেরুয়া চাদর দেওয়া হইল। মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়ায় যুবকদের কী শোভাই না হইল। সম্মুখে যজ্ঞাগ্নি। ঘরে উপস্থিত—দিদিমা ও মা এবং আচার্য্য বাটুদা, বিশু, যোগীভাই, বড়দি ও

আমরা দু'একজন। আর সকলে বাহির হইতে দেখিতেছে। এইরূপ ক্রিয়া আশ্রমে এই প্রথম। ব্রহ্মচারী তিনজনেই শিক্ষিত এবং মায়ের অনুগত।

ক্রিয়া সমাপনান্তে নির্ম্মলানন্দ মাকে প্রণাম করিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। মা বসিয়াছিলেন। করুণাময়ী জননী সস্নেহে তাহার মাথায় ও পীঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—"তোরা এই পথে আসিয়াছিস। তোরা এই শরীরের জন্যই ছিলি।" ইত্যাদি বলিতে বলিতে মায়েরও চক্ষু সজল ও গলার আওয়াজ ভারী। জগজ্জননী মা করুণা করিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া কতো লীলাই না করিতেছেন। তারপর নির্ম্মলানন্দ উঠিতেই মা-ও তাহাকে শিশু সন্তানের মত বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। নির্ম্মলানন্দ-ও খুব কাঁদিতে কাঁদিতে শিশুর মতই মাকে জড়াইয়া ধরিল। এই দৃশ্য অবর্ণনীয়। উপস্থিত সকলেরই এই দৃশ্যে চোখে জল ভরিয়া আসিল। মায়ের করুণা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। আমার অক্ষম লেখনী দ্বারা সেই দৃশ্য ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব। কাহারও পক্ষেই হয়তো সেই দৃশ্য ঠিক ঠিক ভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব। কুসুম ও ভরত অনেকটা কষ্ট সহিতে অভ্যস্ত। কিন্তু তপনের এই প্রথম অভিজ্ঞতা; তাহার বয়সও অল্প। ক্রমে কুসুম ও ভরত মাকে প্রণাম করিতেই মা তাহাদেরও এইভাবে জড়াইয়া ধরিয়া কৃপা বর্ষণ করিলেন। কী শক্তি দান করিলেন তাহা মা-ই জানেন। তাহাদেরও অশ্রুসজল চোখ।

তপনের কিছু বিচারের ভাব। যে কোনও কার্য্যে অসম্মতি যেমনটা স্বাভাবিক, সেইরূপই দেখা গিয়াছিল প্রথমে। কিন্তু এখনকার এই ক্রন্দনে সে যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। মায়ের স্নেহ মায়ের কৃপা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সে যেন গলিয়া গেল। পরে এইরূপ ভাবের কথাই সে বলিতেছিল।

তিনটি বেদীতে তিনজন যজ্ঞ করিল। যজ্ঞধূমে ঘর অন্ধকার। মা ঐ ঘরেই বসিয়া আছেন। মায়ের চোখ লাল হইয়া গিয়াছে। সন্তানদের

আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক মা সেখানেই বসিয়া রহিলেন শেষ পর্য্যন্ত।

আজ শিবরাত্রি। তাই আজ আর রান্না হইবে না। একটু ফল দিয়া যজ্ঞে নিয়মিতভাবে আহুতি দেওয়া হইল। পরে মা উহাদের সব গুছাইয়া দিতেছেন। তাহাও দেখিবার জিনিস। ব্রহ্মচারীরা গেরুয়াও পরিতে পারে, অপর রঙের বস্ত্রও নাকি পরিতে পারে। মা পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের জন্য নূতন ব্যাগ ও নামাবলী, সিল্কের রঙদার ধুতি চাদর গামছা এই সব ব্যাগে ভরিয়া রাখিয়াছিলেন। বিছানা সব ঠিক। আবশ্যকের অতিরিক্ত না হয়; আবার প্রথম প্রথম এইভাবে থাকা তাই কোনওরূপ অসুবিধাও না হয়—অসুবিধা বিশেষ বোধ করিলে এই কাজে বিরক্তি আসিতে পারে। তারপর খাওয়ার যাহা যাহা আবশ্যক শুদ্ধভাবে সেই সব জিনিস বাসনে কৌটায় ভরিয়া তাকের উপর সাজানো হইল। ইহারা নিজেরা পাক করিয়া খাইবে, সেইরূপ সব ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষের পক্ষে—গর্ভধারিণী হইলেও—এইভাবে প্রত্যেকটি জিনিস পুংক্ষানুপুংক্ষরূপে দেখিয়া হাতের কাছে সাজাইয়া রাখা অসম্ভব। মায়ের তুলনা একমাত্র মা। আবার ইহাও দেখিতেছেন—ভোগের সহায়ক না হয়; ত্যাগীর জীবন, সেইরূপ ব্যবস্থা। কতো কথাই তাহাদের বলিতেছেন। যাহাতে নিয়মভঙ্গ না হয়, আবার শরীর ও মন সুস্থ থাকে সেইভাবে সব বলিতেছেন, ব্যবস্থাও করিতেছেন। কতো লিখিব! ইহা কি সব দেখা সম্ভব? যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাহারাই কিছু কিছু অনুভব করিবেন। আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! বার বার মনে হয়—কে ইনি? আমরা কিছুই বুঝিলাম না, জানিলাম না। কতো বড়ো অন্ধতা, মূর্খতা!

এই সব কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে মা শিবরাত্রিতে পূজার সব ব্যবস্থা করিতে গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন, তাই চিত্রা, গঙ্গা প্রভৃতি মেয়েরা সব ঠিক করিতেছিল। মায়ের নির্দ্দেশমত এখন সব ঠিক করা হইল। প্রায় ৮০জন পূজা করিবে। প্রতি বছরের মত এবারও সকলে যথাসময়ে

পূজায় বসিল। বৃদ্ধ পান্নালালজী এবারও পূজাতে যোগদান করিয়াছেন। তাঁর মেয়ে লীলা ও জামাই রামেশ্বর সহায়-ও আসিয়াছে। আরও অনেকেই আসিয়াছেন। চার প্রহরই অনেকে পূজা করিলেন। মা-ও বসিয়া রহিলেন। নূতন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান যাহারা নিয়াছে তাহারাও নিজেদের ঐ ঘরেই চার প্রহর পূজা করিল। শিবরাত্রির অপূর্ব্ব শোভা এবারও হইল। কীর্ত্তন, ভজন, স্তোত্রপাঠে 'বাঘাট হাউস' মুখরিত হইয়া উঠিল।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

কাজ সমাধা হইয়া গেলে আজ যজ্ঞাগ্নিতে রান্না হইল এবং তাহা হইতে অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রহ্মচারীরা আহারে বসিলেন; মা-ও আজ তাহাদের ইচ্ছায় তাহাদের ঘরে আহারে বসিয়াছেন। স্থানের আবহাওয়া যেন কি এক অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। কতো পবিত্র! কতো সুন্দর! ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কাল তো মায়ের সারা রাত এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে। আজ ভোর না হইতেই মা ব্রহ্মচারীদের ঘরে গিয়া পূজার স্থান সব পরিষ্কার করাইয়া আজিকার যজ্ঞ ইত্যাদির সব ব্যবস্থা করাইতে লাগিলেন। আর ব্রহ্মচারীদের বলিলেন—"কাল সারা দিনরাত এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে তোরা একটু শুইয়া পড়্। আবার তো ভোর হইতেই নিত্যকর্ম সব করিতে হইবে।" তাহারা মায়ের আদেশে একটু শুইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে মা নিঃশব্দে আমাদের ২/৩ জনকে দিয়া সব গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। সকলকেই চুপ করিয়া কাজ করাইতেছেন। ব্রহ্মচারীদের নিদ্রাভঙ্গ না হয়, ইহারা তিন জনই পরিশ্রান্ত। কিছুদিন যাবৎ এই সব ক্রিয়া চলিতেছে, তা ছাড়া কাল তো দিনরাত্রি উপবাস, জাগরণ ইত্যাদি গিয়াছে। আবার আজও ভোর হইতে নিত্যক্রিয়া, গায়ত্রী, আহুতি সব আরম্ভ হইবে। তাই

মায়ের এই সব বিধান। আজ আহুতি ইত্যাদি শেষ করিয়া জলপান করিতে হইবে। মা যজ্ঞকাষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদীর কাছে সাজাইয়া রাখাইলেন। আরও কত কী করাইতেছেন—কাহারও ধারণাতেও আসিবে না। এই সব সাজাইয়া মা নিঃশব্দে নিজের উপরের ঘরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে শৈলেশকে বলিয়া গেলেন যথাসময়ে যেন ইহাদের উঠাইয়া দেওয়া হয়। মায়ের নির্দ্দেশ মত সব হইল।

এই সব লিখিতে এইজন্য ইচ্ছা হইল যে মায়ের এই সব কাজেও কী অদ্ভুত দক্ষতা, পবিত্রতা, নিপুণতা ও স্নেহমমতা। যে তাহা লক্ষ্য করিবে আশ্চর্য্য না হইয়া পারিবে না। কিছুই লিখিতে পারিলাম না এই মায়ের ব্যবহারের কথা—এই দুঃখ।

সব ঠিক করিয়া দিয়া ব্রহ্মচারীদের হরিদ্বারে রাখিয়া মা সকলকে লইয়া আগামীকাল রাত্রিতে আগা সাহেবের সেলুনে দিল্লী রওনা হইবেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

১৬ই ভোরে আমরা দিল্লী পৌঁছিয়া আশ্রমে আসিয়াছি। হরিবাবার আগ্রহে এখানে দোল অবধি থাকিবার কথা হইয়াছে। মা প্রত্যহই প্রায় ১০টায় হরিবাবার ওখানে সৎসঙ্গে যান; প্রায় ১২টা/১২॥টায় ফিরিয়া আসেন। ডালমিয়া এবং আরও কেহ কেহ মিলিয়া উৎসব করিতেছেন। হরিবাবা গৌরাঙ্গের লীলা করাইতেছেন। সন্ধ্যা ৬টার সময়ে মা 'হলে' বসেন। তার পরে 'প্রাইভেট' চলিতে থাকে।

কখনও কখনও মা বলেন 'শুধু অক্ষর চিন্তা করিলেও হয়—অক্ষররূপী ভগবান।'

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

দিদিমার কথা উঠিয়াছে। মায়ের উপরের ঘরে মায়ের কাছে শুধু আমি আছি; একটু দূরে দিদিমা চেয়ারে বসিয়া আছেন। মা আস্তে আস্তে আমাকে বলিতেছেন—"দেখ্ দিদি! মার (দিদিমার) অনেকটা দেখি এই এই করিতেছে, বসিতেছে। এতোই গুপ্তভাবে আছে যে কাহারও কিছু জানিবার উপায় নাই, বুঝিবার উপায় নাই। এই ভাবেই ইহাদের থাকা।" আমি বলিলাম—"মা! বহুদিন পূর্ব্বে এইভাবের কথা তুমি আমাকে বলিয়াছিলে। ইহাদের জন্য একটু ভাল থাকার ইত্যাদি ব্যবস্থা ঢাকায় করিতে চেষ্টা করিতেই তুমি বলিয়াছিলে,—"ইহাদের জন্য খুব বেশী কিছু ব্যবস্থা করিও না, ইহাদের এইভাবেই থাকা। বেশী করিলে সহ্য হইবে না।" মা এখনও এই কথারই সমর্থন করিলেন। কোথাও যাওয়া আসার সময়ে মা দিদিমাকে রাখিয়া গেলে 'নমো নারায়ণ' বলিয়া ভূলুণ্ঠিত ভাবে পায়ে মাথা লাগাইয়া প্রণাম করেন। কখনো বা হাতজোড় করিয়া 'নমো নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করেন। দিদিমারও এখন শিশুর মত অবস্থা হইয়া যাইতেছে। বয়স ৮৫ বছর হইল। মাকে ছাড়িয়া থাকিতেই চান না। মা যেখানে বসেন, সেইখানেই দিদিমা গিয়া বসিবেন। কেহ খাওয়ার জন্য ডাকিলেও বলেন 'এখন খাইতে ইচ্ছা নাই। পরে খাইব।' আমরা এই সব কথা নিয়া হাসিলে, দিদিমাও হাসেন। বাস্তবিক দিদিমার মত চরিত্র দুর্লভ। বহু লোক ইঁহার নিকট দীক্ষা নিতেছেন। আমিও বলি—হয়তো বড়ো বড়ো

সাধুদের মত বিদ্বান দিদিমা নহেন, কিন্তু প্রকৃত সাধুজনোচিত সহজভাব ইঁহার আছে। সেই জন্য ইঁহার কোনও চেষ্টা করিতে হয় নাই। আমি তো আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর দেখিতেছি। ক্রোধ, লোভ, অহংকার, দ্বেষ, হিংসা দিদিমার মধ্যে একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সকলের উপরেই স্নেহপ্রীতির ভাব। কাহারও দোষ ত ইঁহার চোখেই পড়ে না। খুব যে দোষী, তাহার সম্বন্ধেও কোনও আলোচনা হইলেই ইনি অমনি তাহার মধ্যে কোনও একটা গুণ দেখাইয়া দিবেন-ই। আমরা ইহা নিয়া কতো আনন্দ করি। অদ্ভুত এই ভাব। যাঁহারা ইঁহাকে দেখিতেছেন, তাঁহারাই আমার এই কথার সত্যতা অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

একদিন কথা প্রসঙ্গে মায়ের পুরাতন কথা হইতেছিল—বিভূতি প্রকাশের কথা। তখন মায়ের হাতে যাহা কিছু থাকিত, তাহা দিয়া দিলেই যে কোনও রোগী আরোগ্যলাভ করিত। হাতে হয়তো ৫/৭ দিন হইল একটা তেঁতুলই রহিয়া গিয়াছে, হাত খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই; সেই তেঁতুল মা কাহারও প্রার্থনায় দিয়া দিলেন, রোগী ভাল হইয়া গেল। আবার কাহাকেও কিছু বলিয়া দিলেন, রোগী ভাল হইয়া গেল। এই সব কথা উঠিল। তাহাতে মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ কি রকমটা যেন হইয়া যাইত। তারপরেই এসব বন্ধ করিয়া দেওয়ার খেয়ালটা হইয়া গেল।"

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

আজ প্রভুদত্তজীর আহ্বানে বেলা প্রায় ৩টায় মা বৃন্দাবন রওনা হইলেন। আগামী কল্য বৈকালে ফিরিয়া আসিবার কথা। আজ সকালে উঠিয়াই বলিতেছেন—"দেখ্ দিদি! একটা কান্না শুনিতেছি।" তখন আমি বলিলাম—"মা! কিছুক্ষণ হইল তার আসিয়াছে বম্বেতে যে আর্টিস্ট্ ছিলেন যশোবেনের স্বামী তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন।" মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"তুই তো এই শরীরের কাছে কিছু বলিস্ নাই!"

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

মা হরিবাবার আশ্রম হইতে আসিয়াছেন। একটু সময় 'হলে' কীর্ত্তন করিলেন। টিহরীর মহারাজা মহারাণী ও আরও অনেকে মাতৃদর্শনে আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে মা উপরে চলিয়া গেলেন।

আজ রাজঘাট হইতে রেহানা মাঈর আসার কথা। ২টার পরে কমলা জয়শওয়াল তাঁহাকে নিয়া আসিল। সঙ্গে যমুনালাল বজাজজীর মেয়ে মদালসা ও আরও কয়েকজন আছে। শুনিলাম ইনি মুসলমান কিন্তু হিন্দু ভজন কীর্ত্তন ছোট বেলা হইতেই ইঁহার প্রিয়। অতি সুন্দর গান গাইতে পারেন। তাঁহার বিবাহ স্থির হইল। পাত্রপক্ষ বলিল বিবাহের পর এই সব হিন্দু ভজন কীর্ত্তন আর করিতে দিবে না। এই কথা শুনিয়া ইনি নাকি আর বিবাহই করেন নাই। সাধন ভজন কীর্ত্তনাদি করিতেন। শেষে প্রায় ৭/৮ বছর নাকি মহাত্মা গান্ধীর কাছে ছিলেন। অনেকেই ইঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন এবং ইঁহার কাছে আসা যাওয়া করেন। মায়ের কাছে আসিয়া তিনি মাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মায়ের হাত দুখানি

আদরে চুম্বন করিলেন। মা-ও 'মা মা' বলিয়া যেমন করেন, তেমনি করিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সকলে বসিয়া রহিলেন। রেহান মাঈ-ও চুপ করিয়া মাথা নামাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া রহিলেন। তারপর সঙ্গের ভদ্রলোক দুটিকে ধরিয়া মাকে বলিলেন 'ইহারা আমার ধর্ম্মপুত্র'। সঙ্গীয় একটি মহিলাকে দেখাইয়া বলিলেন—'ইহার সঙ্গে কতো জন্ম ধরিয়া একসঙ্গে আছি।' যমুনালালজীর মেয়েকে দেখাইয়া বলিলেন—'এই আমার ভাইঝি। যমুনালাল আমাকে বোনের মতই দেখিতেন। তাই এইটি ভাইঝি। এ বড়ো শয়তান।' এই বলিয়া আদরের দু/একটি কথা বলিলেন। তার পরে মায়ের সঙ্গেও দু/চারটি কথা হইল। আমরা ফুলের মালা গলায় দিয়া দিলাম। তাঁহাকে ও উপস্থিত সকলকে চন্দনের মালা দেওয়া হইল। মা তাঁহার গলায় একটি তুলসী মালা দিতে দিতে বলিলেন—'সকলে মালা গলায় দিতেছে। আমিও এই মালাটি মাকে দিলাম।' এই কথা বলিয়া মা তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। মায়ের ইঙ্গিতে আমি তাঁহার গায়ে একখানি নামাবলী জড়াইয়া দিলাম। তিনি মহা আনন্দের ভাব প্রকাশ করিয়া মালাটি হাত দিয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মদালসা বহিন বলিলেন—'পিসিমা! তুমি মালা নিয়া এতো নাড়াচাড়া করিতেছ, মালার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িবে।' মা হাসিয়া বলিলেন—"মালার উপর দৃষ্টি পড়া তো ভালই। সকলের মালা নিবার ইচ্ছা হইবে। এই দেখ না মা মালা নিয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। ইহাতে সকলেরই দৃষ্টি পড়িবে।" এই কথায় সকলেই আনন্দে হাসিয়া উঠিল। রেহান-মা বলিলেন—"মা! আমার খুবই ইচ্ছা ছিল মায়ের নিকট হইতে একটু জিনিস নিব। তাই সেদিন বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম।" নানা কথার পর মা পুষ্পকে একটি গান করিতে বলিলেন। পুষ্প গান করিল।

মা তখন হাসিয়া বলিলেন—"মায়ের গানের রাস্তা খুলিয়া দেওয়া

হইল।” আনন্দে হাততালি দিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—“মা, মা! বাঁশরী শুনূঙ্গী।” শোনা গিয়াছিল ইনি গলায় সুন্দর বাঁশরীর আওয়াজ করেন। তিনি গান ধরিলেন—“বাঁশরী শুনূঙ্গী ম্যায় তো যানে নহি দূঙ্গী” ইত্যাদি। তিনি গানের পদ বলেন আর মধ্যে মধ্যে এমন সুন্দর গলায় বাঁশীর শব্দ করেন তাহাতে সকলের বেশ আনন্দ হইল।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রেহান মাঈয়া যাইবার অনুমতি চাহিতেই মা বলিলেন—‘আসিবার কথা এই শরীর বলিযাছে, যাইবার কথা বলিবে না।’ এই বলিয়া হাসিতেই সকলে হাসিয়া উঠিলেন। রেহান-মাও আনন্দে হাসিয়া চুপ করিয়া বসিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন—‘এখন কী করি? আবারও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। আবার দু/একটি কথাও বলেন। শেষে বলিলেন “মা! যাইতে তো ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যাইতে হইবে। ওখানে লোক বসিয়া আছে। এবার আর তোমার অনুমতি চাহিলাম না—মন তো তোমার কাছেই।” এই বলিয়া উঠিতে উঠিতে মাটিতে বসিবার স্থানটি দেখাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—“এই স্থানটাতে কী যেন আছে, আটকাইয়া রাখিয়া দেয়।” তাঁহার শিশুর মত এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে আবার হাসিয়া উঠিল।

একটা কী কথায় মা-ও বেশ শিশুর মত—‘মায়ের মুখে এই কথা শুনিব’—বলিয়া ঠিকঠাক হইয়া বসিলেন। রেহান-মা বলিলেন—‘আমিও তো এই কথা বলিতে পারি।’ (অর্থাৎ ‘মায়ের মুখে শুনিব’—কথাবার্ত্তা হিন্দীতে হইতেছিল)। মা আবারও বলিলেন—‘মায়ের মুখে শুনিব।’ রেহান মাঈ হাসিয়া বলিলেন—‘আমি মায়ের কাছে কিছু বলিব না। অবশ্য অপর জায়গা হইলে আমিও কতো কী উপদেশ দিয়া থাকি। কিন্তু এখানে কিছু বলিব না।’ এই কথাতেও সকলে হাসিয়া উঠিলেন। মাকে কী একটি কথা বলায় মা বলিলেন—‘যা কিছু এই শরীরটার, সবই

তো মা হইতেই (রেহান-মাকে দেখাইয়া) প্রকাশ। মায়ের আছে, তবেই না এই শরীরের হইয়াছে।' এই কথাতেও সকলে আনন্দ করিতে লাগিল।

বিদায়ের সময়ে রেহান-মা মাকে আবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন—'পেট ভরিতেছে না'। আবার মায়ের হাত দুখানি ধরিয়া চুম্বন করিলেন। সঙ্গীয় সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিতেছেন দেখিয়া রেহান-মা ও তাঁহার সঙ্গীয় সকলে আপত্তি করিলেন। মা বলিলেন—'আচ্ছা, সিঁড়ি অবধি যাই।' এই বলিয়া নীচে নামিয়া পড়িলেন। রেহান মা যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কোন্ সিঁড়ি?' গাড়ী ময়দানে আছে। বারান্দা হইতে সেইখানে নামিবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন 'আচ্ছা, এই সিঁড়িতে দাঁড়াইলাম।' বার বার মায়ের দিকে চাহিতে চাহিতে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে তাঁহারা গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মা নিকটেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। রেহান-মা মাকে দেখিয়া আবার গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া বলিতেছেন—'তুমি রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিও না, ঘরে যাও'। এই বলিয়া আবার গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মা ঘরে চলিয়া গেলেন। এই করিতে করিতে প্রায় ৫টা বাজিয়া গেল।

মা খাওয়া দাওয়া সারিয়া (আজ কয়দিন হইল মা বৈকালেই যাহা হয় একটু আহার করেন) আজ আর ৬টার দর্শনের সময়ে নীচে গেলেন না। সকলে উপরেই আসিলেন মাতৃদর্শনে। দেরাদূনের নওলকিশোরের আগ্রহে দেরাদুন আশ্রমে প্রতি মাসে রামায়ণ পাঠ হয়। নওলকিশোর এখানে আসায় আজ এখানেই রামায়ণ শুরু হইয়াছে। মা সেইখানে গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ছেলে এবং আরও কয়েকজন মায়ের দর্শনে আসিলেন। পূর্ব্বেই কথা ছিল ইনি মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মায়ের সঙ্গে

কথা হইল। সে-সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে যাহা শুনিলাম তাহা এই—শুনিলাম ইনি নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নিজেই যদি নিজের সব করিতে হয়, তবে অন্য কাহারও কাছে যাওয়ার দরকার কি? মা নাকি বলিয়াছিলেন—"যাহা কিছুই কর, শিক্ষক দরকার, শিক্ষার জন্য। ছোট বড় সব কাজই কাহারও না কাহারও নিকট শিক্ষা পাইতে হয়। তাই গুরুর দরকার।"

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১।

আজ সকালে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের A.D.C. পুত্রের সঙ্গে মাতৃদর্শনে আসিয়াছেন। রাত্রে সুইজারল্যাণ্ডের রাজদূত ডাঃ কুটা এবং পাকিস্তানের রাজদূত মিঃ ব্রোহী দুইজনে একত্রেই মায়ের কাছে আসিয়াছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডের রাজদূত ভারতীয় দর্শনে বিশেষ পণ্ডিত। মায়ের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ হইল। মায়ের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা তিনি বার বারই ব্যক্ত করিতেছিলেন। পাকিস্তানের রাজদূত মায়ের সহিত একান্তে কিছু কথা বলিতে চাহিলেন। কিন্তু সুযোগের অভাবে তাহা আজ আর হইল না। মায়ের অনুমতি হইলে আগামী পরশু আবার আসিবেন বলিয়া গেলেন।

১লা মার্চ ১৯৬১।

আজ বিকালে পাকিস্তানের রাজদূত গাড়ীতে মায়ের জন্য ফুলের তোড়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। মাকে দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন তাহা বার বার বলিতেছেন।

মা নিত্যকার প্রোগ্রাম অনুসারে সকালে প্রায় পৌনে দশটায় কোট্‌লার মাঠে সৎসঙ্গে গেলেন। ফিরিবার পথে শ্রীহরি বাবার সহিত ডালমিয়াজীর আগ্রহে তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রীরামেশ্বর সহায়ের (ডাক্তার পান্নালালজীর জামাতা) বাসায় গেলেন। মাকে সেখানে আরতি করা হইল। শ্রীযুক্ত সহায় পূর্ব্বে উত্তর প্রদেশের Chief Conservator of Forests ছিলেন। বর্ত্তমানে Railway Board-এর Timber Adviser হইয়া দিল্লীতে আসিয়াছেন।

সন্ধ্যায় শ্রীহরিবাবাজী মহারাজ আশ্রমে আসিয়া কীর্ত্তন করিলেন। সঙ্গে প্রায় ৫০ জন। খুবই সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

২রা মার্চ ১৯৬১।

আজ হোলি উৎসব। গতকাল রাত্রি হইতে অখণ্ড নামযজ্ঞ শুরু হইয়াছে। সারারাত্রি মেয়েদের কীর্ত্তন চলিয়াছে। দিনে ছেলেরা করিতেছে। এ অঞ্চলে হোলির পরদিন রং খেলার রীতি। সেইজন্য আজ আশ্রমে বিশেষ রং খেলা হইল না। অনেকেই মায়ের পায়ে আবীর দিলেন।

রাত্রে দিল্লীর Chief Commissioner শ্রীযুক্ত ভগবান সহায় সস্ত্রীক মাতৃদর্শনে আসিয়াছেন। মা সৎসঙ্গে ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা কীর্ত্তনের মধ্যে প্রায় একঘণ্টার উপর বসিয়াছিলেন; পরে মা আসিলে মাকে প্রণাম করিলেন।

সাড়ে নয়টায় পাকিস্তানের রাজদূত আজ স্ত্রীকে লইয়া মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলিবার জন্য আসিলেন। ভদ্রলোক মাকে দেখিয়া খুবই প্রীত হইয়াছেন। মায়ের কাছে মন খুলিয়া অনেক কথা বলিলেন। পাকিস্তানে

তাঁহার খুব ভাল আইন ব্যবসায় ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুরোধে তিনি এদেশে রাজদূত হইয়া আসিয়াছিলেন।

ভারতে তিনি প্রায় এক বৎসর ছিলেন। পূর্ব্বে মায়ের কাছে আসিবার সুযোগ হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আধ্যাত্মিক দিকে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ আছে দেখা গেল। কিছুক্ষণ কথা বলিয়া মায়ের কাছে পাঁচ মিনিট একটু ধ্যান করিবার জন্য বসিলেন। কিন্তু মায়ের সম্মুখে তিনি এমন এক অনুভূতি লাভ করিলেন যে পাঁচ মিনিটের স্থানে প্রায় দেড় ঘণ্টা নিশ্চলভাবে আসন করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্তে বার বার বলিলেন যে ঐরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ তিনি পূর্ব্বে আর কখনও পান নাই। মা তাঁহাকে নিত্য অন্ততঃপক্ষে ১৫ মিনিট ধ্যান করিতে বলিয়া দিলেন। তিনি খুব আনন্দ সহকারে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ধ্যান করিবেন এবং বলিলেন যে সুযোগ হইলে আবার মাতৃদর্শন করিবেন।

আজ বিকালে শ্রীযুক্ত কমলনয়ন বাজাজ, তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী মদালসা দেবী ও ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ নারায়ণ (কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী) এবং আরও অনেকে মাতৃদর্শনে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পণ্ডিত নেহেরুর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উপাধ্যায়জীও সঙ্গে ছিলেন।

৩রা মার্চ ১৯৬১।

আজ সকালে মা সাড়ে নয়টায় হরি বাবাজীর কাছে গিয়া সেখান হইতে কোট্‌লার মাঠে সৎসঙ্গে গেলেন। ফিরিতে প্রায় সাড়ে এগারোটা হইয়া গেল। আশ্রমে আজ রং খেলা হইল। মাকেও অনেকে রং দিলেন এবং মা-ও সকলকে একটু একটু রং দিলেন। মায়ের পায়ে রং দিতে বহু বিশিষ্ট

ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হিমাচলের গভর্ণর ও তাঁহার স্ত্রী, টিহরীর মহারাজা ও মহারাণী এবং রাজমাতা, যোগী ভাই এবং রেহানা-মাই।

সন্ধ্যা ছয়টায় মা আবার হরি বাবার কাছে গেলেন। সেখানে কিছু সময় বসিয়া মা বিড়লা মন্দিরে গেলেন। বিড়লা মন্দিরে মাতৃদর্শনের জন্য কয়েকশত স্ত্রী ও পুরুষ সমবেত হইয়াছিলেন। মায়ের ফিরিতে ফিরিতে প্রায় রাত্রি দশটা হইয়া গেল।

রাত্রে রাষ্ট্রপতির A.D.C. তাঁহার পিতাকে লইয়া মায়ের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা মায়ের সঙ্গে একান্তে নানা কথা বলিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহে মা অনেক উপদেশ দিলেন।

৪ঠা মার্চ ১৯৬১।

মায়ের আজ সকলকে নিয়া বৈকাল প্রায় ৫॥০ টায় হুশিয়ারপুর রওনা হইবার কথা। পথে রাজনারায়ণ বাবুর বাড়ী হইয়া যাওয়ার কথা। আজও সকাল হইতে বহু দর্শনার্থী আসিয়াছেন।

পণ্ডিত নেহরুর কন্যা ইন্দিরাকে নিয়া উপাধ্যায়জী আসিয়াছেন। সঙ্গে ইন্দিরার ছেলেও ছিল। সে মায়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বলিল। মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়া গেল।

যাওয়ার জন্য সব জিনিষপত্র বাঁধা হইয়াছে। তাহারই মধ্যে বহুলোক প্রসাদ পাইতেছেন। দর্শনার্থীগণ দলে দলে আসিতেছেন; তাঁহাদিগকে ফল ও মিষ্টি দেওয়া হইতেছে। আবার কেহ কেহ মায়ের সঙ্গে যাইবে, কেহ কেহ এখানে থাকিবে; তাহাদের সঙ্গে এবং অন্যান্য লোকদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা

হইতেছে। সবই একসঙ্গে চলিতেছে। মায়ের কাছে এইরূপ একদিনের ব্যাপার না, প্রায় প্রত্যহ এইরূপ চলিতেছে। অনেকেই বলে মায়ের দরবারেই এই রকমটা সম্ভব। সত্যই তাই।

যাক্, প্রায় ৬টায় এই অবস্থার মধ্যেই মা রওনা হইবার জন্য ময়দানে আসিলেন এবং ঐ ভীড়ের মধ্যেই রওনা হইয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ৯টায় গাড়ী ছাড়ে। বহুলোক ষ্টেশনে উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভক্তদের অনেকেরই চোখে জল।

৫ই মার্চ ১৯৬১।

গাড়ী ভোরবেলা প্রায় ৬টায় জলন্ধর পৌঁছিল। লছমনজী ও তাহার ভাই ডাক্তার সাহেব ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মাকে জলন্ধরে তাঁহাদের সাবিত্রী আশ্রমে নিয়া আসিলেন। শুনিলাম হরি বাবাজী খবর দিয়াছেন মাকে এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করাইয়া যেন ১০টার সময়ে হুশিয়ারপুরে পৌঁছানো হয়। হুশিয়ারপুর এখান হইতে মোটরে প্রায় এক ঘণ্টার পথ। এখানে বহুদিন যাবৎ ইহারা মেয়েদের স্কুল করিয়াছে। স্কুলের মেয়েরা ও আরও অনেকেই মাকে বারান্দায় বসাইয়া আরতি ও কীর্ত্তনাদি করিল। মা কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িলেন। মায়ের জন্য বিছানার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই ছিল। লছমনজী ও তাঁহার ভাইরা বহুদিন যাবৎ মায়ের কাছে যাতায়াত করেন। মায়ের প্রতি ইঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা।

ঠিক ১০টায় জলন্ধরের একটি ভক্ত ভদ্রলোক মাকে হুশিয়ারপুর পৌঁছাইয়া দিলেন। অন্যান্য মোটরে মায়ের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। হরিবাবাজী কীর্ত্তনের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজেই মাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন। মায়ের যাওয়ার পথে কাপড় পাতিয়া রাখা

হইয়াছে। প্রতিবারই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বহুলোক উপস্থিত হইয়াছে মালা ও ফুল নিয়া। মাকে হরিবাবাজী প্রথমে গুরুর সমাধি মন্দিরের সামনে নিয়া গেলেন। ঐখানেই মায়ের বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল। মা একেবারে সমাধি মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া একটু পরে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। হরিবাবা নিজেই মায়ের আরতি করিলেন। দিল্লীতেও হরিবাবা যে বাড়ীতে ছিলেন মাকে একদিন তথায় নিয়া গিয়াছিলেন এবং তখনও হরিবাবাই নাকি মাকে আরতি করিয়াছিলেন। সেই-ই প্রথম; আর কখনও বোধহয় হরিবাবাকে আরতি করিতে দেখি নাই। আজ আবার তিনি মাকে আরতি করিলেন। হরিবাবার ভাবটি বড়োই সুন্দর ও পবিত্র। তিনি মায়ের ও আমাদের থাকিবার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। নিজেই মায়ের ঘরে মাকে পৌঁছাইয়া দিলেন। মা আসিয়াছেন বলিয়া হরিবাবার খুবই আনন্দ।

৬ই মার্চ ১৯৬১।

সৎসঙ্গ নিয়মিত চলিতেছে। মা উপস্থিত থাকেন। মা এক সময়ে বলিতেছেন: "দ্যাখ্, শুইয়া আছি ত, খেয়াল হইতেছে ট্রেণে বা মোটরেই শরীরটা যেন। কি বুঝলি না? অভ্যাসযোগের টানাটানি আর কি!"

১১ই মার্চ ১৯৬১।

আজ মাকে নিয়া হরিবাবা অগস্ত্য আশ্রমজীর আশ্রমে গেলেন। কথা হইয়াছে আগামী ১৪ই মাকে নিয়া হরিবাবা জলন্ধর যাইবেন, তথা হইতে বৃন্দাবনে উড়িয়া বাবার তিরোধান উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া

আবার ১৬ই হরিদ্বার রওনা হইবেন। ১৭ই হরিদ্বারে নটবর ভাই তাহার ভাইয়ের জন্য ভাগবৎ সপ্তাহ মায়ের কাছে আরম্ভ করিবে।

আজ মা সৎসঙ্গ হইতে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া আমাদের সঙ্গে একটু একটু কথা বলিতেছেন। চারথারির রাণী পূর্ব্বের মতন এবারেও তুলসী পাতায় দ্বাদশ অক্ষর নাম, রাধাকৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি লিখিয়া মাকে দিলেন। চারথারির মেয়ে মাইশোরের রাণীও সেইরূপ তুলসীপাতা মাকে দিলেন। মা সেই তুলসীপাতা উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিতরণ করিলেন। মা বলেন: "আমাকে দিয়াছে, সব জিনিসই তো ঘরে ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মা তো সব জিনিসই সকলকে দিয়া দেন)। তুলসীপাতাও ঘরে ঘরে দেওয়া হইল। যাহার ইচ্ছা হয় নাম করিবে।" দিল্লীতেও অনেকে তুলসীপাতা নিয়াছে। এখানেও অনেকে নিতেছে। সেই কথায় মা বলিতেছেন "দ্যাখ, এই তুলসীপাতার কথায় একটা খেয়াল আসিল—কাশীতে একবার উপরের ঘরে শুইয়া আছি—সন্তদাস বাবাজীর ভাগিনেয় (এই শরীরের জাঠতুত ভাই) উপেন্দ্রবাবু কতোকাল মারা গিয়াছে, সে আসিয়া বলিতেছে 'কিছু আমাকে দাও।' তখন এইসব তুলসীপাতার কোনও কথাই ছিল না, ইহা তো অনেক পরে আসিয়াছে। এই শরীর বলিল 'কিছুই তো নাই এখানে।' সে তোকে (অর্থাৎ আমাকে) ইসারায় দেখাইয়া বলিল 'ইহাকে দিয়া তুলসীপাতায় একটু কিছু লিখাইয়া দাও না।' তখন খেয়াল হইল যদি খুকুনী এখন আসে তবে বলিব। সত্যিই দেখা গেল তুই জানি কি জন্য এই শরীরকে নীচে যাইতে বলিতে আসিয়াছিস, তাই বলিতেছিস্ 'মা, একটু চলো না মা, নীচে।' তখন তোকে বলা হইল তুলসীপাতায় কিছু লিখিয়া আনিতে। উহারা বৈষ্ণব ছিল। তুই কি লিখিয়া আনিয়াছিস। এদিকে কি যেন, আমাকে নিতে সাহস না পাইয়া, বিশুকে দিয়া বিরজা মন্দিরে করাইতেছিলি। এই শরীর ওখানে যাইতেই তোকে বলা হইল 'তুলসীপাতায় যাহা লিখিয়াছিস্ একখানা বিশুর হাতে দে।' কি জানি

বলা হইল 'যে চাহিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যে গঙ্গায় বিশু দিবে।' কিন্তু বিশু সেই পাতা হাতে পাইয়াই নাচিয়া উঠিল। বলিল 'আমি আজ চার মাস যাবৎ মাকে একটা কথা বলিতেছি; যাক্ আমি পাইয়াছি, আমার হইয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম "মা, আশুর বাবা-ও তো কাশীতেই তোমার নিকট আসিয়া কিছু দিবার জন্য বলিয়াছিলেন।" মা বলিলেন "হাঁ, সে তো দ্বাদশ অক্ষর নাম ও তুলসীর মালা নিয়া গেল। সবই কিন্তু সূক্ষ্মে। তার মৃত্যুর বহু বছর পরে।" আমি বলিলাম "এতোটা কিন্তু পূর্ব্বে বলো নাই।" মা বলিলেন "হাঁ, তখন বলা হয় নাই।" মা আরও বলিলেন "চারখারির রাণী যখন ইহা কাশীতে পাঠাইল (বোধ হয় মায়ের যাট বছরের জয়ন্তীর সময়ে) প্রায় দেড় বছর দিদির কাছেই পড়িয়াছিল। তারপর একদিন কাশীতেই আশুর (আশু বন্দ্যোপাধ্যায়) ছোট মেয়ে সুন্দর গান করিল; তাহাকে কি দেওয়া হইবে এই খেয়াল হইতেই তুলসী পাতার খেয়াল হইল। তখন তুলসী পাতা বাহির করিয়া তাহাকে একটি দিতেই উপস্থিত সকলেই নিবার জন্য হাত বাড়াইল। সকলকেই দেওয়া হইল। পরে আবার একবার উহারাই পাঠাইয়াছিল। এবার মাইশোরের রাণী দিল, তাই দেওয়া হইতেছে।"

আরও আরও কথা হইল। আলস্য যে কতো দোষের আকর সেই সব বলিলেন। সকলেরই আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে শরীর ও মন ঝরঝরে থাকে। মায়ের শরীর দিয়া যে কতো কাজ হইয়া গিয়াছে, ঢাকায় বাউলের (বসাক) বাসায় কতো অল্প সময়ে কতো রান্না হইয়া গিয়াছিল সেই সব কথাও একটু একটু হইল।

১২ই মার্চ ১৯৬১।

আজ হরিবাবা মাকে গোবিন্দ মন্দিরে নিয়া গেলেন। সেখানে ১০॥০টা হইতে ১১॥০টা সৎসঙ্গ হইল। বৈকালে প্রায় ৬টায় সকলে মায়ের দর্শন পায়।

মা কাহারও কাহারও সহিত একটু কথাবার্ত্তাও বলেন। কাহারও প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতেছেন "নিজেকে পাইলেই তাঁকে পাওয়া, তাঁকে পাইলেই নিজেকে পাওয়া।"

১৩ই মার্চ ১৯৬১।

আগামী কল্য সকাল ৮টায় জলন্ধর রওনা হইবার কথা। তথায় সারাদিন থাকা ও সৎসঙ্গ। হরিবাবাও সঙ্গে যাইতেছেন। রাত্রিতে গাড়ী ধরিয়া দিল্লী হইয়া বৃন্দাবন যাওয়ার কথা। আমরা কয়েকজন দিদিমাকে নিয়া জলন্ধর হইতে সোজা হরিদ্বার চলিয়া যাইব স্থির হইয়াছে।

১৪ই মার্চ ১৯৬১।

আজ বেলা ৮টায় মা হরিবাবা ও অন্যান্য সকলকে নিয়া জলন্ধর রওনা হইলেন। হুশিয়ারপুর হইতে জলন্ধর ২৯।৩০ মাইল। প্রায় একঘণ্টার মধ্যেই জলন্ধর পৌঁছানো হইল। রাম, লক্ষ্মণ, ছোট ভাই, ডাক্তার ভাই সকলে খুব সুন্দরভাবে সেবা করিলেন। ইহাদের গার্লস্ স্কুলে শতাধিক ছাত্রী। বড় ভাই (রাম) প্রধান শিক্ষক। মেয়েদের নিয়া তিনি মায়ের সঙ্গে ফটো উঠাইলেন। মায়ের এক ভক্তের বাসা ও আর এক স্থান হইয়া মা ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। আমরা ৮টার গাড়ীতে রওনা হইলাম; মা রওনা হইলেন ৯টার গাড়ীতে।

১৮ই মার্চ ১৯৬১।

মা ১৫ই দিল্লীতে পৌঁছিয়া ডাক্তার সেনের নার্সিং হোমে সর্ব্বানন্দজীকে দেখিয়া বৃন্দাবন গেলেন। আবার ১৬ই উড়িয়া বাবার তিরোধান উৎসবের

পর বৃন্দাবন হইতে রওনা হইয়া দিল্লীতে অল্প সময় থাকিয়া ১৭ই ভোর বেলা হরিদ্বার আসিয়া পৌঁছিলেন।

স্বামীজী খবর দিলেন গত ১৫ তারিখে কলিকাতার কানু (রেখার স্বামী) দেহত্যাগ করিয়াছে তার আসিয়াছে। কানু বহুদিন যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছিল। তাহার মৃত্যু সংবাদে মনটা খুবই খারাপ হইল। কানুর ও রেখার বড়োই মাতৃভক্তি। ইহাদের স্বভাব খুব ভাল।

আবার আজ তার আসিল যে কলিকাতায় গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা জ্যোতিও আজ সকালে দেহত্যাগ করিয়াছে। মনটা খারাপ হইল। জ্যোতি বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছিল। বিলাত পাঠাইয়া চিকিৎসা করানো হইয়াছিল। দাশগুপ্ত পরিবার মায়ের বিশেষ ভক্ত।

মায়ের চরণে সকলে আমরা মিলিত। দুইজনের মৃত্যু সংবাদ! কিছুদিন পূর্ব্বেই মায়ের পুরাতন ভক্ত বিনয় সেনও দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভক্তগণের কষ্টে আমাদেরও কষ্ট। কিছুতেই কষ্ট হইবে না সেরকম পরমস্থিতি তো এখনও লাভ করি নাই।

এদিকে কিছুদিন যাবৎ বুনিও অসুস্থ। হার্টের জন্য সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে। সেজন্য সকলেই চিন্তিত।

১৯শে মার্চ ১৯৬১।

মা আজ দুইদিন যাবৎ বুনির কাছে সর্ব্বদা যাইতেছেন। অনবরত উহার খাওয়া দাওয়া ও আরামের ব্যবস্থা করিতেছেন। কাল রাত্রিতেও অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। মা-ও পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—"অবস্থা তো শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ভগবান যদি হঠাৎ মোড় ফিরাইয়া দেন

তবে ভিন্ন কথা ; নতুবা কী হয় !” মা এমনভাবে বলেন এবং রোগিণীরও যে রকম অবস্থা, সকলেরই মন খুব খারাপ। আজ কতোকাল—বলিতে গেলে শিশু বয়স হইতে—বুনি রহিয়াছে মাতৃ-চরণে। তাহার এই অবস্থায় কিছুই যেন ভাল লাগিতেছে না।

আজ সকালে বুনিকে একটু ভাল দেখা যাইতেছে। মা নিজে কতো কি খাইয়া খাইয়া উহাকে খাওয়াইতেছেন—আমলকির রস, নিমের রস, পুনর্নবার রস। একটু ছানা, একটু জুস্, একটু ফলের রস ইত্যাদি ইত্যাদি অল্প অল্প খাওয়াইতেছেন, বুনি কিছুই যেন খাইতে পারে না।

উহাকে দেখিয়া আসিয়া মা বলিলেন—“দেখিতেছিলাম প্রথমে এক দেবী মূর্ত্তি এই শরীরটাকে যেন কি দিয়া গেল। তারপর এক বিকট মূর্ত্তি—যেন যমরাজের মূর্ত্তি। ত্রিনেত্র তো দেখা যায় না। কিন্তু এই মূর্ত্তির তৃতীয় নেত্রটাই যেন জল জল করিয়া জ্বলিতেছে। এই শরীর উহাকে ষ্টেশনের মোড় পর্য্যন্ত দিয়া আসিল, বলিল ‘এখন ঐদিকে যাও’।” এই কথা বলিয়া মা বলিলেন “এখন তো গেল ; আবার আসিবে কিনা কে জানে ?” উপস্থিত আমরা বলিয়া উঠিলাম “না, মা, আর আসিবে না।” মা বলিলেন “বলা যায় না।”

দিনরাত বুনিকে নিয়া সকলে ব্যস্ত। মা নিজেই মেয়েদের এক একজনকে নিয়া রাত্রিতে উহার কাছে বসিয়া নাম করিতে বলিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ বসু আসিয়া দেখিলেন। রোগিণীর অবস্থা ভাল নয়।

২২শে মার্চ ১৯৬১।

বুনির অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেও এখনও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। আমরা সকলেই এ বিষয়ে এতো ব্যস্ত ও চিন্তিত যে অন্য কোনও দিকে

মন দিবারই সময় নাই। সকলেই উদ্বিগ্ন; কিন্তু মায়ের লীলা কে বুঝিবে? অকস্মাৎ অনাহুত ভাবে একজন বড়ো ডাক্তার মাতৃদর্শনে আসিয়া উপস্থিত —Major General Dr. Sharma (Army Medical Service)। হরিদ্বারের ন্যায় স্থানে এই যোগাযোগ অভাবনীয়। Dr. Sharma ও Dr. Bose উভয়ে মিলিয়া বুনির ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে বুনির অসুখের আরম্ভ হইতেই মা নানাপ্রকার ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাক্তারদিগকে তাহা বলাতে তাঁহারা সমর্থন করিয়া বলিলেন "উহাই ঠিক ব্যবস্থা হইয়াছে।" মায়ের দেওয়া ঔষধের মধ্যে একটি ছিল পুনর্নবা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

মা এবার এখানে (হরিদ্বারে) আসিবার পূর্ব্বে দিল্লী হইতে হোসিয়ারপুরে হরিবাবার উৎসবে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া মা আমাকে বলিলেন—"দিদি! হরিদ্বারে গিয়া আমাকে পুনর্নবা খাইতে দিও।" আমি কথাটা মনে রাখিলাম। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য যে কী এবং ইহার প্রয়োজন যে কী এবং ইহার প্রয়োজন যে কোথায় তাহা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

হোশিয়ারপুর হইতে মা পুনরায় বৃন্দাবন গেলেন। সেখানে গিয়াও মা স্বপ্নে দেখিলেন কে যেন চামচ করিয়া পুনর্নবার রস খাইতে দিতেছে। এখন এখানে দেখা গেল মায়ের এই সব কথার অর্থ কী? পুনর্নবার রস মা নিজেও পান করিতেছেন, বুনিকেও পান করাইতেছেন।

১০ই এপ্রিল ১৯৬১।

১৭ই হইতে ২৫শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত নটবর ভাই প্যাটেলের উদ্যোগে এখানে ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইল এবং বাসুদেব ভাইয়ের হইল নবাহ

রামায়ণ পাঠ। এই সময়ে মায়ের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা রচিত হইয়াছিল :—

পাঁও পাবন রজ চরণ মে
করকে নত প্রণাম
দীন হীন এক মাঈজী
সদা সদা বিশ্রাম।
ভাও পুষ্প কো গুঁথ কর
লেকর আঈ মালা
বিনয় কঁরু করজোড় কর
মা করো স্বীকার।
সুগম অগম শুদ্ধবোধময়ী
তব লীলা অপার
মূর্ত্তিমান গায়ত্রী
বেদশাস্ত্রকী সার
শক্তি মুক্তি করুণাময়ী
মা মূর্ত্তি প্রয়াগ।

খুবই আনন্দ উৎসবের মধ্যে হরিদ্বারের দিন কয়টি অতিবাহিত হইয়া গেল।

নিতাইয়ের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল মা কয়েকটা দিন তার কন্‌খলের বাড়ীতে থাকেন এবং দিদিমায়ের সন্ন্যাসোৎসবও ঐখানেই হয়। এই জন্য হরিদ্বারের উৎসবের পরে মাকে ও আমাদিগকে কন্‌খলে নিতাইয়ের বাসায় আনা হইল। নিতাই আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে। বাস্তবিক, তাহার আন্তরিকতায় আমরা সকলে মুগ্ধ হইলাম।

১৩ই এপ্রিল ১৯৬১।

আজ দিদিমার সন্ন্যাসোৎসবের তিথি। কয়েকদিন হইতেই উৎসবের আয়োজন চলিতেছিল। নিতাইর বাড়ীর (নাম "শান্তি নিকেতন") চতুর্দিকে রঙ্গীন কাগজের পতাকা সাজানো হইয়াছে। আজ মা সকাল হইতেই কোথায় কীভাবে কী করিতে হইবে সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠিক করাইতেছেন। সন্ন্যাসোৎসবের প্রোগ্রাম এইরূপ :—

প্রাতঃকাল	৫টা—৮টা	উষা কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি
	৮টা—৯টা	গীতা, চণ্ডী, ভাগবৎ ইত্যাদি পাঠ
	৯টা—১০॥টা	গুরুকথা
	১০॥টা—১১টা	শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী মহারাজের ভাষণ
	১১টা—১২টা	বম্বে সন্ন্যাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর এবং অন্যান্য মহাত্মাগণের ভাষণ।

ইহা ভিন্ন মহামণ্ডলেশ্বর পূর্ণানন্দজী ও মহামণ্ডলেশ্বর জগদীশ্বরানন্দজীও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মা ও দিদিমার প্রতি তাঁহাদের ভক্তি অর্পণ করিলেন। মায়ের প্রতি তাঁহাদের সুগভীর ভক্তির পরিচয় পাইলাম। কেহ কেহ ভাষণের মধ্যে বলিলেন "মায়ের সামনে কিছু বলবার শক্তি কারও আছে ? টুটি ফুটি যা' এসে যাচ্ছে তাই বলে যাচ্ছি।" ইত্যাদি।

প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল :—

১২টা— ৫টা	...	কীর্ত্তন
৫টা— ৬টা	...	রামায়ণ পাঠ
৬-৩০টা—৭-১৫মি	...	মহামণ্ডলেশ্বর কৃষ্ণানন্দের ভাষণ
৭-১৫মি— ৮টা	...	আরতি, কীর্ত্তন
৮টা—৮-৪৫মি.	...	রামায়ণ পাঠ

এই রামায়ণ পাঠ নূতন ধরণের। ৮/১০ জন হারমোনিয়াম সহযোগে

কীর্ত্তনের সুরে রামায়ণ পাঠ করিলেন। মূল গায়ক কন্‌খলের ভগবান বল্লভ।

৮-৪৫মি—৯টা ... মৌন।

প্রোগ্রাম সমস্তটাই খুব ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গেল।

এদিকে এবার হরিদ্বারে ও কন্‌খলে বেদান্ত সম্মেলন হইতেছিল। একদিন মহামণ্ডলেশ্বর পূর্ণানন্দজী বিশেষ আগ্রহ করিয়া মাকে বেদান্ত সম্মেলনে নিয়া গেলেন। আবার স্বামী অসঙ্গানন্দজীও মাকে তাঁহার আশ্রমে নিয়া গেলেন।

একদিন বিড়লাজী আসিলেন মাতৃদর্শন করিতে। মোদীনগরের মোদীজীও সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত। উত্তর প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী গোবিন্দ নারায়ণজী আসিয়াছেন। তিনি উত্তরকাশী যাইতেছিলেন। হরিদ্বারে মা আছেন সংবাদ পাইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে অন্যান্য দশ জন অফিসার আসিয়াছেন। সকলে মিলিয়া খুব আনন্দ করিয়া মায়ের কাছে বসিলেন, প্রসাদ পাইলেন। পরে এই স্থান হইতেই তাঁহারা উত্তরকাশী চলিয়া গেলেন।

এদিকে কবিরাজ মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন কিছুদিন যাবৎ। এখানে আসার পরই মা তাঁহাকে নানা রকম পথ্য ও ব্যবস্থা দিতেছেন। ইতিমধ্যে মা তাঁহাকে হরিদ্বার হইতে দিল্লা পাঠাইয়াছিলেন, অসুখের বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

নিতাইয়ের অনুরোধে স্থির হইল তাহার বাড়ীতে বড়ো বড়ো মেয়েদের সাধন ভজনের ব্যবস্থা হইবে।

মায়ের শরীর পূর্ব্ববৎ খারাপই চলিতেছে। তথাপি মা সকল কাজই চালাইয়া যাইতেছেন। ব্রহ্মচারী ছেলেরা "বাঘাট হাউসে" আছে।

শরীরের এই অবস্থাতেই মা মাঝে মাঝে সেখানে যাইতেছেন এবং সব ব্যবস্থা করিতেছেন।

২১শে এপ্রিল ১৯৬১।

গোয়ালিয়রের মহারাণীর বিশেষ প্রার্থনায় হরিদ্বারের সব উৎসবাদি সমাপন করিয়া মা ১৬ই রওনা হইয়া ১৭ই আসিয়া গোয়ালিয়র পৌঁছিলেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা অসুস্থ। সুতরাং মহারাণীই মাকে নিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। মায়ের সঙ্গে আমরা প্রায় ৩০/৩২ জন। ইঁহাদের ব্যবস্থা সব অতীব সুন্দর। লোকজন যেন যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যাইতেছে।

অবধূতজী ও চেতন গিরিজী মহারাজও আসিয়াছেন। সঙ্গে রাস-পার্টিও আসিয়াছে। মহারাণী দিল্লীর কীর্ত্তন পার্টিকে আনাইতে চাহিলেন। তাহাই হইল। দিল্লীর কীর্ত্তন পার্টির প্রায় ২৫ জন আসিয়া উপস্থিত। খুব জমাইয়া নামযজ্ঞ হইল।

মহারাজাও মা'র নিকট আসেন। অবশ্য তাঁহার অবস্থা ভয়াবহ। শ্বাসের গতিও বিশেষ ভাল নয়। মাকে পাইয়া অবশ্য তিনি শিশুর মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

একদিন সনাতন ধর্ম্মসভাতেও মাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে মাকে স্বাগত করিয়া মণ্ডলেশ্বর সদানন্দজী প্রবচন করিলেন।

এখানে মাকে নানা মন্দির দেখাইতে নিয়া যাওয়া হইল। মন্দির চারটি। একটিতে পূর্ব্বেই শিব স্থাপিত ছিলেন। সেখানে রাজার গর্ভ-ধারিণীর প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। বড়ো সুন্দর মূর্ত্তি—ঘোমটা মাথায় যেন জীবন্ত মানুষ বসিয়া আছেন। একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, অপর

এক মন্দিরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে বড়ো মন্দির—তাহাতে সত্যনারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন। মূর্ত্তি অতি সুন্দর।

প্রতিষ্ঠার দিন রাজা সাহেব দাঁড়াইয়া সব দেখাইতে লাগিলেন। ইহার ভিতরে একটি কথা আছে। রাজা সাহেবের শরীরের ঐরূপ ভয়াবহ অবস্থা, একেবারে শয্যাশায়ী, শ্বাসের গতিও অতীব খারাপ ছিল; অথচ মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ সবই সুষ্ঠুভাবে হইতেছে। মা আমাকে দিয়া রাজা সাহেবের জন্য একটি পথ্যের তালিকা করাইয়াছিলেন এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থাও করাইয়াছিলেন। আমরা মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাইলাম যেন এই শুভদিনে মহারাজের অসুস্থতা কমে। আশ্চর্য্য ব্যাপার—তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিলেন।

রাজার কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলে অতি সুন্দরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সব কাজ যন্ত্রবৎ হইতে লাগিল। সব প্রথাগুলি সেই পৌরাণিক কথাই স্মরণ করাইয়া দিল। মা-ও বলিলেন "কেমন যেন একটা সুন্দর আবহাওয়া।"

সন্ধ্যায় রাস হইল। সাধুদের প্রবচনও হইল। এদিকে নামযজ্ঞও চলিতেছে। সারারাত মেয়েরা এবং সারাদিন ছেলেরা কীর্ত্তন করিল। Fort-এ একটি school আছে। ইতিমধ্যে একদিন মাকে সেখানেও নিয়া গেল। এইভাবে আনন্দ উৎসব করিয়া মা আজ গোয়ালিয়র ত্যাগ করিয়া

২২শে এপ্রিল ১৯৬১।

আজ মা এলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে কাল হইতে ভাগবৎ সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। ৩০শে এপ্রিল শেষ হইবে। বিন্দুদের বাড়ীতে

উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। মায়ের থাকিবার জন্য বিন্দু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এই পরিবারের সকলেই মায়ের বিশেষ ভক্ত। এখানে ভক্তদের সকলকেই খুব যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বিন্দুদের বাড়ীর সকলে এবং সুবোধও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছে।

২রা মে ১৯৬১।

মায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বহু লোক আসিয়াছেন। আজ রাত্রে মায়ের জন্মদিনের উৎসব হইয়া গেল। মা ৺আচার্য্য গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী ও মেয়েদের ঐ সময়ে আনাইয়াছেন এবং তাহাদের ঠাকুর নিয়া আসিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই প্রতিদিন ছয় অধ্যায় গীতাপাঠ আরম্ভ করাইয়াছিলেন। আজ শেষ রাত্রিতে শৈলেশ মায়ের পূজা করিতে বসিল। মায়ের কুঠিয়ার সামনে চৌতরার উপর সেইখানেই ৺গোপাল দাদার মেয়ে কল্যাণী ও গীতা ঠাকুর বসাইয়া পূজায় বসিল। মা-ই কল্যাণীর পূজার সব ঠিক করিয়া দিলেন। রাত্রি প্রায় ৩টা হইতে পূজা আরম্ভ হইল। বহু লোক উপস্থিত ছিল। সাধুরাও উৎসবে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

৩রা মে ১৯৬১।

আজই মায়ের তিথি পূজা। রাত্রি ৩টায় কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী মাতৃপূজা করিল। শ্রীশ্রীহরিবাবা মহারাজজী, শ্রীচেতন গিরিজী, শ্রীঅবধূতজী, শ্রীযোগেশ

ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাত্মাগণ উৎসবে আসিয়াছেন। প্যাণ্ডেলের একধারে মায়ের পূজার স্থান, তাহার পাশেই সাধুদের বসিবার জায়গা। পূজার সময়ে মহাত্মাগণ ও বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। খুবই আনন্দ ও ধুমধামের সহিত এলাহাবাদবাসীগণ মায়ের উৎসব সম্পন্ন করিল। শতচণ্ডী, ১০৮ কুমারী ভোজন ও বালগোপাল ভোজন ইত্যাদি সবই হইয়া গেল।

আজ সন্ধ্যায় পণ্ডিত জওহরলালজী, ইন্দিরাজী ও উপাধ্যায়জী মাতৃদর্শনে আসিয়া অনেকক্ষণ ছিলেন। প্রথমে তাঁহারা মায়ের কুঠিয়ায় আসিয়া বসিলেন। পরে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া প্যাণ্ডেলে বসিলেন। সাধুদের প্রবচন হইতেছিল। রাসপার্টিও আসিয়াছে। রাসপার্টির একটি ছেলে দুই হাতে বাতি নিয়া আরতি ভাবে অতি সুন্দর খেলা দেখাইল এবং ছবি ব্যানার্জ্জির গান হইল।

বোম্বে হইতে কানিয়াভাই সপরিবারে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভূতাভাইয়ের স্ত্রী এবং পুনার নাগপাল ভাইও সপরিবারে আসিয়াছেন। এই নাগপাল ভাই-ই পুনার আশ্রমের জন্য একটি বাড়ী দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অসুস্থ। মা তাঁহাকে হরিদ্বার নিয়া ছিলেন। তথা হইতে দিল্লীতে ডাক্তার সেনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে কমল এবং পথ্যাদির সুব্যবস্থার জন্য হেমীদিদিকেও মা দিয়া দিলেন। মায়ের সমস্ত কাজই এইরূপ নিখুঁৎ। অপারেশন করিতে হইবে স্থির হইল। দিল্লী হইতে গোপীবাবা হরিদ্বার ফিরিয়া গেলেন। বোম্বেতেও আবার পরীক্ষার ব্যবস্থা মা করাইলেন। বিশেষ কাজের জন্য গোপীবাবা হরিদ্বার হইতে কাশী চলিয়া গেলেন। কন্‌খলে থাকাকালে দক্ষালয়ে যে-বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে মা ভাইজীকে নিয়া এক রাত্রি বাস করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষটির কয়েকখানি ছবি নেওয়া হইয়াছিল কবিরাজ মহাশয়ের ইচ্ছা অনুসারে। কবিরাজ মহাশয়, মা, কমল, আমি, সঙ্গীয় সাধুদের ও ব্রহ্মচারিণী মেয়েদেরও কয়েকজনের ফটো গাছের সঙ্গে তোলা হইল।

আমরা মায়ের সঙ্গে দিল্লী হইয়া গোয়ালিয়র রওনা হইলাম। কাজ আছে বলিয়া কবিরাজ মহাশয় কাশী গেলেন। কথা হইল যতো শীঘ্র সম্ভব কাজ শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয় বোম্বে রওনা হইবেন।

এলাহাবাদ হইতে ইতিমধ্যে মা একদিনের জন্য কাশীতে গিয়াছিলেন —কালীদা ও কবিরাজ মহাশয়কে দেখিবার জন্য। পরে কবিরাজ মহাশয় বম্বে রওনা হইলেন। সুব্যবস্থার জন্য মা তাঁর সঙ্গে কমল ও হেমীদিকে দিলেন। ওদিকে বম্বেতে ভাইয়া ও কানিয়াকে খবর দেওয়া হইল কবিরাজ মহাশয়ের সব ব্যবস্থা করিবার জন্য। ডাক্তার শেঠকে বলা হইল তিনি দেখিবেনই এবং অন্যান্য ডাক্তারদের দ্বারা ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। কবিরাজ মহাশয় শিশুর মত মায়ের উপরই নির্ভর করিয়া আছেন। মা-ও মায়ের মতই নিখুঁতভাবে সব ব্যবস্থা করিতেছেন। কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন "মা! অপারেশন যদি করিতে হয় তুমি সঙ্গে থাকিবে না?" মা বলিয়াছিলেন "তোমার জন্যই তো বম্বে যাওয়া হইতেছে, নতুবা হয়তো এখন ওদিকে যাওয়া হইত না। তুমি এখন গিয়া সব পরীক্ষা শেষ কর। শরীর যদি ঠিকঠাক থাকে, এখান হইতে ৫ই রওনার কথা হইয়াছে, ৬ই ওখানে পৌঁছিবার কথা। এ শরীর ওখানে গেলে পর অপারেশনের কথা হইবে।"

৬ই মে ১৯৬১।

আজ মা'র সঙ্গে আমরা বম্বে পৌঁছিলাম। ভাইয়ার বাড়ীর মন্দিরেই মাকে নিয়া যাওয়া হইল। হরিবাবাও ৮।১০ জনকে নিয়া মায়ের সঙ্গে বম্বে চলিলেন। শোনা গেল কবিরাজ মহাশয়ের পরীক্ষা প্রায় সব শেষ হইয়াছে। দিল্লীর এবং বম্বের ডাক্তারগণ রোগ নির্ণয় বিষয়ে একমত। শীঘ্রই

অপারেশন করিতে হইবে। মা একটি দলকে স্বামীজীর সহিত কল্যাণ হইতেই সোজা পুণা পাঠাইয়া দিলেন। মা বলিলেন "সব হইতে ভাল যেখানে হয় সেইখানেই অপারেশনের ব্যবস্থা হইবে।" সকলেই একমত হইল যে এই রোগের ব্যবস্থা বম্বেতেই সব চেয়ে ভাল। তাই গোপীবাবাকে বম্বে পাঠানো হইয়াছিল। মায়ের এখন এই খেয়ালই চলিতেছিল। এতোদিন পর্য্যন্ত খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সব ব্যবস্থা মা কমল ও হেমীদিকে লিখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থার ফলে গোপীবাবার শরীরের দুর্ব্বলতা অনেকটা ভাল বোধ করিতেছিলেন। সব নিয়মিত ভাবে করাইয়া যাইতেছেন।

নাগপাল ভাই পুণাতে আশ্রমের জন্য যে-বাড়ীটি দিয়াছেন সেই বাড়ীতে মা যেন মলমাসের পূর্ব্বেই প্রবেশ করেন—এই প্রার্থনা তাঁহারা মাকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা পতি পত্নী মাকে নিয়া যাইবার জন্য বম্বেতে বসিয়া আছেন।

৮ই মে ১৯৬১।

২রা মে মণ্ডীর রাজার একমাত্র ছেলে অশোকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ৬ই মে ছেলে বউ নিয়া বম্বে পৌঁছিবে, তাই মণ্ডীর রাণীর পূর্বে হইতেই বিশেষ প্রার্থনা ছিল মা যেন ৫ই বম্বে পৌঁছেন, মাকে পূজা করিয়া ছেলে বউ নিয়া ঘরে ঢুকিবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা সম্ভব হইল না। কবিরাজ মহাশয়ের জন্য মা ৬ই বম্বে পৌঁছিলেন। আজ সন্ধ্যায় মণ্ডী মাকে সদলবলে তাঁহাদের বাড়ীতে নিয়া গেল। সেখানে সমুদ্রের ধারে ময়দানে মাকে ও দিদিমাকে বসাইয়া পূজাদি করিল। পরে মাকে অতি

সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে নিয়া বসাইল। ছেলে অশোক মায়ের পিছনে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। ছবি, পুষ্প ও বিভুর কীর্ত্তন হইল। কিছুক্ষণ পরে মা ফিরিয়া আসিলেন।

১৩ই মে ১৯৬১।

আজ ভোরবেলা মা'র সঙ্গে বম্বে হইতে রওনা হইয়া প্রায় ১০॥ টায় পুনাতে পৌঁছিলাম। স্বামীজী মেয়েদের লইয়া ইতিপূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন।

১৫ই মে ১৯৬১।

দুইদিন মাত্র পুণাতে থাকিয়া আজ আবার মা বোম্বে রওনা হইলেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম। অনেকেই পুণাতে রহিলেন। বেলা প্রায় ৮টায় পুণা হইতে রওনা হইয়া মা প্রায় ১১॥০টায় বম্বে পৌঁছিলেন। হরিবাবার সৎসঙ্গ তখন চলিতেছিল। সন্ধ্যাকালে মা হাসপাতালে গোপীবাবাকে দেখিতে গেলেন। ঠিক হইয়াছে আগামী কাল ১৬ই মে মঙ্গলবার সকাল ৯॥০টার সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের অপারেশন আরম্ভ হইবে। পূর্বেই মা ভাইয়াকে এবং ডাক্তার শেঠকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন: "সবচেয়ে ভাল ডাক্তার যাহাকে তোমরা মনে করো, তাহার দ্বারা যেন অপারেশনের ব্যবস্থা হয়; আর হাসপাতালে থাকিবার ব্যবস্থাও তোমরা সবচেয়ে ভাল যাহা মনে করো, তাই করো। ব্যবস্থা সব হইয়া যাইবে।" তাহাই করা হইয়াছে। মা যেদিন পুণা রওনা হন সেইদিনই কবিরাজ মহাশয়কে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা

হইয়াছিল। মায়ের সব ব্যবস্থারই অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। প্রায় ছয়মাস কবিরাজ মহাশয় কাশীতে অসুস্থ। কিন্তু বিশেষ কোনও ব্যবস্থা কেহ করেন নাই। বম্বে আসিয়া মা যখন শুনিলেন কবিরাজ মহাশয়ের অপারেশন স্থির হইয়াছে, তখনই মা তাঁর আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও গুরুভাইদের নিকট খবর দেওয়াইলেন যে এই অবস্থায় যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে, তবে যেন টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়া দেয়। খবর আসিল কাহারও কিছু বলিবার নাই, মায়ের উপরই নির্ভর, মা যাহা করেন, তাহাই হইবে। অপারেশনের দিনস্থির হইলে মা কবিরাজ মহাশয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী কয়েকজনের নিকট টেলিগ্রাম করাইলেন। শ্রীযুগলকিশোর বিড়লাজী মায়ের চরণে কবিরাজ মহাশয়ের আরোগ্য কামনা জানাইলেন। তিনি কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের মত মহৎ ব্যক্তির জন্য ব্যস্ত হওয়া সকলেরই স্বাভাবিক।

গোয়ালিয়রের মহারাজা কিছুদিন যাবৎ খুবই অসুস্থ। মহারাজার আরোগ্য কামনা করিয়া মহারাণী শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি ১০ই মে মাকে ও হরিবাবাকে তাঁহাদের প্রাসাদে নিয়া গিয়াছিলেন। প্রাসাদের নাম 'সমুদ্র মহল'। জায়গা খুবই সুন্দর। প্রাসাদের সামনেই সমুদ্র। একটি বিরাট গাছের নীচে শিবমন্দির দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখে ১০।১১ জন ব্রাহ্মণ পূজা করিতেছেন। মা আসিবামাত্র তাঁহারা উঠিয়া মাকে মালা পরাইলেন। মায়ের উপস্থিতিতে তাহাদের পূজা সমাপ্ত হইল। মা মহলে প্রবেশ করিবেন না, তাই মা বাহিরে রহিলেন। হরিবাবা ও আমি ভিতরে মহারাজাকে দেখিতে গেলাম। তিনি আমাদের দেখিয়া মহা খুশী। মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাইতে লাগিলেন। হরিবাবা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরিবাবার নিত্যনিয়মিত সৎসঙ্গাদি ভাইয়ার বাড়ীতে হইল। এই বাড়ীর পাশেই সুরেশ কলোনিতে শ্রীযুক্ত হরিবাবার থাকিবার ব্যবস্থা

হইয়াছে। হরিবাবাকে তাঁহার ভক্তরা আগামীকল্য অন্যত্র নিয়া যাইবে। তথা হইতে পুণা যাওয়ার কথা বলিলেন। হরিবাবাজী বলিলেন আগামীকল্য ভোর বেলা কীর্ত্তন করিয়াই বাবার যেখানে থাকিবার কথা হইয়াছে সেখানে তিনি চলিয়া যাইবেন। সেইরূপই সব ব্যবস্থা করা হইল।

১৬ই মে ১৯৬১।

আজ ভোর ৪টা-৪৷৷টায় মা চিন্ময়ানন্দকে নিয়া হরিবাবা যেখানে আছেন, সেইস্থানে কীর্ত্তনে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে আসিয়া ভাইয়ার বাড়ীর নিজ কুঠিয়ার সামনে কমল ও চিন্ময়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যাইতেই বলিলেন—"পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম বাবার অপারেশনের সময় বেশী কাহাকেও এখানে রাখা হইবে না, দিদিমাকেও পুণা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। খেয়াল ছিল না, নতুবা পুনায় রাখিয়া আসিলেই হইত। কি বলিস্ তাই করা হউক?" আমি বলিলাম "বেশ তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।" মা বলিলেন "তবে শীঘ্র তৈয়ার হইয়া যা, ৮টায় ট্রেণ আছে। আর দিদিমাকেও পাঠাইয়া দে তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া পাঠাইতে হইবে।" আমি প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেলাম। দিদিমাকে মা'র নিকট নিয়া যাওয়া হইল। তাঁহাকেও কিছু বুঝাইয়া খুসী মনে রাজী করাইয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পুষ্প, উদাস, চিত্রা যাহারা মা'র সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় থাকিয়া সেবা করে তাহারা ত কেহই মা'র কাছে নাই। আমি ও বিমলা ছিলাম—আমরাও চলিলাম। সতী ও চন্দন এবার পুণা হইতে মা'র সঙ্গে আসিয়াছিল আর ছবি ব্যানার্জ্জি আছে। মা হাসিয়া বলিলেন—'এবার তোমাদের উপর

সব ভার পড়িল'—এই কথা বলিয়া মা হাসিলেন। যাহা হইবার হইবে—বলিবার বা ব্যবস্থা করিবার কিছু নাই। যাহা করিবার, মা তাহা ত করিবেনই। শরীর ত মায়ের খারাপই চলিতেছে—অন্য কেহ হইলে হয়ত চলিতেই পারিতেন না। শ্বাসের গতি মধ্যে মধ্যে খুবই খারাপ হয়; শরীর মাথা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আবার একটু কম হইলেই সকলকে খুসী করিবার জন্য সবই করিতেছেন। অনেক দিন যাবতই খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। সকালে এক গ্লাস সরবত নিতেন; আজকাল তাহাও নয়। ১টা-১৷৷টায় ১ গ্লাস শুধু জল খান। সকলের 'প্রাইভেট' দর্শনাদি হইতে হইতে প্রায় ১৷৷টা-২টা বাজিয়া যায়—তাহার পর শুধু জল এক গ্লাস খাইয়া শুইয়া পড়েন। প্রায় ৪ টায় উঠিয়া অতি অল্পই একটু ফল ও দুধ নেন। আবার সব ভীড় কমিলে রাত্রি প্রায় ১১টা-১১৷৷টায় একটু দালিয়া ও তরকারী একটু জুস—তাহাও অতি অল্পই নেন। এই খাওয়া; শোওয়ার ভাব ত রাত্রিতে নাইই—ভোর বেলা একটু চুপ করিয়া খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকেন। তাহার পর ত আর শোওয়ার সময়ই নাই। এই ভাবে চলিতেছে। যাক্, কি করিব; মায়ের আদেশ রক্ষা করিতেই হইবে। মাকে প্রণাম করিয়া আমরা পুণায় রওনা হইয়া আসিলাম। মা যেমন সকলকে বলেন—সাবধান মত যাইও, সাবধান মত আসিও তিনবার বলেন; এক্ষেত্রেও তাহাই বলিলেন। মা কুঠিয়ার বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। আমি নূতন সেবিকাদের যথা সম্ভব একটু কাজ বুঝাইয়া চলিয়া আসলাম।

বেলা প্রায় ১টায় পুণায় পৌঁছিলাম। আশ্রমে পৌঁছিতে ১৷৷টা ২টা হইল। মিসেস নন্দা প্রমীলাকে ফোন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সে স্টেশনে উপস্থিত ছিল। সকলেই আশ্চর্য্য—মা কাল সকলকে আমাদিগকে নিয়া গেলেন আজ আবার পাঠাইলেন কেন? আমি

জবাব দিলাম—মায়ের লীলা। রাত্রিতে তার আসিল ৯।৪০ মিনিটে অপারেশন আরম্ভ করিয়া ১টা-৩০ মিনিটে অপারেশন শেষ হইয়াছে—ভালমত অপারেশন শেষ হইয়াছে, জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। অপারেশনের সময়টা কীর্ত্তন জপাদির ব্যবস্থা বম্বে ও পুণায় করা হইয়াছিল।

১৯শে মে ১৯৬১।

দিদিমা, বিমলা ও আমি মায়ের আদেশ মত আজ বম্বেতে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া কবিরাজ মহাশয়ের operation এর দিনের বিস্তৃত খবর শুনিলাম। আমরা পুণা রওনা হইয়া যাইবার পরই মা নিজের ঘরে শুইয়া পড়িলেন। ৯।৪০ মিনিটে phoneএ খবর আসিল কবিরাজ মহাশয়কে operation এর ঘরে নেওয়া হইয়াছে। মাকে সতী এ খবর দিতে আসিয়া দেখিল মা উঠিয়া bathroom-এ গিয়াছেন। মা খবর শুনিয়া কিছু বলিলেন না। তাঁহার মুখে স্বাভাবিক প্রসন্নতার ভাব ছিল—চিন্তার কোনও ছায়া ছিল না। মা একটু পরে নারায়ণ স্বামীজীকে নিয়া হরিবাবার সৎসঙ্গে চলিয়া গেলেন। প্রায় ১১॥ টার সময় ফিরিয়া আসিলেন। তখন খবর পাওয়া গেল যে আসল স্থান এখনও কাটা হয় নাই। মা একটু পরে নারায়ণ স্বামীজী এবং চিন্ময়কে নিয়া 'জুহু'তে বেড়াইতে গেলেন। সে'দিন একটু মেঘলা মেঘলা ছিল। মা সেখানে একটি জায়গায় কিছুক্ষণ বসিয়া ছিলেন। মা যখন জুহু হইতে ফিরিয়া আসিলেন—তখনও operation এর বিশেষ কোনও খবর আসে নাই। ছবি, বিভু ইত্যাদি ৯-১৫ মিনিট হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা খুব

সুন্দর সুরে প্রাণ ভরিয়া 'মা' নাম করিতেছিল। সকলেরই এক ভাবনা —operation যেন ভাল ভাবে হইয়া যায়। প্রায় ১।টার সময় কমল খবর দিল গোপীবাবুকে operation এর ঘর হইতে নিজের room এ নেওয়া হইয়াছে। নারায়ণ স্বামীজী মাকে এ খবর দিলেন। মা তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলকে ফল দিলেন আর বার বার বলিতে লাগিলেন—তোমাদের শুভ চিন্তার ফলে operation ভাল ভাবে হইয়া গেল। শুনিলাম মা কমলকে বলিয়াছিলেন—তুমি তো শিবরাত্রির উপবাস কর—বাবার operation এর দিন তুমি উপবাসী থাকিও। মায়ের কথা মত মল সেদিন কিছুই খায় নাই। আজ প্রায় একমাস যাবৎ কবিরাজ মশাইয়ের operation এর চিন্তায় সকলেই কাতর ছিল—আজ মায়ের অসীম কৃপাবলে তাঁহার জীবন রক্ষা হওয়াতে সকলেই নিশ্চিন্ত হইল। আরও শুনিলাম মা operation এর আগের দিন রাত্রিতে cancer এর ভয়ানক রূপ দেখিয়া ছিলেন। মুখটা নাকি হাঁ-করা এবং গায়ের মাংসগুলি এবড়ো থেব্ড়ো। পায়ের রং ধোঁয়াটে ছিল। প্রকৃতপক্ষে মায়ের অহেতুক কৃপার ফলে এ যাত্রা কবিরাজ মহাশয়ের জীবন রক্ষা হইল।

মা প্রায় রোজই বিকেল বেলা কবিরাজ মশাইকে দেখিতে hospial-এ যান। এখান হইতে তাঁহার জন্য চার বার করিয়া খাবার পাঠানো হয়। মায়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী খাবার পাঠানো হইতেছে। ইহার মধ্যে একদিন মা কবিরাজ মশাইকে দেখিতে hospital-এ যান নাই। সে'দিন রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে তিনি ভাবিতেছেন—মা তো আজ এলেন না, আমি নিজেই তাঁর কাছে যাব। এই ভাবিয়া নীচে নামিবার জন্য তিনি পা বাড়াইয়াছেন,—ইহা দেখা মাত্র nurse আসিয়া তাঁহাকে বাধা দেয় এবং বলে—"আপনি কোথায় যাইতেছেন।" উত্তরে তিনি বলিলেন—"আমার মা'র কাছে।" পরের দিন nurse জিজ্ঞাসা করে—"এঁর মা কে? আমার

রোগী তো কাল মা'র কাছে যাচ্ছিল।" মাকে একথা বলা হইলে—মা বলিলেন—"বাবার তো বাহিরে এ শরীরটার উপর টানের প্রকাশ ছিল না। ভিতরের ভাবটা প্রকাশ হইয়া গেল।"

প্রকৃত পক্ষে মায়ের প্রতি কবিরাজ মশাইয়ের অদ্ভুত ভক্তি দেখা যাইতেছে। ভাবটা ঠিক শিশুর মত।

২৫শে মে ১৯৬১।

আজ সন্ধ্যাবেলা মাধবতীর্থ নামক একজন এদিককার গুজরাটী সাধুর শিষ্য মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। মাধবতীর্থ মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। শিষ্যটি বলিলেন—তাঁহার গুরুর দেহান্ত হইয়া গিয়াছে। অন্তিম সময় পর্য্যন্ত তিনি নাকি মাকে স্মরণ করিয়াছেন। মায়ের ভাবে মনে হইল মা তাঁহার দেহান্তের খবর আগেই পাইয়াছেন। শিষ্যটি বলিতেছিল—গুরু নাই এখন কি করিয়া সব ঠিক্‌ঠাক মত চলিবে কে জানে। মা বলিলেন —"বাবা! একটা কথা আছে—গুরুর মৃত্যু এবং শিষ্যের তাঁর জন্য শোক করা অজ্ঞানতার কারণে ঘটে। জ্ঞানের উদয়ে শোক করার কিছু থাকে না। জ্ঞানেতে স্বরূপের প্রকাশ হয়।"

মা শিষ্যটির হাতে ফল দিলেন। তিনি ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে অনিল মাকে বলিল—একটি মেমসাহেব কাশীর খুব প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছে। মা বলিলেন—একবার আমি ট্রেণে যাইতে ছিলাম, সেই সময় একটি মেমসাহেব আমাদের compartment-এ উঠিল। সে বলিল—তাহার খুব কাশী নগরী ভাল লাগিয়াছে। উত্তরে মা বলিয়াছিলেন—"তোমার ভিতর কাশী আছে বলিয়াই কাশীকে ভাল

লাগিয়াছে। আসল কথা এই যে ভাল লাগা বা না লাগার কারণ আমাদের মধ্যেই আছে। নিজেকে পাওয়াই আনন্দ। যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে—তাহা আছে ভাণ্ডে।”

২৯শে মে ১৯৬১।

কবিরাজ মহাশয়ের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইতেছে। তিনি এখন একটু একটু হাঁটেন। প্রত্যেকদিন চারবার করিয়া এখান হইতে কবিরাজ মহাশয়ের এখনও খাবার পাঠানো হয়। কবিরাজ মহাশয়ের উপর মায়ের অদ্ভুত খেয়াল। তাঁহাকে কি রকম খাবার দেওয়া হইবে—সমস্তই মা নিজে বলিয়া দিতেছেন। একমাত্র মা'র অহৈতুক কৃপার ফলে কবিরাজ মহাশয় মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার operation করিতে ৩॥ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছেন যদি operation করিতে ইহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগিত, তবে আশঙ্কার কথা ছিল। তিনি operation করিয়া খুসী হইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ৭৪, তাহার উপর আবার এই দুরারোগ্য ব্যাধি। এই অবস্থায়—সব যে মঙ্গলমত হইয়া গেল—তাহা মায়ের অপার কৃপা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে!

কবিরাজ মহাশয়কে হাসপাতাল হইতে ২রা জুন ছাড়িয়া দেওয়ার কথা। বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া তাঁহাকে পুণাতে নিয়া যাওয়ার কথা হইতেছে। মা পুণাতে গেলে হরিবাবাও মহাবালেশ্বর হইতে পুণা আসিয়া বেশ কিছুদিন থাকিবেন।

আজ সকাল ৮টার গাড়ীতে মা পুণা চলিয়া গেলেন। মায়ের সঙ্গে চন্দন, ছবি এবং আরও কয়েকজন রহিল। মায়ের এখানে ১লা জুন ফিরিয়া আসার কথা।

১লা জুন ১৯৬১।

মা আজ পুনরায় বম্বেতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মায়ের শরীর মোটেই ভাল না, কিন্তু সেদিকে যেন খেয়াল করিবার খেয়ালই হইতেছে না। সকলকে খুসী করিয়াই যাইতেছেন। কাহারও বেশী রাত্রিতে 'প্রাইভেট', কাহারও মাকে কোথাও নিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা, কেহ কেহ মা'র বিশ্রামের সময় আসিয়া নিজেদের সুখ দুঃখের কথা বলিবে আরও কত কি আবদার। সবই করুণাময়ী যথাসম্ভব পূরণ করিয়া চলিয়াছেন। মায়ের শরীরের জন্য বাধা দিবার ইচ্ছা সত্বেও আমরা কিছু প্রতিকার করিতে পারি না। মা কাহাকেও একটু জোর দিয়া কথা বলিতে বা কাহারও ইচ্ছায় বাধা দিতে প্রায়ই নিষেধ করেন, কারণ সে ব্যথা পাইবে। উপায় নাই, তাই প্রায় চুপ করিয়াই থাকিতে হয়। মায়ের শরীরের উপর, আমাদের দৃষ্টিতে বলিতে গেলে ভক্তি শ্রদ্ধার উপলক্ষ্যে অত্যাচারই চলিতেছে।

হরিবাবাজী মায়ের সঙ্গে থাকিবার জন্যই এলাহাবাদ জন্মোৎসবের পর হইতেই মা'র সঙ্গে বম্বে আসিয়াছিলেন। কবিরাজজীর জন্য মাকে বম্বে থাকিতে হইল। হরিবাবাজী কিছুদিন বম্বে থাকিয়া মহাবালেশ্বর গিয়াছেন ; কথা হইয়াছে মা পুণায় গেলেই তিনি পুণায় আসিবেন। মায়ের ত সব দিকেই লক্ষ্য। তাই ভাইয়া ও লীলাকে মা বুঝাইয়া বলিলেন "কবিরাজবাবা এখন ত ভালই আছে, শীঘ্রই হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিবে। ওদিকে হরিবাবা এই শরীরে সঙ্গে থাকিবে বলিয়াই আসিয়াছেন,

একমাস ত এখানেই হইয়া গেল। এ শরীর পুণায় গেলেই বাবাও মহাবালেশ্বর হইতে আসিবেন তাই এখন পুণায় যাওয়াই উচিৎ—এখন আর দেরী করা ঠিক হইবে না। দিদি ও কমল এখানে থাকুক কবিরাজ বাবাকে নিয়া পুণায় যাইবে।" ভাইয়া বুঝিলেন ইহা যুক্তিযুক্ত কথা, তাই আর আপত্তি করিতে পারিলেন না—লীলাবতী আরও ২।৪ দিন মাকে রাখিবার জন্য কান্নাকাটি করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৮ই জুন ১৯৬১।

আজ বিকেলে মা কবিরাজ মশাইকে দেখিতে হাসপাতালে গেলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মা উঠিলেন, কবিরাজজী ৪।৫ দিন পরে পুণা যাইবেন। মা যাইবার সময় তাঁহার মাথায় পিঠে সমস্ত শরীরে শ্রীহস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যে hospital bed-এ তিনি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন তাঁহার বালিশে মা মাথা রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই খাট বালিশ কত লোককে বিদায় দিয়েছে আবার বাবাকে রোগমুক্ত করেছে।" Anglo Indian নার্সটিকে মা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে কী আদর! সে বাবাকে অক্লান্ত সেবা করে দাঁড় করিয়ে তুলেছে। বেরোবার সময় পাশের bed এ মুমর্ষু Arabic patient—তাহার সমস্ত শরীরে cancer ছড়াইয়া গিয়াছে—আত্মীয় স্বজন কেহ নেই—একা শুইয়া শুইয়া মৃত্যুর দিন গুণিতেছে। মা হঠাৎ থামিয়া গেলেন ও তাহার সর্ব্বশরীরে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার অস্থি-কঙ্কালসার টিউব লাগানো খালি গায়ে মা'র করুণা হস্তের স্পর্শ। মা তাহাকে বলিলেন, ইসারায় উপরদিকে দেখাইয়া—"ভগবৎ চিন্তন করো।" তাই ভাবি কোথাকার কে, যাইবার আগে মায়ের এমন অমৃতময়

স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়া গেল—লোকে কত তপস্যা করিয়াও মা'র দর্শন স্পর্শ শেষ সময়ে পায় না—একেই বলে অহৈতুক কৃপা।

৯ই জুন ১৯৬১।

মা আজ সকালে পুণা রওনা হইয়া গেলেন। সংবাদ পাইলাম বেলা প্রায় সোয়া বারোটার সময় মা পুণায় গিয়া পৌঁছাইলেন। মা'র পৌঁছিবার একঘণ্টা পরে হরিবাবা পৌঁছিলেন। মা আসিবার পূর্ব্বে হরিবাবা ঠিক করিয়াছিলেন তিনি পাণ্ডারপুর যাইবেন কিন্তু মা এখানে চলিয়া আসাতে তাঁহার প্রোগ্রাম বদ্‌লাইয়া গেল। হরিবাবা বলিলেন—"মা যখন এখানে আসিয়া গিয়াছেন—তখন আমি আর অন্য স্থানে যাইব না। আমি এখানেই থাকিব।" মাকে বম্বেতে রাখিবার জন্য লীলাবেন এবং ভাইয়ার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তথাপি মা কেন পুণাতে আসিয়াছেন—তাহার কারণ বুঝিতে পারা গেল। মা যদি ঐ দিন পুণাতে না পৌঁছাইতেন, তবে হরিবাবা পাণ্ডারপুর চলিয়া যাইতেন। মা'র প্রায় প্রত্যেক কাজের মূলে কোনও না কোনও বিশেষ কারণ থাকে।

১১ই জুন ১৯৬১।

আজ কবিরাজ মহাশয়কে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে ভাইয়ার ভিলেপার্লের বাসায় লইয়া আসা হইল। তাঁহার এখানে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া আমার সঙ্গে পুণা যাওয়ার কথা।

১৪ই জুন ১৯৬১।

আজ সকালের ট্রেণে কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া আমি ও কমল পুণা রওনা হইলাম। দুপুরের পূর্ব্বেই আশ্রমে গিয়া পৌছিলাম। কবিরাজ মহাশয়ের থাকিবার জায়গা শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের মন্দিরের ঠিক সম্মুখে এক বাড়ীতে করা হইয়াছে। তাঁহারই এক ভক্তের বাড়ী। কবিরাজ মহাশয় ধীরে ধীরে সুস্থ হইতেছেন। এখন একটু হাঁটাচলাও করানো হয়। আশা করা যায় এখানে কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকিলে শরীর ঠিক হইয়া যাইবে।

১৯শে জুন ১৯৬১।

আজ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় ও ইন্দিরা দেবী এবং সঙ্গীয় আরও কয়েক জন মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। প্রথমে মায়ের ঘরে কিছুক্ষণ বসিয়া পরে মায়ের সঙ্গেই হরিবাবার প্রোগ্রামে গেলেন। সেখানে মায়ের অনুরোধে তিনি একটি গানও শুনাইলেন।

২৩শে জুন ১৯৬১।

এখানে প্রায় সর্ব্বদাই বৃষ্টি চলিতেছে। মায়ের শরীরটা ইতিমধ্যে আবার খারাপ হইয়াছিল। পেটের গোলমাল ২।৩ দিন খুবই বেশী ছিল। খাওয়া দাওয়াও প্রায় কিছুই করিতেন না। আজ দুইদিন একটু যেন ভাল মনে হইতেছে।

আজ সকালে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারীদের মধ্যে একজন আসিয়া বলিয়া গেলেন আজ বিকালে পৌনে ছয়টায় রাষ্ট্রপতি এবং গভর্ণর প্রভৃতি কয়েকজন মাতৃ-দর্শনের জন্য আসিবেন। রাষ্ট্রপতি আজ ৪।৫ দিন হয় এখানেই আছেন। আমাদের আশ্রমের নিকটেই গভর্ণরের বাড়ী। রাষ্ট্রপতি সেখানেই আছেন। তিনি মায়ের কাছে একটু একান্তে বসিবার ইচ্ছা প্রকাশে করিয়াছেন। তাই মায়ের ঘরটি বেশ ছোট হওয়া সত্ত্বেও সেখানেই তাঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইল।

বিকাল ঠিক পৌনে ছয়টায় রাজেন্দ্র প্রসাদজী এবং মহারাষ্ট্রের গভর্ণর শ্রীপ্রকাশজী আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে শ্রীপ্রকাশজীর পুত্রবধূ এবং আরও ছোট ছোট নাতি-নাতনীদের মধ্যে ৫।৬ জন। সকলকে মায়ের ঘরে লইয়া বসান হইল।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কে শ্রীপ্রকাশজী খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। কাশীতে তাঁহার বাড়ীর ঠিক পাশেই কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী। কবিরাজ মহাশয় অসুস্থ শুনিয়া তিনি বম্বেতেও একদিন মায়ের কাছে আসিয়া কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া গিয়াছিলেন। পুনরায় টাটা হাসপাতালেও গিয়াছিলেন। আজও কবিরাজ মহাশয়কে মোটরে করিয়া আনিয়া মায়ের ঘরে পূর্ব্বেই বসাইয়া রাখা হইয়াছিল।

মায়ের সম্মুখে বসিয়াই রাজেন্দ্র প্রসাদজী মাকে অনুরোধ করিলেন কিছু উপদেশ দিবার জন্য। মা বলিলেন—"পিতাজী, এই শরীরের-ত ও সব আসে না। তবে অনেক সময় কথাপ্রসঙ্গে টুটি-ফুটি কিছু কিছু কথা হইয়া যায়।" কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া বলিলেন—"এরা পণ্ডিত লোক, সুন্দর সুন্দর কথা কত বলিতে পারিবে।"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"আপনারা প্রশ্ন করুন ত।"

তখন শ্রীপ্রকাশজী বলিলেন—"মাতাজী, আমার মনে একটি প্রশ্ন প্রায়ই উঠে এবং অনেককেই করিয়া থাকি যে ব্যাবহারিক জীবনে আমরা

নানারূপ ছল, চাতুরি, শঠতা দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার সহিত কি ভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয় হইতে পারে?"

মা আস্তে আস্তে বলিলেন—"পিতাজী, একবার এই শরীরটা মুসৌরী পাহাড়ে ছিল। সেখানে একদিন বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখা গেল একটি মাঠের মধ্যে অনেক ছোট ছোট ছেলে খেলা করিতেছে। হঠাৎ একটা ঘণ্টা বাজিবা মাত্র যে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই স্তব্ধ হইয়া গেল। ইহাই হইল নীতির দিক। সেইরকম মানুষের জীবনেও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক মত পালন না করা হয় তবে নীতি ও বিধির দিকটা গড়িয়া উঠিতে পারে না। চারটি আশ্রমের কথা ত আছে। তাহার প্রথম আশ্রমটিই যদি ঠিক না থাকে তবে বিল্ডিংয়ের ফাউণ্ডেশন যেমন পাকা না হইলে বিল্ডিংয়ের পক্ষে ভয়ের কারণ থাকে সেইরূপ মানুষের জীবনের ভিত্তিও যদি ঠিক না হয় তবেই যত কিছু বিরোধের উৎপত্তি হয়।"

এই প্রসঙ্গে মা আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলিলেন।

রাষ্ট্রপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে আধ্যাত্মিক জীবনে রুচি ও নিষ্ঠা কিরূপ হইতে পারে?

মা এক কথায় জবাব দিলেন—"পিতাজী, অভ্যাস যোগের দ্বারাই এই পথে রুচি ও নিষ্ঠা আসে।" প্রায় পৌনে ঘণ্টা কাল খুব ভাল ভাল কথা হইল। প্রথমে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহারা মাত্র পনের মিনিট বসিবেন। কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহারা প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়াছিলেন।

উপস্থিত সকলকে একটু একটু মিষ্টি প্রসাদ এবং ফল দেওয়া হইল এবং সেই সঙ্গে সরবৎও দেওয়া হইল। রাজেন্দ্র প্রসাদজীর হাঁপানী একটু বাড়িয়াছে। তাই তিনি কিছু নিলেন না। হাতে রুমালে বাঁধিয়া একটু ফল মিষ্টি দেওয়া হইল।

হরিবাবা বিকালে বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে

ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকেও মায়ের ঘরে আনা হইল। মা তাঁহাকে দুই তিন বার একটু হরিকথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদজীও বলিলেন—"বাবা, কৃপা করিলেন না।" কিন্তু হরিবাবা কিছুই বলিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজেন্দ্র প্রসাদজী বলিলেন যে সম্ভব হইলে তিনি হরিবাবার প্রোগ্রামে এক সময়ে আবার আসিবেন। সাড়ে ছয়টার পরে তাঁহারা মায়ের ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন।

তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে মা কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের মন্দিরে গেলেন। সেখানে একটু সময় বসিয়া কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহার বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া মা ফিরিয়া আসিলেন।

২৬শে জুন ১৯৬১।

প্রায় দুই মাস হইল ফ্রান্স হইতে প্রসিদ্ধ Television Director Arnaud Desjardins সস্ত্রীক মার কাছে আসিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা এলাহাবাদে মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে মা'র সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। মধ্যে ১৫।১৬ দিনের জন্য মায়ের অনুমতি লইয়া দক্ষিণ ভারতে রমণ মহর্ষীর আশ্রম এবং স্বামী রামদাসজীর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আবার এখানে আসিয়া মায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। ১৯৫৯ সালে কাশীতে দুর্গাপূজার সময় তাঁহারা প্রথম মায়ের কাছে আসেন। সেখানে এবং বিন্ধ্যাচলে মায়ের ফিল্ম তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা ফ্রান্সে কয়েকবার টেলিভিসনে দেখাইয়াছিলেন। মায়ের ফিল্ম দেখিয়া তাঁহার দেশবাসীর অসীম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি আবার মায়ের কাছে আসিয়াছেন একটা দীর্ঘ ফিল্ম তুলিয়া লইয়া যাইবার আশায়। কিন্তু

মায়ের-ত এসব দিকে কোনই আগ্রহ নাই। ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু তাই তাঁহারা তুলতে পারিতেছেন।

তাঁহারা যে ফিল্ম লইয়াছেন তাহার মধ্যে কিছু কিছু আজ রাত্রে ৯টায় পরে মা, হরিবাবা প্রভৃতিকে দেখান হইল। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। যদিও এখানে ফিল্ম দেখাইবার সেরূপ ভাল ব্যবস্থা নাই তবুও যাহা দেখান হইল তাহা খুবই সুন্দর হইয়াছে। সকলেই বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সাহেব ও মেমটি এত হাজার মাইল দূর হইতে কত হাজার টাকা ব্যয় করিয়া মায়ের কাছে এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। তাই ফিল্ম দেখিয়া মায়ের মুখে একটু প্রশংসার কথা শুনিয়াও তাহাদের কত না আনন্দ—কতই না তৃপ্তি। স্ত্রী আগামী পরশু দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। ভদ্রলোক :আরও ৫।৬ দিন বেশী থাকিয়া যাইবেন যদি আরও কিছু তুলিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

২৬শে জুন. ১৯৬১।

আজ খুব ভোরে ফ্রেঞ্চ মেমটি বম্বে রওনা হইয়া গেলেন। আজ রাত্রের প্লেনেই দেশে ফিরিয়া যাইবার কথা। মাকে দেখিয়া তাঁহারা এত বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন যে মাকে ছাড়িয়া যাইতেও চোখের জল ফেলিতেছেন।

মায়ের নির্দ্দেশে আমিও আজ দুপুরে বম্বে রওনা হইলাম। সেখানে ভাইয়ার ফ্যাক্টরীতে কিছু অনুষ্ঠান চলিতেছে, তাহার আজ সমাপ্তি। মাকে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু মায়ের শরীরটা আদৌ ভাল না এবং আবহাওয়াও খুবই খারাপ থাকায় মায়ের আর যাওয়া হইল না। মা তাই আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। আমার সঙ্গে চন্দন ও পানু গেল।

যোগেশদা মায়ের সঙ্গে প্রায় দুই মাস থাকিয়া গেলেন। তিনিও আজ চলিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাখনের ছেলে বাচ্চুও আছে। তাহারা দুই জনেও আমার সঙ্গে মোটরে বম্বে গিয়া সেখান হইতে রাত্রের গাড়ীতে দেরাদুন রওনা হইয়া গেল।

বম্বেতে আমরা সন্ধ্যায় পৌঁছিয়া কানিয়া ভাইর ও জিতেনের বাসা এবং ভাইয়ার ফ্ল্যাট হইয়া রাত্রি প্রায় এগারটায় ভিলে পার্লের বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম। শুনিলাম অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ২৮শে—আগামীকাল না। তাই আমাকে এখানে একটি দিন বেশী থাকিতে হইবে।

২৭শে জুন ১৯৬১।

আজ সকালে ১০টায় আমি স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সহিত দেখা করিয়া আগামী সংযম সপ্তাহে ও ভাগবৎ সপ্তাহে তাঁহার উপস্থিতির জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলাম। তিনি আজকাল অধিকাংশ সময় বম্বেতেই থাকেন। মালাবার হিলের উপরে আশ্রম করিয়াছেন। অবশ্য একটি বাড়ীর ফ্ল্যাটে, কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে সব সাজান গুছান।

সেখান হইতে ভাইয়ার ফ্ল্যাটে গিয়া, খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া আবার ভিলে পার্লের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। বিকাল সাড়ে তিনটায় সন্ন্যাস আশ্রমে স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। শুকতালে সংযম সপ্তাহের সময় তাঁহাকেও উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখিলাম।

২৮শে জুন ১৯৬১।

আজ সকাল এগারটার পরে লীলাবেন আসিয়া আমাদের অনুষ্ঠানের স্থানে লইয়া গেলেন। দেখিলাম রুদ্রাভিষেক হইতেছে। তাহার সমাপ্তি বেলা সাড়ে বারটা নাগাদ হইয়া গেল। বাটুদা আচার্য্য। ৪।৫ দিন হয় এখানে শতচণ্ডী পাঠও সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমাকে মা পাঠাইয়াছেন দেখিয়া লীলাবেন ও ভাইয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সেখান হইতে দেড়টা নাগাদ বাড়ীতে ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া চারটার সময় স্টেশনে চলিয়া আসিলাম। বেলা পাঁচটায় "ডেকান কুইনে" রওনা হইয়া রাত্রি নয়টা নাগাদ আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্টেশনে মা গাড়ীর ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন।

২৯শে জুন ১৯৬১।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদজী এই কয়দিন পুণাতেই ছিলেন। আজ সকালে তিনি রওনা হইয়া গেলেন। গতকাল সন্ধ্যায় গভর্ণর শ্রীপ্রকাশজী আমার নিকট চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে মায়ের কাছে রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয়বার আসার খুবই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শরীর সুস্থ না থাকায় তাহা সম্ভব হইল না। অবশ্য শ্রীপ্রকাশজী এখানে আরও ১০।১২ দিন আছেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বে আবার আসিবেন লিখিয়াছেন।

দুপুরে ফ্রেঞ্চ সাহেবটি বম্বে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে মালয়ের যুবকটিও (যিনি এখানে কয়েকদিন যাবৎই ছিলেন) চলিয়া গেলেন। ফ্রেঞ্চ সাহেবটি যাওয়ার সময় মা খুবই আদরের সঙ্গে তাঁহাকে মালা দিলেন এবং বলিলেন—"আবার আসিও—দুইজনেই (স্বামী-স্ত্রী)।" শুনিয়া তাঁহার কি আনন্দ!

সত্যই ইহাদের শ্রদ্ধা ভক্তির কথা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়। কত হাজার মাইল সমুদ্র পার হইয়া কত হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ইঁহারা মায়ের দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেরই খুব সুন্দর স্বভাব এবং ধর্ম্মভাবপূর্ণ। এখানে যে ফিল্ম লইয়াছেন তাহা দেশে গিয়া দেখাইবেন এবং কত হাজার হাজার লোক মাকে ঐভাবে দেখিবার সুযোগ পাইবে এই আনন্দেই তাঁহারা যেন ভরপুর। এইভাবে তাঁহারা মায়ের যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিতেছেন ইহাতেই তাঁহারা যেন ধন্য।

৩০শে জুন ১৯৬১।

গোয়ালিওরের মহারাজা এখানেই আছেন। তিনি প্রায় রোজই সন্ধ্যায় মায়ের দর্শনের জন্য আসিতেছেন। গতকাল সন্ধ্যায়ও আসিয়া কিছুক্ষণ মায়ের ঘরে বসিয়াছিলেন। শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। তাঁহার একটি প্রাইভেট 'ডেরী ফার্ম' আছে। সেখান হইতে মায়ের ভোগের জন্য সকাল সন্ধ্যায় খাঁটি গরুর দুধ পাঠাইয়া দিতেছেন।

আজ ৺যমুনালাল বাজাজের স্ত্রী, মেয়ে প্রভৃতি মায়ের কাছে আসিয়া সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ বসিলেন। দুপুরে তাঁহাদের ওখানে আশ্রমের পক্ষ হইতে কয়েকজন মেয়েকেও লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাহাদের ফলমূল ইত্যাদি খুব খাওয়াইয়াছেন।

মায়ের এখানে আরও ১৪।১৫ দিন থাকার কথা। ব্যাঙ্গালোর হইতে মহীশূর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীএস্, আর, দাশগুপ্ত (কোহিনূরদা) মাকে একবার কয়েকদিনের জন্য যাইতে বার বার প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। কথা হইয়াছে যদি মায়ের শরীর ঠিকঠাক থাকে তবে মা হয়ত এখান হইতে ১৫ই নাগাদ ব্যাঙ্গালোর গিয়া সেখানে ৫।৬ দিন থাকিয়া সেখান হইতে

সোজা কলিকাতা যাইবেন। এবার গুরুপূর্ণিমার সময় মায়ের আগড়পাড়া আশ্রমে থাকার কথা হইতেছে।

২রা জুলাই ১৯৬১।

আজ প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেও ভাইয়া, লীলা, সুনয়না ও তাহার ৫ মাসের ছেলে বম্বে হইতে মোটরে মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।

সুনয়নার ছেলে "বাবা"কে প্রথমদিন বম্বেতে দেখিয়াই মা বলিয়াছিলেন উহার কান দুটি একটু অসাধারণ। আজ মাকে দেখিয়া সে বারবারই মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া যাইতে চায়। লীলা তাহাকে কোলে নিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যেই লীলা মা'র পায়ের কাছে নাতি কোলে করিয়া বসিয়াছে অমনি দেখি "বাবা" কোল হইতে তাহার ছোট্ট মাথাটা বারবার নোয়াইয়া মায়ের দিকে মাটীতে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। মা বলিয়া উঠিলেন—"এ কী ব্যাপার—এ রকম করছে কেন? ইহ ক্যায়া বাত?" যতবারই তাহাকে সোজা করা হয় ততবারই সে ঝুঁকিয়া মাথা মাটিতে নোয়ায়। শেষে মা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে তাহাকে কোলে নিয়া ছোট্ট বাচ্চাটীকে দু'গালে মাথা ঠেকাইয়া খুব আদর করিলেন। আমাদের মনে হইল কোন ভক্তের হয়ত পুনরাবির্ভাব হইয়াছে—মাকে দেখিয়া সংস্কারবশতঃ চিনিয়াছে। মায়ের মুখ চোখ উদ্ভাসিত। মা ওর ছোট্ট মাথাটিতে বারবার হাত বুলাইয়া "নারায়ণ নারায়ণ" বলিলেন।

৮ই জুলাই ১৯৬১।

আজ সকালে হরিবাবা বম্বে ফিরিয়া গেলেন। মা নিজে স্টেশনে গিয়া হরিবাবাকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। ভোর বেলা ৪।৩০ টার

কীর্ত্তনে মা প্রায় রোজই শেষের দিকে ও প্রথম কয়দিন গিয়াছিলেন ষ্টেশনে বাবাকে তুলিতে যাইবার খেয়াল হঠাৎ মায়ের হয়—এরূপ সচরাচর মা যান না।

১০ই জুলাই ১৯৬১।

কবিরাজ মহাশয়কে খুবই সাবধানমত মায়ের নির্দ্দেশে রাখা হইতেছে। মায়ের রোগীর সেবাও অপূর্ব্ব, অদ্ভুত। যাহারা দেখিতেছেন তাহারাই এই কথা বুঝিতে পারিবেন। কবিরাজ মহাশয়কে আজ আশ্রমে আনা হইল। এতদিন তিনি দিলীপ রায়ের আশ্রমের নিকটে ছিলেন। মা তাঁহার পুরাতন জিনিষ-বস্ত্র-বিছানা বদলাইয়া সমস্ত নূতন করিয়া দিয়াছেন—পুনর্জন্ম হওয়ার মত তিনি আশ্রমে আসার আগে মা নিজে দাঁড়াইয়া তাঁর ঘরটিকে মেয়েদের দিয়া গুছাইয়া দিলেন।

সুযোগ পাইলেই বম্বে হইতে ভক্তেরা আসিতেছেন, যাইতেছেন। মায়ের যাওয়ারও সময় হইয়া আসিয়াছে। কানিয়া ভাই সপরিবারে আসিয়াছেন। কি কথায় কথায় আমি বলিতেছিলাম—জয়া বেনের এমন সুন্দর ভাব—যখন ভগৎভাবের গান করে চোখ বুজিয়া এমন সুন্দর দেখা যায় —মনে হয় মগ্ন,—এ সংসার কা'র কি করিয়া ভাবি। এই কথায় জয়া বেন মাকে বলিতেছে—মা কি করিব সংসার ত করিতেই হয়—উহাও ত ভগবানেরই দান।

মা—"নিশ্চয়ই, সবই তাঁহারই। তিনিই। যখনই সংসারের যে কোন কাজ করিবে, মনে রাখিবে তাঁহারই সেবা। তিনিই এই এই রূপে। তবেই

তাঁহার কাছেই সব সেবা পৌঁছিয়া যায়। ঋষিপুত্র, ঋষিকন্যা ছিল না? আসল কথা, তাঁহার ভাব নিয়া—তাঁহাকে নিয়াই সব কিছু করা, থাকা।”

আমিও হাসিয়া বলিলাম—সংসারী না থাকিলে আমরাই বা ভিক্ষা পাইব কি করিয়া?

কানিয়া ভাইদের কাছে গতকাল রাতে হরিবাবা বাঁধে একবার মাকে কিরূপ হাতীর পিঠে করিয়া নিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন মা সে সব গল্প করিতেছিলেন। মা বলিলেন—“বাবা হাতীর পিঠে হাওদার ব্যবস্থা করেছে। এ শরীরকে band বাজিয়ে নিয়ে যাবে। বাবা বলছে কোন ভক্তকে যে ‘মা উঠবে—তুমি পিঠ দাও।’ এ শরীর তো উঠতে রাজী নয়—তখন বাবা নিজে হাত পেতে বলছেন ‘মা তুমি এই হাতের উপর পা দিয়ে উঠে যাও।’ বাবাকে এরূপ করতে দেখে কী খেয়াল হলো। পরমানন্দ স্বামীকে ও আমাকে মা উঠিয়ে দিলেন। তারপর মা বল্লেন—“এ শরীরের খেয়াল হলো ইঁদুর যেভাবে বেয়ে ওঠে সেভাবে কেমন যেন টক্ করে উঠে পড়লাম।”

মা হরিবাবার সৎসঙ্গে আজ উড়িয়াবাবার কথা বলিতেছিলেন। উড়িয়াবাবার দেহ রাখার পর মা একবার হরিবাবার কাছে গিয়াছেন। ১৫ দিন যাবৎ মা আছেন। মায়ের খেয়াল হইতেছিল উড়িয়াবাবা যেন শরীরের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। যে তক্তায় মা শয়ন করেন, মা একদিন সেটি তুলিয়া দেখিতে বলায় দেখা গেল তলায় একটা গালিচা পাতা। গালিচাতে রক্তের ফোঁটা ফোঁটা দাগ। উড়িয়াবাবাকে যখন ঐভাবে সভার মধ্যে হত্যা করা হয় তখন তিনি নিশ্চয়ই এই গালিচায় বসিয়াছিলেন—কেউ দেখে নাই রক্তের দাগ। গালিচা পাট্ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে এবং তাহাই মাকে দিয়াছে।

সন্ধ্যায় দিলীপ রায় ও ইন্দিরা দেবী আসিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় এতদিন তাঁহাদের এক ভক্তের বাড়ীতে তাঁদের আশ্রমের অতি নিকটে ছিলেন। তাঁহারাই বিশেষ আগ্রহ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের থাকিবার

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আজ কবিরাজ মহাশয় আমাদের আশ্রমে আসিয়াছেন। দিলীপ রায় মহাশয় আসিয়া কবিরাজজীর ঘরেই বসিলেন। মা-ও বসিয়াছেন। রায় মহাশয় মাকে বলিতেছেন "আমিই শুধু কথা বলিয়া যাইতেছি ; মা! আপনি কিছু বলুন আমরা শুনি।" মা কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া বলিলেন—'বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।' তিনি কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গীতায় যে বলিয়াছে তাহা হইতেই সব আসিতেছে তাহাতেই সব যাইবে যদি তাই হয় তবে আর এত সব সাধন ভজনের দরকার কি ?"

দিলীপ রায় মাকে বারবারই প্রশ্ন করিতেছেন "মা! যাহারা ভাল লোক তাহাদের এত দৈহিক কষ্ট হয় কেন—রমণ মহর্ষি—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ক্যান্‌সারে দেহ রাখলেন। গোপীদাদারই বা কেন এই ব্যাধি হলো ?" মা বলিলেন "বাবা (গোপীবাবু) কী বলেন ?' দিলীপবাবু বল্লেন "আপনার মুখ থেকে উত্তর চাই, মা আপনার কথা বড় মিষ্টি, শুনতে বড্ড ভাল লাগে।" মা বলিলেন—"বাবার কথাই আমার কথা।" মা আরো বলিলেন—"কবিরাজমশায়ের মতন বিদ্বান জগতে অদ্বিতীয়। একাধারে বক্তা ও শিক্ষক এরকমটী আর তুমি দুটী পাবে না, বাবা।"

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞা হীরাবাই বরোদকার মায়ের কাছে আসিয়াছেন। ইনি গতবার প্রথম পুণায় মা'র কাছে আসেন ও মা'র বিশেষ ভক্ত হইয়াছেন। এবারে ঠিকমত খবর না পাওয়ায় ইনি পূর্ব্বে আসিতে পারেন নাই। মাকে দুইখানি গান শুনাইবার পর মা তাঁহাকে সাধক রামপ্রসাদের কথা বলিতেছিলেন। রামপ্রসাদের বেড়া কীভাবে "মা" স্বয়ং বালিকারূপে আসিয়া বাঁধিয়াছিলেন সে গল্প মা করিলেন। মা হীরাবাইকে বলিলেন—"সুর, পদ, তাল দ্বারা সেই অখণ্ডকে স্পর্শ করা যায়, রামপ্রসাদ যেরূপ গানের দ্বারা মাকে পেয়েছিল সেরূপ তোমার ভেতরে এই যে শক্তি এ তাঁরই দেওয়া—এর দ্বারা তাঁকে পাবার চেষ্টা করা।"

১১ই জুলাই ১৯৬১।

আজ মা খড়কবাস্‌লাতে National Defence Academy-র জনবিশ্রুত স্কুল দেখিতে গেলেন। সেখানকার প্রিন্সিপাল আসিয়া মাকে নিজের গাড়ী করিয়া নিয়া গেলেন। মাকে Guest house-এর বারান্দায় বসানো হইল। জায়গাটী অতি মনোরম। সম্মুখে পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া হ্রদ—দূরে শিবাজীর সিংহগড় কেল্লা। মা পুষ্পকে "দো দিনকা জগমে মেলা" ও "এই পরমভরা মস্তক মেরা উস্ চরণ ধূলিপর ঝুকনে দে" গান গাহিতে বলিলেন। আজকাল অনেক সময়ই মা এ দুইটী গান গাহিতে বলেন। মাকে সকলে অনেক করিয়া বলায় "হে ভগবান"—গানটির কয়েক পদ গাহিলেন। ফেরার পথে খড়কবাস্‌লার নানা দ্রষ্টব্য স্থানের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া মাকে প্রিন্সিপাল কোথায় কী হয় সব বুঝাইতেছিলেন। যে Dining hall-এ একত্রে ২০০০ ছেলে বসিয়া খায় সেখানেও মাকে নামান হইল।

আজ সকালে খবর আসিয়াছিল Gwalior-এর মহারাজা খুবই অসুস্থ। এপ্রিল মাসে যখন সত্যনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় মা গোয়ালিয়র যান, তখনই মহারাজা খুব অসুস্থ ছিলেন—সেবার মায়ের কৃপায় তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। এবারেও অবস্থা সঙ্কটজনক। বারবার মহারাণীর নিকট হইতে টেলিফোন আসিতেছে। দুইবার লোক আসিয়া মায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল, প্রসাদ নিয়া গিয়াছে। মহারাজার মায়ের উপরে বিশেষ শ্রদ্ধা। মহারাজা ও মহারাণী মায়ের খুবই কৃপাপ্রার্থী।

১২ই জুলাই ১৯৬১।

পুণায় আজ প্রায় ১৫দিন যাবৎ বলিতে গেলে অনবরত বৃষ্টি চলিতেছে। অতি অল্প সময়ই একটু বন্ধ হইয়াছে। কখনও নাকি এইরূপটী হয় নাই।

ফলে বাঁধ ভাঙ্গিয়া সহরের নানা অংশ জলময় হইয়া উঠিল। আজ দুপুর হইতে জলের অবস্থা খুবই খারাপ শোনা যাইতেছে মিসেস নন্দা, নাগপাল, প্রভৃতি যাহারা সর্ব্বদা আসে, তাহাদেরও কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না। মা তাহাদের খবর করিবার জন্য কমল ও প্রকাশকে পাঠাইলেন। রাস্তার এমন অবস্থা যে তাহারা উঁহাদের নিকট পৌঁছিতেই পারিল না। কলেকটারের সহিত দেখা করিয়া কিছু ভাল খবর নিয়া আসিল এই যে জল একটু কমিতেছে, আশা করা যায় ধীরে ধীরে জল কমিয়া যাইবে। দয়াময়ী মা আবারও উপরোক্ত ভক্তদের এবং আশে পাশে সকলের খবর নিতে কমলকে পাঠাইলেন। রাত্রি প্রায় ১০॥০টায় কি ১১টায় তাহারা খবর নিয়া আসিল মিসেস নন্দা, নেড়ুলা, অশোক (সুপোরী সাহেবের ছেলে) সব বাড়ী ছাড়িয়া কিছু দূরে নন্দার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছে। ভালই আছে। নাগপাল বাড়ীতেই আছে, তাহাকে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছে। সে বলিল "মা তোমার কৃপায় আমাদের কোন বিপদ হয় নাই।" মা বলিলেন্—"বেশ কথা—তোমরা সকলে যে নিরাপদে আছ এই ভাল।" অনেকেই বলিল—জল অনেকটা কমিয়া গিয়াছে তাই মোটরে নিয়া কোথাও কোথাও যাইতে পারা গিয়াছে। পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই মা একটু বলিয়াছিলেন, এখনও আবার কথায় কথায় বলিলেন— "যখন এইরূপ ভীষণভাবে জল বাড়িতেছে খবর পাওয়া গেল, তখন খেয়াল হইয়াছিল জলকে বলা হইল—"বাপু এখন তুমি ধীরে ধীরে নামিয়া যাও" তা কথা শুনিয়াছে"—বলিয়া শিশুর মত হাসিতেছেন। সকলেই এই কথায় আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইল। শোনা গেল বহু লোকের গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সহরের আলোও বন্ধ। তবে পুলিশেরা সব ব্যবস্থা করিতেছে। সকলেরই প্রাণে একটা যেন আতঙ্ক!

১৩ই জুলাই ১৯৬১।

আজ সকালে আবার খবর পাওয়া গিয়াছিল জল আবারও একটু বাড়িয়াছে। পরে খবর পাওয়া গেল পূর্ব্বের খবরটা ঠিক নয়। এইভাবে দিন কাটিতেছে। কি হইবে মা-ই জানেন। মা তো নিজের মুখে জোর করিয়া কিছু বলেন না। আমি বলিলাম—"মা রহিয়াছেন আমাদের ভাবনা কি? মা ইহা শুনিয়া সকলকে বলিতেছেন—"ঐ দেখো দিদি বলছে কিছু হবে না। আবার পরমানন্দের কাছে গিয়া বলিতেছেন—"পরমানন্দ কিছু হবে না তো?" পরমানন্দ জোর গলায় বলিয়া উঠিল—"কী আবার হবে—জল নালা দিয়ে নেমে যাবে।" "নেমে যাবে তো?" মা তিনবার বলিলেন—স্বামীজির মুখ হইতে বাহির করিলেন উত্তর—"হ্যাঁ নেমে যাবে।" বিকালের দিকে খবর আসিল যে জল সত্যই নামিয়া যাইতেছে। ভয়ের আর কারণ নেই। মা স্বয়ং পুণায় উপস্থিত থাকায় সমূহ বিপদ হইতে কত লোক রক্ষা পাইল।

প্রমীলা নন্দা আজ আসিয়াছে। সে মাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল। বারবার বলিতেছিল—"মা! গতকাল আমি যাহা কোনদিন করি না, যাইবার সময় তোমাকে বলিয়া প্রণাম করিয়া যাই নাই। যেই শুনিয়াছি যে জল বাড়িতেছে—আমার মনে হইল ছেলে মেয়েরা তো সব স্কুলে; ওদের কী হইবে। তোমাকে না বলিয়াই ছুটিয়াছি উহাদের আনিতে।" প্রমীলাদের বাড়ীতে জল প্রবেশ করে নাই। ছেলে মেয়েরা স্কুল হইতে আসিবার পথে খুব জল পায়। তবুও সব মা'র কৃপায় ঠিকমতন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। প্রমীলা বাড়ীতে একা—নন্দাভাই বাহিরে গিয়াছেন। মা'র বিশেষ খেয়াল থাকায় কোনও অঘটন ঘটে নাই।

পরমানন্দ স্বামীর অসুখ বহু বৎসর যাবৎ দেখা যায় নাই। আজ কয়দিন স্বামিজীর খুব জ্বর। মা বারবার তাঁহার ঘরে গিয়া ডাক্তার ঔষধ পথ্যাদির সব ব্যবস্থা করিতেছেন। স্বামিজীর মাথায় কপালে হাত দিয়া জ্বর কত দেখিতেছেন।

১৫ই জুলাই ১৯৬১।

আজ মা কোহিনূরদার বিশেষ আহ্বানে ব্যাঙ্গালোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে ৭ দিন থাকিয়া গুরুপূর্ণিমায় কলকাতা যাইবার কথা।

মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল যাইতেছে না। মাথার শব্দও বাড়িয়াছে। মধ্যে দুইদিন শরীর ঠাণ্ডা—মাথা কপাল ঠাণ্ডা হইয়া যায়। মা নিজেই বলেন "যখন এরূপ অবস্থা হয় তখন বলা-শোনা-দেখা কোনটাই আসে না—কেমন একটা শান্ত ভাব—অথচ কোন কষ্ট বা গ্লানি নাই।"

১৬ই জুলাই ১৯৬১।

বৈকাল ৫টায় মা ব্যাঙ্গালোর আসিয়া পৌঁছিলেন। ষ্টেশনে কোহিনূরদা সপত্নীক উপস্থিত ছিলেন। মাকে গাড়ী করিয়া নিজেদের বাসাতে নিয়া আসিলেন। চারখারির রাজমাতাও ষ্টেশনে ছিলেন। বৃন্দাবনের আশ্রমে মৃত স্বামীর স্মৃতিতে গীতা ভবন ও হল ইহারাই বানাইয়া দিয়াছিলেন। দেখিলাম তালপাতার কুঠিয়াতে মা'র থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মা নিজের কুঠিয়াতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ সুন্দর তালপাতার ঘর।" এ দেশীয় ফুলের মালার বিশেষত্ব আছে—এরূপ মালা অন্য জায়গায় দেখি নাই। বিরাট মালা পরাইয়া বেলাদি মায়ের আরতি করলেন।

১৭ই জুলাই ১৯৬১।

আজ সকালের কাগজে এক মর্মান্তিক সংবাদ পাইলাম যে মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত মহারাজা গোয়ালিয়র আর ইহলোকে নাই। গতকাল রাত্রে তিনি শেষ

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মাকে খবর দিতেই মা বলিলেন—"মৃত্যুটা এ শরীরের খেয়াল হয়, হঠাৎ হইয়াছে।" কিছুক্ষণ পরেই তারেও খবর আসিল। পুণায় থাকার সময় মহারাজের heart attack-এর খবর নিত্য আসিতেছিল—তবুও আশা করিতেছিলাম যে মা'র কৃপায় হয়ত এযাত্রাও তিনি রক্ষা পাইবেন।

এপ্রিল মাসে গোয়ালিয়রে সত্যনারায়ণ প্রতিষ্ঠার সময় যখন মা যান, তখনই মহারাজা হৃদ্‌যন্ত্র সংক্রান্ত পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এত বড় উৎসব, অথচ মহারাজের শ্বাসকষ্ট ও শারীরিক অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে কোন মূহুর্ত্তে যাহা কিছু হইয়া যাইতে পারে। মা'র বিশেষ খেয়ালে মা সে যাত্রা তাঁহাকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সত্যনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন মহারাজা, মহারাণী, মহারাজকুমার ও তিন রাজকুমারী সবাই পূর্বকালের রাজসভার পোষাকে সুসজ্জিত ছিলেন। রাজ পরিবারস্থ কর্মচারীবৃন্দগণও সেই সাবেকী আমলের লাল পাগড়ী, সাদা আচকান ও জরির চাদর পড়িয়া দুই ধারে দণ্ডায়মান। বিরাট মন্দিরের হলে যখন ইহা সব দেখিতেছিলাম, মনে হইতেছিল মাকে নিয়া আমরা বুঝি পূর্ব্বের সেই স্বাধীন গোয়ালিয়রের রাজসভায় উপস্থিত। এখন ভারত সরকারের অধীনে রাজসভার জাকজমকের ছটা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সেদিন গোয়ালিয়রবাসীদের মনে পূর্বের স্মৃতি অবশ্যই আবার জাগ্রত হইয়াছিল। আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল মহারাজা ও মহারাণীর জয়ধ্বনিতে। মহারাজা বেশীদিন মায়ের সংস্পর্শে আসেন নাই। কিন্তু মায়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভালবাসা এই অল্পদিনের মধ্যেই হইয়াছিল। মহারাণী মায়ের কাছে কতবার আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন যে মহারাণী আজ পর্য্যন্ত কোন সাধু মহাত্মার কাছে মাথা নোয়াননি। মহারাজের মৃত্যু খবরে মনটা বড়ই খারাপ লাগিতেছে। সেদিনও পুণায় আসিয়া তিনি সরল সহজভাবে প্রাণ খুলিয়া মায়ের সঙ্গে কত কথা বলিলেন। ডান চক্ষুতে

কিছুদিন যাবৎ দেখিতে পাইতেছিলেন না। এই কারণে তিনি বড়ই মানসিক অশান্তিতে ছিলেন। মা তাঁহাকে বারবার এইসব চিন্তা ছাড়িয়া ভগবৎ চিন্তা নিয়া থাকার চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন।

মা তার করাইলেন মহারাণীকে—"ভগবৎ-বিধানে সন্তানদের আজ পিতা-মাতা তুমিই। বীরকন্যা—ধৈর্য্যের আশ্রয়ে নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্যের সমাধানের চেষ্টা কর।"

১৮ই জুলাই ১৯৬১।

মিসেস্ তালেয়ারখান, (মহর্ষি রমণের শিষ্যা ও মায়ের বিশেষ পরিচিতা ও ভক্ত) এখানে আসিয়াছেন। গতবার ১৯৫২ সনে মা যখন হরিবাবা প্রভৃতি মহাত্মাদের নিয়া দক্ষিণ ভ্রমণে আসেন, তখন ইনিই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেবারে মাকে ইনি মহর্ষির আশ্রমেও লইয়া যান। মিসেস্ তালেয়ারখান মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার স্ত্রীকে মায়ের কাছে আনিয়াছেন। মা তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলিলেন। মার একটী কথা বড় মনে গাঁথিয়া রহিল—"গরু যেমন বাছুরকে চেটে চেটে পরিষ্কার করে সমস্ত ময়লা নিজ আত্মসাৎ ক'রে ফেলে, ভগবানও তেমনি নিজ সন্তানের সমস্ত দোষ টেনে টেনে নিয়ে তাকে শুদ্ধ পবিত্র করে দেন। তদ্‌বুদ্ধিতে নিষ্কাম সেবা।"

একজন মাদ্রাজী মহিলাকে মা বলিতেছিলেন—"যতক্ষণ পারো নাম নিয়ে থাকা, নামজপ করাই তাঁর সঙ্গ করা। জাগতিক বন্ধুর সঙ্গ করলে সে যেমন তার সব কথা তোমাকে জানিয়ে দেয়—পরম বন্ধুর সঙ্গ করলে তিনিও তাঁর তত্ত্ব তোমার কাছে প্রকাশ করে দেবেন। সমুদ্রে ঢেউ দেখে কী

তুমি স্নান করা বন্ধ করো—ঢেউয়ের মধ্যেই তো ঝাঁপ দিয়ে স্নান সেরে নাও। তেমনি সাংসারিক ঝড়ঝাপটা "disturbance" এর মধ্যেই তাঁকে স্মরণ, জপ নিয়ে থাকার চেষ্টা করা।"

১৯শে জুলাই ১৯৬১।

আজ বিকালে কোহিনূরদা ও বেলাদি মোটরে লইয়া মাকে ব্যাঙ্গালোর সহর দেখাইলেন। লালবাগ এখানকার Botanical garden। মা বারবারই বলিতেছিলেন যে এখানকার বাতাবরণ খুব ভাল—একটা শান্তভাব আছে। রাস্তায় লোকেদের চেহারা দেখিয়া ও হঠাৎ বলিলেন—"কেমন যেন স্নিগ্ধভাব আছে এদের মুখে। গাছগুলি সব কী সুন্দর তাজা তাজা।"

রাত্রে সৎসঙ্গে মা স্থানীয় লোকদের প্রশ্নের উত্তর বেশ খানিকক্ষণ দিলেন। "সংসার সংশয়ের স্থান।" একজন প্রশ্ন করিলেন—"ভগবানকে পেতে কত দেরী কত সময় লাগবে?"

মা—"স্বময়—তিনিই স্বয়ং ময় হয়ে রয়েছেন—আছেন--তাঁকে যে ব্যকুল হয়ে ঠিক ঠিক ডাকে, তক্ষুণি তিনি প্রকাশিত হ'ন। মা জানে ছেলের আসল কান্না—যে কান্নায় মা সব কাজ ফেলে ছুটে আসে।"

জগৎগুরু ও গুরুশক্তিপাতের বিষয় মা বলিলেন—"জগৎগুরু কোটীতে গুটী—এক, জগৎগুরু কে? যিনি জগৎকে ত্রাণ করেন। সাধারণ গুরু যে মন্ত্র দেন তাতে গুরুশক্তিপাত হয় না। তবে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হতে যে মন্ত্রের বিকাশ গুরু পরমপরায় চলে আসছে তাতে মন্ত্রশক্তিপাত হয়। কাজে কাজেই যে মন্ত্র তুমি পেয়েছ তাতে তো মন্ত্রশক্তিপাত আছে—নিজ সংস্কার অনুযায়ী তা স্ফূরণ হতে পারে। আর যেখানে গুরুশক্তিপাত হয় সেখানে.

তো "connection' হয়েই গেলো। জগৎগুরুই গুরুশক্তিপাত করতে পারেন।

"মন্ত্রদীক্ষা ছাড়াও স্পর্শ দীক্ষা—দৃষ্টি দীক্ষা দ্বারা গুরুশক্তিপাত হ'তে পারে। সাত্ত্বিক দীক্ষায় যে কোন জায়গা থেকে গুরুশক্তিপাত হয়।"

"প্রারব্ধ ভোগ জীবন্মুক্তেরও হয় কিন্তু তা সাধারণ জীবের মত নয়—যেমন পাখার Switch off করলেও পাখা ঘোরে।

"জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রারব্ধ সঞ্চিত কর্ম্মও জ্বলে যায়; জ্ঞান সব জ্বালাতে পারে আর প্রারব্ধ জ্বালাতে পারে না!

"প্রশ্ন করা ভাল যে যে স্থিতিতে আছে—সে সেখান থেকে প্রশ্ন করে; এক প্রশ্ন আসেনা যে মূর্খ, আর যে পাশ করে গেছে।

"ভগবানের চিন্ময় রূপ চিন্ময় বিগ্রহ—নিত্য। তুমি তো নাশবান—জন্ম মৃত্যু যেখানে সেখানেই সাধন-প্রাপ্তির ইচ্ছা—এখান থেকে অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির পারে যাবার জন্য সাধনা। যেখানে নিত্য বিগ্রহ সেখানে নষ্ট হয় না, ন-ইষ্ট।"

প্রশ্ন—"ভগবানের জন্য যাত্রা ভগবৎ ইচ্ছা ছাড়া হয় কী?" মা—"প্রশ্ন করছে যে সেও ভগবৎ ইচ্ছায়। জগত আর হরি অভিন্ন। ভগবানের যন্ত্রবৎ, তোমার প্রশ্ন উত্তর। সমাধান-অসমাধান ভগবানই। প'ড়ে তৃপ্তি হয় না; তবুও নিজকে জানবার জন্য সৎগ্রন্থ পড়া।

"ভগবান দূর—এই দুর্বু্দ্ধি দুর্বোধ দুর্গতি সরাবার জন্য তদ্ভাবনা তৎচিন্তা। বাসনা কামনা নিয়ে যে মারা যায়—তাই মৃত্যু—কারণ return ticket করে গেলো—ফের আসতে হবে।

"যদি মৃত্যুর মৃত্যু হয়ে যায় সৌভাগ্য দ্বারা তাহলে তুমি যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তা প্রকাশ হয়।

"যে সময়টা যায় তা ফেরে না। মনুষ্য—মনের হুঁস যার হয়েছে। এই অমূল্য সময় নষ্ট ক'রো না। আত্মঘাতী না হয়ে অমৃত আত্মা যে তুমি স্বয়ং তা' প্রকাশ করো।

৬

"সেবক প্রভু! তুমি যে নিত্য দাস তা প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করা।

"বেদান্তরূপ কর্মযোগী পরমাত্মা প্রকাশ করা। যেমন পিতা পুত্র পতি এক, কেউ কম নয়—তেমনি জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম—সবই একে পৌঁছায়। সর্ব্ব নাম ভগবানের—অনাম অরূপ। যে কোন রূপে পাওয়া—শেষে গিয়ে দেখা—সবই এক।

"চেষ্টা করতে হবেই সকলকে। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য স্ত্রী পুরুষ সকলের সমান অধিকার। দুর্লভ জনম সুলভ করার চেষ্টা করা মানুষের কর্ত্তব্য; নয়তো জন্ম আর মৃত্যু।"

২৫শে জুলাই ১৯৬১।

আজ সকাল ১১॥ টার সময় মা ব্যাঙ্গালোর হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া মাকে আশ্রমে নেওয়া হইল।

২৭শে জুলাই ১৯৬১।

আজ গুরুপূর্ণিমা। আশ্রমে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। মহাসমারোহে মায়ের পূজা হইল। প্রায় দেড় হাজারের উপর লোক আশ্রমে প্রসাদ পাইল। মায়ের কৃপাতে সমস্ত কাজই খুব সুষ্ঠুভাবে হইয়া গেল।

২৮শে জুলাই ১৯৬১।

আজ মা কাহাকেও কিছু না বলিয়া চিন্ময় এবং জিতেন মুখার্জীকে লইয়া মোটরে ভদ্রেশ্বর চলিয়া গেলেন। শুনিলাম মা নাকি একা বীরেন্দ্র

মুখার্জীর বাড়ী গিয়াছিলেন। প্রায় ১৪ বৎসর পর বীরেনদা মা'র দর্শন পাইলেন। ইহা মায়ের অহেতুক কৃপা ছাড়া আর কি বলিব? বীরেনদা মাকে দেখিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান। তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিলেন না যে মা অযাচিত ভাবে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। যাহা হউক—মা কয়েক ঘণ্টা বাদে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। বীরেনদা, তাঁহার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা পরে মায়ের কাছে আসিয়া তিনদিন ছিলেন।

২৯শে জুলাই ১৯৬১।

মা আজ মাখনদার বাড়ীতে যান। মাখনদার স্ত্রী মাকে আরতি করিতে উপরে নেন। মা অন্যান্য ভক্তদের বাড়ী ঘুরিয়া রাত্রি প্রায় ১টায় আশ্রমে ফিরিয়া আসেন।

৩১শে জুলাই ১৯৬১।

আজ মা কাশী রওনা হইয়া গেলেন।

৮ই আগষ্ট ১৯৬১।

কাশীতে এবার একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ কিছুদিন যাবতই মায়ের শরীর ভাল যাইতেছে না। মা ঔষধপত্র ত কোন

দিনই ব্যবহার করেন না। কখনও মায়ের শরীর একেবারে ঠাণ্ডা, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকেন। বলেন "কোন গোলমাল নাই, এও এক কীর্ত্তন।" আমাদের ত দেখিয়া ভয়ই লাগে। শ্বাসের গতিও ঠিক থাকে না। আবার কখনও শরীর অস্বাভাবিক গরম।

আজ মামুর বাসায় ভোগ গ্রহণ করিয়া মা বৈকালে বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। সন্ধ্যায় বিন্ধ্যাচল পৌঁছিলেন। কাশী হইতে মা বিন্ধ্যাচল যাইতেছেন শুনিয়া কমিশনার, পুলিশ কমিশনার প্রভৃতি কয়েকজন সপরিবারে বিন্ধ্যাচল যাইবেন ও প্রসাদ নিবেন বলিয়া দিলেন।

আমরা প্রায় সন্ধ্যায় পৌঁছিলাম। একটু পরেই উপরোক্ত ভদ্রলোকেরা মির্জাপুরের আরও কয়েক জন অফিসারকে নিয়া মা'র দর্শনে আসিয়া উপস্থিত। রাত্রিতে উহারা প্রায় ২৫।২৬ জন প্রসাদ নিলেন। মা'র এমনই সুব্যবস্থা যে সকলকেই রীতিমত ভাল ভাবে খাওয়ান হইয়া গেল। তাঁহারা অবাক হইয়া বলিতেছিলেন কি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে এই সব ব্যবস্থা এত অল্প সময়ের মধ্যে হইল। অথচ বিন্ধ্যাচল আশ্রমে আমাদের কেহই ছিল না। বেলুও আমাদের সঙ্গেই কাশী হইতে আসিয়াছে। উপরোক্ত অফিসাররা মায়ের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা বলিয়া রাত্রি প্রায় ১০॥-১১টায় ফিরিয়া গেলেন।

৯ই আগষ্ট ১৯৬১।

আজ দুপুরে মা আহারাদি করিয়া এলাহাবাদ হইতে ট্রেণ ধরিবার জন্য রওনা হইলেন। এলাহাবাদে বিন্দুদের বাড়ীতে যাওয়া হইল। কয়েক ঘণ্টা তথায় থাকিয়া রাত্রি ১০টায় দিল্লীর গাড়ী ধরা হইল।

১০ই আগষ্ট ১৯৬১।

আজ দুপুরে দিল্লীতে আপার ইণ্ডিয়া এক্স্প্রেসে প্রায় ১১টায় পৌঁছিলাম। বহু ভক্তেরা ষ্টেশনে ছিলেন। এখানেও মায়ের একটু বিশ্রামের জন্য দর্শনের সময় সন্ধ্যা ৬।।টা হইতে রাখা হইল।

কথা হইয়াছে ঝুলনে মা একাদশী হইতে পূর্ণিমা অবধি বৃন্দাবনে থাকিবেন। সেই অনুযায়ী ২১শে সোমবার মায়ের বৃন্দাবন রওনা হওয়ার কথা হইয়াছে। ২২শে হইতে ঝুলন আরম্ভ। ২৫।২৬ ঝুলন পূর্ণিমা। বৃন্দাবনে মণ্ডির রাণী মায়ের জন্য যে বাড়ী করিয়াছেন, ২৬শে আগষ্ট তাহার উদ্‌ঘাটন হইবে। তাঁহারাও সকলে যাইবেন ও কীর্ত্তন পার্টি যাইবে এই সব স্থির হইল।

কবিরাজ মহাশয় বম্বে হইতে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার অপারেশনের স্থানটা এখনও সম্পূর্ণ শুখায় নাই—তাই অনেক চেষ্টায় ডাঃ সন্তোষ সেনকে আনিয়া দেখান হইল। তাঁহার এত কাজ যে তাঁহাকে পাওয়াই মুস্কিল। তবুও মা'র কাজে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন এখনও আধা ইঞ্চি ঘা আছে। পরে মায়েরও খেয়াল হইল, আর ডাক্তারও বলিলেন—কবিরাজজীকে নাসিং হোমে কিছুদিন রাখার জন্য। তাই স্থির হইল। মা বৃন্দাবন রওনা হওয়ার পূর্ব্বেই কবিরাজ মহাশয়কে নার্সিং হোমে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, ভালমত চিকিৎসা হইবার জন্য। টিহরীর মহারাণীকে মা বলিয়া দিলেন তিনিই কবিরাজজীর খাওয়া দাওয়া সব তৈয়ার করিয়া পাঠাইবেন। কমলও ঐ বাড়ীতেই কবিরাজজীর জন্য রহিল।

২০শে আগষ্ট ১৯৬১।

আজ বিড়লাজীর অনুরোধে নারায়ণদাসজী মাকে সন্ধ্যায় বিড়লাজীর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে নিয়া গেলেন। অল্প সময় তথায় থকিয়াই

চলিয়া আসিবার কথা। কিন্তু ওখানে গিয়া মা বসিবার পরই ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি বন্ধ হইতেই মাকে সকলে নিয়া রওনা হইলেন। কথা হইয়াছিল মাকে ফিরিবার সময় একটু নার্সিং হোমে কবিরাজজীকে দেখিবার জন্য নিয়া যাওয়া হইবে। কিন্তু বৃষ্টিতে রাস্তায় এমন ভয়ানক জলস্রোত বহিতে লাগিল যে নারায়ণ দাসজী আমাদের ধরিতে পারিলেন না। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরেই লাইট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোন প্রকারে আমরা ঐ জলস্রোতের মধ্য দিয়াই খানিক দূর আসিলাম। কমলা যশপালের গাড়ী সেই মাত্র সঙ্গে ছিল। পরমানন্দ স্বামী ও চিন্ময় স্বামী সঙ্গে। আমি, পুষ্প ও কমলা মা'র সঙ্গে আসিয়াছি। অসম্ভব জলস্রোত বহু গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের গাড়ী স্বামিজী আরও অগ্রসর করিয়া নিতে বলিতেছিলেন। মা বলিলেন—'গাড়ী থামাও ঐ দিকে যাওয়া যাইবে না।' গাড়ী থামাইয়া মায়ের সঙ্গে আমরাও নামিয়া পড়িলাম। অতি সন্তর্পণে জলস্রোত পার হইয়া রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা দোকান ঘর বন্ধ ছিল, তাহার বারান্দায় গিয়া মা উঠিলেন। জল কমিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই আমরা আশ্রয় নিব স্থির হইল। বৃষ্টিও চলিতেছে। তাই জলও কমিতেছে না। এমন অবস্থায় আর বোধহয় কথনও পড়িতে হয় নাই। যাক মা সঙ্গে, তাই ইহাতেও আনন্দ। সামনের একটা দোকান হইতে একটা ছোট্ট চেয়ার আনিয়া মাকে বসিতে দেওয়া হইল।

অনেকক্ষণ পর স্বামীজী গিয়া আগা সাহেবের বাড়ী হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া আসিলেন। তখন রাস্তায় জল একটু কমিয়াছে বলিয়া আমরা রওনা হইলাম। রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি নারায়ণ দাসের গাড়ী আসিয়া হাজির। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন—তিনি নার্সিং হোমে গিয়াছিলেন কিন্তু মা'র গাড়ী কোন্ দিকে গেল তিনি ধরিতে পারেন নাই। অনেকক্ষণ সকলেই নার্সিং হোমে মা যাইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া ছিলেন কিন্তু মা না যাওয়ায় তিনি মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

এদিকে স্বামীজী ও আগা সাহেব ইতিপূর্ব্বেই মাকে বলিয়াছিলেন যে নার্সিং হোমে যাওয়ার এখন কোন উপায়ই নাই—ঐ দিকে ভয়ানক জল। তাই মা নার্সিং হোমে যাওয়া হইবে না শুনিয়া আশ্রমেই রওনা হইতেছিলেন। এখন নারায়ণ দাস কোন রাস্তা দিয়া নার্সিং হোমে গিয়াছিলেন শুনিয়া মা বলিলেন "চল তবে নার্সিং হোমে"। কিন্তু নারায়ণ দাসজী বলিলেন—মা, ওখানকার সব লাইট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, লিফ্ট বন্ধ হইয়াছে তিন তলায় উঠিতে হইবে। অতএব না যাওয়াই ভাল। তখন আশ্রমে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল।

আগামীকল্য সকালে আমাদের বৃন্দাবন রওনা হওয়ার কথা।

আশ্রমে আসিয়া দেখি এদিকেও ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একজন সাহেব তাহার মেমকে নিয়া রোজই মা'র কাছে আসে; আশ্রমে এই কাদায় কমলার গাড়ীতে যাওয়া সম্ভবই ছিল না—হাঁটিয়াই এতটা পথ যাইতে হইত। কিন্তু ঐ সাহেবটি তাহার গাড়ী নিয়া মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার গাড়ী এই কাদায় জলে যাইতে পারিবে। মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহারা তাহাদের গাড়ীতে বসাইয়া সকলকে মা'র সঙ্গে আশ্রমে নিয়া আসিল।

২১শে আগষ্ট ১৯৬১।

আজ সকালে আমরা দিল্লী হইতে রওনা হইয়া দুপুরে বৃন্দাবন আসিয়া পৌঁছিলাম। ঝুলনের সব ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কাল একাদশী হইতে ঝুলন আরম্ভ। মা ঝুলনে বৃন্দাবন থাকিবেন শুনিয়া অনেক ভক্তেরাও নানাস্থান হইতে আসিয়াছেন। মায়ের যেমন স্বাভাবিক রীতি, নিখুঁতভাবে সব কাজ সম্পন্ন হইবার জন্য ব্যবস্থা করাইতেছেন। স্বরূপানন্দ স্বামী এখানে আশ্রমের ভার নিয়া আছে। মায়ের নির্দ্দেশানুযায়ী সে সব কাজ করিতেছে।

২২শে আগষ্ট ১৯৬১।

আজ একাদশী; ঝুলন আরম্ভ হইল। প্রতি বছরই এখানে ঝুলনের পূর্ব্ব হইতেই আশ্রমে প্রতিদিন রাস হয়। ১৪।১৫ দিন ধরিয়া সন্ধ্যায় রাস হয়। ঝুলা অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। বম্বে হইতে মুলজীভাই মাকে একটি ঝুলা সহ রূপার কৃষ্ণ দিয়াছিলেন। বেশ বড় কৃষ্ণটী—মাঝখানের ঝুলায় তিনি বসিলেন। দুই পাশে চিত্রার নূতন কৃষ্ণ তৈয়ার হইয়াছে। মায়ের ছবি এবং আরও গোপাল মূর্ত্তি সব বসিয়াছেন। চিত্রা মেয়েদের নিয়া মায়ের নির্দ্দেশমত ফুল পাতা দিয়া সব সাজাইয়াছে। সন্ধ্যায় প্রতিবারই পূজা হয়। এবার লোকাভাবে মা আমাকেই পূজায় বসাইলেন। সামনেই মা, অবধূতজী ও আরও বহু পূজক বসিয়া আছেন। অনেকদিন পূজা করি নাই, কোন রকমে পূজা সমাপ্ত করিলাম। এর মধ্যে এক কাণ্ড—ধূপকাঠির আগুনে কি করিয়া আমার গায়ের চাদরটী পূজায় বসিবার পূর্ব্বেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। শোভা তাহা দেখিয়া বলিতেই মা বলিলেন—"ঐ চাদর খুলিয়া ফেল্" এই কথা বলিয়া মায়ের গায়ের চাদর খুলিয়া আমাকে দিলেন। কার্য্যের পূর্ব্বেই পুরস্কার।

পূজা হইয়া গেলেই রাস আরম্ভ হইল। মা হরিবাবাজীর আশ্রমে রওনা হইয়া গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। খানিকক্ষণ ওখানে থাকিয়া মা ফিরিয়া আসিলেন। ওখানেও হরেকৃষ্ণ ঝুলা তৈয়ার করিয়া ঠাকুর সাজাইয়াছে। হরিবাবা খুবই আগ্রহ সহকারে তাহা মাকে দেখাইলেন। খানিকক্ষণ ওখানে আনন্দ করিয়া মা ফিরিয়া আসিলেন।

২৩শে আগষ্ট ১৯৬১।

বহু ভক্তেরা ও স্থানীয় লোকও বহু আসিয়াছে। খুবই আনন্দের সহিত উৎসব চলিতেছে। আজ প্রভুদত্তজী চক্রপাণিজী প্রভৃতিকে এখানে ভোজন করান হইল।

২৫শে আগষ্ট ১৯৬১।

আজ ঝুলন পূর্ণিমা। মায়ের বিশ্রামেরও সময় নাই। ছোট কুঠিয়াতেই মা থাকেন। সব ঠিক করিতেছেন, করাইতেছেন। আজ রাত্রিতে ১১টী ঝুলায় ১১জোড়া রাধাকৃষ্ণ ঝুলিবেন। ঝুলা সব ভাগবত 'হলে' সাজান হইতেছে। আর একাদশী হইতে যে ঠাকুরদের ঝুলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা দুই মন্দিরের মধ্যবর্ত্তীস্থানে করা হইয়াছে। তাহা সাজাইবার লোকেরা আসিয়া অতি সুন্দরভাবে করিয়া গিয়াছে। প্রভুদত্তজীর বিশেষ আহ্বানে আজ মা তাঁহার আশ্রমে ভোগ গ্রহণ করিতে গেলেন। সঙ্গে অনেকেই গেলেন। প্রভুদত্তজী যখনই মায়ের কাছে ভোজন করেন বা মাকে নিয়া ভোজন করান, মায়ের সঙ্গেই আহারে বসেন। খুবই আনন্দে খাওয়া দাওয়া হইল। তিনি এখনও ফলাহারই খান।

আহারের পরই মা আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। মণ্ডির রাজা রাণী ও মেয়ে বেবী আসিয়াছেন। মা'র জন্য তাঁহারা এই আশ্রমে একটা সুন্দর বাসস্থান তৈয়ার করিয়াছেন। আগামীকল্য পূর্ণিমার মধ্যেই মায়ের সেই ঘরে প্রবেশ হইবে। এইজন্যই ইঁহারা আসিয়াছেন।

সন্ধ্যায় ঠাকুরদের পূজাদি হইয়া গেলেই ১১ ঝুলায় ১১টা রাধাকৃষ্ণ বসিলেন। সখীরাও সব নাচগান করিতে লাগিলেন। বহুলোক একত্রিত হইয়াছে। আশ্রম ঝম্ ঝম্ করিতেছে। ঠাকুর ঝুলায় ঝুলিতেছেন। অনেক সাধু দর্শনে আসিয়াছেন। অবধূতজী হরিবাবাজীও আসিয়াছেন। আনন্দে ভরপুর। অনেক রাত্রিতে লীলা শেষ হইল।

মণ্ডির রাণী মায়ের জন্য যে বাসস্থান তৈয়ার করিয়াছেন তাহাতে ৩টা কোঠা। মধ্যের ঘরে মায়ের জন্য অতি সুন্দর ঝুলা তৈয়ার করা হইয়াছে। মাকে রাণী সেখানে ধরিয়া নিয়া বসাইলেন। মুকুট মালা ইত্যাদি দিয়া সাজাইলেন। রাজা, রাণী, মেয়ে মা'র আরতি করিল। মা

হইয়া গিয়াছে, এখন শুনিলাম আমাদের যাওয়া হইবে না। মাকে বলিলাম জিনিষপত্র সব বাঁধা ছাঁদাও হইয়া গিয়াছে। মা নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন—"তার আর কি? খুলিয়া নিবি!" যাক্ আর বাক্য ব্যয় করার কোন ফল নাই, মার ভোগ রান্না করিতে চলিয়া গেলাম।

যথা সময়ে মা রওনা হইলেন। আমরা প্রণাম করিতেই বলিলেন—"ভালমত থাকিও।" যে কেহ কোথায়ও মাকে প্রণাম করিয়া যাওয়ার সময় মা অনেক সময় বলেন—"ভালমত যাইও, ভালমত আইও" ৩ বার বলেন। সঙ্গে গেলেন স্বামী পরমানন্দ ও চিন্ময়ানন্দ, ফুটন, বাচ্চু, প্রভাদি, চিত্রা, পুষ্প, বিল্বো, হেমিদি ও শান্তা।

২৯শে আগষ্ট ১৯৬১।

চিঠি পাইলাম। মা "বাঘাট হাউসে"ই উঠিয়াছেন। ১লা ওখানে জন্মাষ্টমী করিয়া ২রা সেপ্টেম্বর দেরাদুন রওনা হওয়ার কথা এবং ৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লী পৌঁছিবার কথা। আমরা তিন তারিখ রওনা হইয়া দিল্লী যাইব।

হরিদ্বারে যাওয়ার পথে দিল্লিতে ২ ঘণ্টা গাড়ীর সময় ছিল। তাহারই মধ্যে মা নার্সিং হোমে গিয়া কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে ২।১ দিনের মধ্যেই ছাড়িয়া দিবে। শুনিলাম মা ভোরে স্টেশনে পৌঁছিলে টিহরীর মহারাজা নিজে মাকে লইয়া "বাঘাট হাউসে" গেলেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা তিনজনে ঐখানেই আছে। মা ঐদিকে যাইবেন তাহারা জানিত কিন্তু ঠিক কবে তাহা জানা ছিলো না। মা যখন ভোর ৬টায় পৌঁছিলেন তখন তাহারা গায়ত্রী পুরশ্চরণ জপে রত। মা তাহাদের ঘরে

ঢুকিলেন। সামনে মায়ের ফটোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ, পিছনে স্বয়ং মা দণ্ডায়মান!

হরিদ্বারে অসহ্য গুমোট গরম! ভীড় নাই। কেহ জানে না যে মা আসিয়াছেন। এমন কি রাজাসাহেবও নাই। কথা যে মা জন্মাষ্টমী করিয়া দেরাদুন যাইবেন। ব্রহ্মচারীদের স্বহস্তের রান্না মা দুপুরে লইতেছেন— নির্ব্বাণানন্দ মাকে খাওয়াইয়া দিতেছে। মাকে বেশ ক'দিন একান্তে তাহারা পাইল।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১।

আমি দিল্লীতে আজ দুইদিন হয় আসিয়াছি। শুনিলাম জন্মাষ্টমীর দিন চিত্রাকে মা বৃন্দাবনে যে অষ্টধাতুর কৃষ্ণ দিয়াছেন—তাহার অভিষেক ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। একতলার 'হলে' সকলে মিলিয়া ঠাকুরের জায়গা সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিল। জয়পুরের কমলা মাকে হলুদ কাপড়, চাদর, ওড়না ও হাতে রূপোর বাঁশী দিয়ে কৃষ্ণ সাজাইয়া আরতি করিল। নীচে জমজমাট কীর্ত্তন। রাত পৌনে ১২টায় মা নীচে নামেন। চিত্রার পুরাতন রূপার ঠাকুরের নাক ফুটা হইয়া গিয়াছে তাই তাঁহাকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে।

পরদিন সকাল ১০টায় মা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের নিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে গেলেন। নির্ব্বাণানন্দ, ভাস্করানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, প্রভৃতি সবাই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া আসিল। মা গাড়ীতেই বসিয়াছিলেন। সবাইকে নিয়া মা দেরাদুনে রওনা হন।

সন্ধ্যাবেলা কিশনপুর আশ্রমের নীচের 'হলে' নন্দোৎসব হইল। জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত একটী নূতন গোপাল মূর্ত্তিরও পূজা হইয়াছিল।

মা নাকি সেটি নিয়া 'হলে'র স্ত্রী পুরুষ সকলের মাথায় স্পর্শ করাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেয়েদের সকলের হাত ধরিয়া "নন্দদুলাল, যশোদাদুলাল" নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কমলা গোপিণী সাজিয়া ঘড়া কোমরে নিয়া ঘোমটা দিয়া 'হল্'-এ প্রবেশ করিলে মা কিছুক্ষণ কমলাদির ঘাড়ে হাত দিয়া ঘুরিলেন। পরে ছোট্ট দইয়ের ভাঁড় হইতে কমলাদির ঘড়ায় মা একটু দই ঢালিয়া ঘড়া মাটীতে ফাটাইতে বলিলেন। পরে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত অনেকের মুখেই মা নিজে দইয়ের ছিটা দিলেন।

৪ঠা সকালে পুরাতন ভক্ত মিঃ সূদের বাড়ী অরণ্যকুটীরে মাকে লইয়া যাওয়া হয়। সূদ দম্পতী তাঁহাদের বাড়ী মা'র আশ্রমভুক্ত করিয়া মা'র চরণে অর্পণ করিয়া দিলেন। মা প্রথমে মেয়েদের ওখানে গিয়া গীতাপাঠ ও কীর্ত্তন করিতে বল্লেন—পরে স্বামী পরমানন্দকে নিয়ে মা যান। বাড়ীটী বিরাট ও চতুঃপার্শ্বে বহুবিস্তৃত জমি বাগান আছে। দূরের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম।

কাল সন্ধ্যা ৭টায় মা মিঃ আগার সেলুনে দিল্লী রওনা হন। আগাসাহেব সম্প্রতি রেলের I. G. হইয়াছেন। স্বামী-স্ত্রী হরিদ্বার হইতেই মা'র সহিত আছেন। স্টেশনে যাইবার পথে মা হংসাদেবীর বাড়ী ও আরো কয়েক জায়গা হইয়া আসিয়াছেন।

আজ সকালে স্টেশনে নামিয়াই মা সোজা ডাঃ সন্তোষ সেনের বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু দেখা হইল না। বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে মা কবিরাজ মহাশয়কে নার্সিং হোমে রাখিয়া যান। তাঁহার ঘা-টা এখনো সম্পূর্ণ শুকায় নাই। আশ্রমে পৌঁছিয়াই মা ঠিক করিলেন যে গোপীবাবাকে নিয়া মা পুনরায় বম্বে যাইবেন। লীলাবেনকে ফোন করাতে জানা গেল যে তিনি তাঁহার বাবার অপারেশন হইবে এই কারণে খুবই ব্যস্ত। তখন স্থির হইল যে বম্বের ডাক্তারদের মতে ঔষধ প্রয়োগ এখানে নার্সিং হোমে থাকিয়াই করা হইবে। উপস্থিত মায়ের বম্বে যাওয়া স্থগিত হইল।

আজ সন্ধ্যাবেলা ইন্দিরা গান্ধী মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মায়ের বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার আসার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন ইন্দিরাজী কার্য্যগতিকে সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাই মা আসিয়াছেন শুনিয়াই আসিলেন। আজই তিনি সফর করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর কিছুক্ষণ একান্তে কথাবার্ত্তা হইবার পর— মা পুষ্পকে ডাকিয়া ইন্দিরাজীকে দুইখানি গান শুনাইতে বলিলেন। ঘরে পুষ্প ছাড়া তৃতীয় কেহ ছিল না। পরে মায়ের মুখে শুনিলাম যে গান শুনাইবার সময় মা খাট হতে নামিয়া কার্পেটে তাঁহার পাশেই বসিয়াছিলেন। অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ গান শুনিতে শুনিতে ইন্দিরাজীর ঘুম আসিতেছে দেখিয়া মা তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার মা কমলাও তো এ শরীরের কোলে মাথা দিয়ে শুতো—তুমিও শোও, কিছু হবে না।" ইন্দিরাজী নাকি মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ শুইয়াছিল। পুষ্পও বলিল যে সে চক্ষু বুজিয়া গান করিতে করিতে চোখ মেলিয়া হঠাৎ দেখে যে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া ইন্দিরাজী শোওয়া।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১।

আজ সকালে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ হইতে বিমলা সিন্ধী (ওখানে কাজ করে) ফোন করিয়া আমাকে বলিল যে ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবারে সকালে পুষ্প ওখানে যাইয়া গান করিতে পারে কিনা? মা শুনিয়াই বলিলেন—"নিশ্চয়ই করবে।" সন্ধ্যাবেলা বিমলা সিন্ধী আসায় মা বলিলেন—"ইন্দিরার ওখানে গিয়ে নিশ্চয়ই গান শোনাবে। ভগবৎকীর্ত্তন শুনিয়ে লোককে আনন্দ দেওয়া ত মহাসেবা।"

কথাপ্রসঙ্গে মা কমলা নেহেরুর কথা বলিলেন। দেরাদুনে যখন মা প্রথম ঢাকা হইতে আসেন ও আনন্দচকে থাকিতেন তখন কমলাজী মা'র কাছে খুবই যাতায়াত করিতেন। তাঁহার ধ্যান খুব জমিয়া যাইত এবং মাকে বলিয়াছিলেন যে ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনও হইত। এক একদিন ধ্যান এমন জমিয়া যাইত যে বৃষ্টি পড়িতেছে—হুঁস্ নাই। রাত্রে মায়ের কাছেই মাটীতে এক একদিন শুইতেন। হাতে "রোশনাই ঘড়ি" ছিল—ঠিক ভোর ৫টা বাজিতেই উঠিয়া চলিয়া যাইতেন। এক একদিন সকালে পণ্ডিত নেহরুর জন্য টিফিন কেরিয়ারে খাবারও নিয়া আসিতেন। পুনরায় সময় মত চলিয়া যাইতেন পিতাজীকে খাওয়াইতে। কিছুদিন পর কমলা নেহেরু বেশী অসুস্থাবস্থায় যখন ভাওয়ালীতে ছিলেন—মা আলমোড়া যাওয়ার পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে নামেন। নার্সগণ বাধা দেওয়ায় কমলাজী বলিয়াছিলেন—"দেখা না হইলে আমার শরীর আরো খারাপ হইবে।" আলমোড়া হইতে নামিবার সময়ও মা ভাওয়ালী হইয়া আসিলেন—সে-বারই শেষ দেখা। মৃত্যুর পূর্ব্বে মায়ের দেওয়া হাতের বালা ইন্দিরাকে উনি দিয়া যান। মা বলিলেন, মায়ের ব্যবহৃত ১টা বালিশ ও কাঁথাও মা তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১।

পূর্ব্ব প্রোগ্রাম অনুসারে আজ পুষ্প, শান্তা ও কমল ইন্দিরা গান্ধীর বাড়ীতে ভোর ৬টায় গেল। ইন্দিরাজী ও অন্যদের পুষ্পর গান শুনিয়া খুব ভাল লাগিয়াছে বিমলা বলিয়াছিল।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১।

প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদজী কিছুদিন পূর্ব্বে পুণায় মা'র নিকট আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাহার পরই তিনি খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি মাকে

রাষ্ট্রপতি ভবনে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। মা আজ পুষ্প, কমল ও আমাকে নিয়া সকাল ১১টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলেন। মা'র কথা তোলার জন্য Tape recording machineও ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে দেখিলাম। মাকে প্রশ্ন করায় মা অনেক কথা বলিলেন। পুষ্প দুটী ভজন গান করিল।

আজই সকালে পণ্ডিত নেহেরু রাশিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইন্দিরাজী মা'র জন্য রাশিয়া হইতে আনীত আঙ্গুর, আপেল ও সবেদা (ফুটী) পাঠাইয়াছেন। সবেদাটী একটী ছোট্ট ঢোলের মতন বিরাট। মা নিজের হাতে সবাইকে রাশিয়ার আঙ্গুর দিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি আঙ্গুর ধুইয়া মাকে ২।১টি খাওয়াইলাম। খুব মিষ্টি আঙ্গুর। সবেদাও কাটিয়া আশ্রমের সবাইকে ও ভক্তদের ২।১টী করিয়া খাওয়ানো হইল

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ কয়েকজনকে আশ্রমে প্রসাদ নিতে বলা হইয়াছে। বিমলা সিন্ধীও আসিয়াছে। প্রসাদ নিবার পর বিমলা হঠাৎ বলিল যে ক্ষীর (মিষ্টান্ন) এত ভাল হইয়াছে, আমি ইন্দিরাজী ও পণ্ডিতজীর জন্য একটু দিলে নিয়া যাই। অগত্যা অল্প মিষ্টান্নই তাহার সাথে পাঠানো হল। বিমলা মেয়েটীর বেশ সহজ সরল ভাব।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ মোদীর স্ত্রীর নূতন গোপালের প্রাণপ্রতিষ্ঠা আশ্রমে হইল। ইন্দিরা গান্ধী আজও দুপুরে আসিয়া মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলিয়া গেলেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

রেহানা মা আজ বিকালে মা'র কাছে আসিলেন। জওহরলালজী ও ইন্দিরার শরীর রক্ষার জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করাইবার যে প্রেরণা পাইয়াছেন মা'র কাছে তিনি সেই কথার উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে এই প্রেরণা স্বর্গগতা কমলা নেহেরুর নিকট হইতে আসিয়াছে যে "বড়া কোঠী"তে (পণ্ডিতজীর আবাসস্থানে) মহামৃত্যুঞ্জয় জপ হওয়া দরকার। মাকে তিনি বলিলেন "মা, তোমার উপর এই মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করাইবার ভার আমি দিয়া খালাস। কারণ কমলার খাস্ "মা" তুমি। তুমি যাহা বলিবে তাহাই হইবে।" মা বলিলেন—"এ শরীর তো সৎ ও শুভ অনুষ্ঠান যদি কেউ করিতে চায় তাহা করিতেই বলে—আদেশের কী প্রশ্ন?"

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ সকালে ইন্দিরাজী নিজেই ফোন করিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা ইন্দিরাজীকে রেহানা-মা'র মহামৃত্যুঞ্জয় জপের প্রেরণার কথা বলিলেন। মা'র সঙ্গে ইন্দিরাজীর কিছুক্ষণ একান্তে কথাবার্ত্তা হইল।

রেহানা মা একজন মুসলমান কৃষ্ণসাধিকা। ছোটবেলা হইতে তাঁহার সহজাত কৃষ্ণভক্তি। তাঁহার লিখিত Heart of a Gopi বইটী বিখ্যাত। সঙ্গীত-সাধক দিলীপ রায়ের "সেই বৃন্দাবনের লীলাভিরাম" গানটী এই বইয়ের কথারই একটি গীতছবি।

মা আজ রাত্রে জয়পুর রওনা হইলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ ভোরে মা জয়পুর আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানকার Public Service Commission-এর Chairman শ্রীমদনমোহন বর্ম্মার একান্ত অনুরোধে মায়ের জয়পুরে পদার্পণ। বর্ম্মাজীর নতুন বাড়ীতে এপ্রিল মাসেই মায়ের আসিবার কথা ছিল। কিন্তু তখন শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজজীর অসুস্থতার জন্য মাকে তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিতে হইয়াছিল। বর্ম্মাজী তাঁহাদের বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই মাকে কাছেই নূতন এক বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আনন্দ মোহনলাল ও তাহার মা কমলা এখানেই আছে। কমলা খুবই সুন্দর পরিপাটি করিয়া মায়ের ঘর গুছাইয়া রাখিয়াছে। সকলেই খুব আনন্দে আছে।

ইতিমধ্যে একটী ঘটনায় অশান্তির সূত্রপাত হইল। দেরাদুনের ৺পরশুরামজীর মেজ ছেলে বিক্রমকে এবারে মা দেরাদুন যখন যান তখন সঙ্গে করিয়া নিয়া আসেন। মোহিনী তাহার ভাইয়ের দুর্ব্যবহারের কথা বারবারই মাকে জানাইয়াছে। ছেলেটী abnormal চিরকালই ছিল। এখন পিতার মৃত্যুর পর সেটা বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইয়াছে। মায়ের হঠাৎ খেয়াল হইল যে বিক্রম মায়ের সঙ্গে দিল্লী আসুক। দিল্লীতে ক'দিন সে বেশ শান্তই ছিল। জয়পুরে নামিয়া স্টেশন হইতে সোজা আমরা বর্ম্মা সাহেবের বাড়ী যাই। প্রভাত আরতি সেখানে হইবার পর মা নূতন বাড়ীতে—যেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সেখানে আসিলেন। বিক্রম এতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই ছিল; নূতন বাড়ীতে আসিবার পর তাহাকে আর পাওয়া গেল না। তাহাকে বোধহয় গাড়ীতে উঠিবার সময় অত খেয়াল করিয়া দেখা হয় নাই। বর্ম্মার বাড়ীতে তখনই খোঁজ করা হইল—সেখানেও তাহাকে পাওয়া গেল না। পরমানন্দ স্বামী ও ছেলেরা সবাই কেউ পায়ে হাটিয়া, কেউ গাড়ী করিয়া সহরের এমাথা হইতে ওমাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র খুঁজিয়া

বেড়াইল। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। পুলিশেও খবর দেওয়া হইল।

মা বিকালে আনন্দের গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে গেলেন। আনন্দ মাকে এখানকার বিখ্যাত গণেশজীর মন্দিরের সামনে নিয়া গেল। স্বামীজী নামিয়া দেখিলেন যে মন্দিরের ভিতর সে আছে কিনা। কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

মা আজ সকাল ১০টায় সকলকে লইয়া এখানকার বিখ্যাত গোবিন্দজীর মন্দিরে গেলেন। গোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়া মা গোবিন্দকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন যে প্রথমবারে বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে মা জয়পুরের গোবিন্দজীকে দেখেন তখন মা দেখিয়াছিলেন গোবিন্দজী যেন মাটীতে দাঁড়ান—সিংহাসন, রাধা—সখী এসব কিছুই মা দেখেন নাই। গোবিন্দজী রাজবেশে এখন যেমন সাজান তাহা নয়—অল্প কাপড় পরানো—মাটীতে দাঁড়াইয়া আছেন। মা সূক্ষ্মে গোবিন্দজীকে এইরূপেই সেবার দেখেন।

আজ বিকালে স্থানীয় কয়েকজনের বাড়ীতে মা গেলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মাসী শ্রীমতী কাটজুর বাড়ীতেও মা যান।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ বিকালে মহীশূরের প্রথমা রাণীর (যিনি মা'র ভক্ত ও এখানে বাস করেন) বাড়ীতে মা গেলেন। আছরোলের রাজারাণীও জয়পুরে থাকেন—তাঁহাদের বাড়ীও মা গেলেন।

আজ রাত্রেই জয়পুর হইতে দিল্লী রওনা হইবার কথা। অতিরিক্ত ঘোরাঘুরিতে মায়ের শরীর ভাল যাইতেছে না। কিন্তু কী উপায়?

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

মা আজ দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসার পথে মা নার্সিং হোমে কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া আসিলেন।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

হোসিয়ারপুর যাইবার পথে হরিবাবাজী তিন দিনের জন্য দিল্লী আসিয়াছেন। তিনি আজ ভোরে দিল্লী পৌঁছিয়াই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্থির হইল আগামীকাল সন্ধ্যাবেলা তিনি আশ্রমে আসিয়া কীর্ত্তন করিবেন।

আজ দুপুরে কবিরাজ মহাশয় নার্সিং হোম হইতে আশ্রমে ফিরিলেন। মায়ের খেয়াল যে ৪ মাস হইয়া গেল, তাঁহার পিছনের ঘাটী যখন সম্পূর্ণ শুকায় নাই, একবার বম্বে গিয়া ডাক্তারদের দেখাইয়া আসা ভাল। কথা হইল তিনি আগামী কাল ভোরে বম্বে যাইবেন। জিতেন দত্ত বম্বে হইতে আসিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গেই ফিরিবেন।

বিক্রমের কোন খোঁজ এখনো পাওয়া যায় নাই। মা আজ সন্ধ্যাবেলা বলিতেছিলেন "অখণ্ডানন্দস্বামী ও ভাইজী যখন ছিল তখন তাহারাই এইসব

সামলাইত। এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করা—বা বলতে হতো না। এখন দেখা যায় এ শরীরকেই সব বলে করতে হয়।"

দেরাদুন হইতে মোহিনী তাহার ভাইয়ের খবর পাইয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়াছে। মা দিল্লীতে আসিয়াই এটাওয়ার গঙ্গাকে দেরাদুনে পাঠান যে বিক্রম ওখানে চলিয়া যায় নাই তো! মোহিনী বলিল যে উহার সঙ্গে কোন পয়সা ছিল না—বিক্রম এমনিতে পাগল হইলেও কাহারো নিকট হইতে কিছু নিবেও না—পয়সাও চাহিবে না। যাক্—মোহিনীর কান্না দেখিয়া সকলেরই মনটা বড় দমিয়া গেল। মা পঙ্কজদাকে ডাকিয়া কাগজে ছবি ছাপাইতে বলিলেন। বিল্বজী মাকে বলিল যে উহার ইচ্ছা যে মুন্নিকে নিয়া পুনঃ জয়পুরে গিয়া চেষ্টা করিবে। নিশ্চয়ই বিক্রম সেখানেই আছে।

মোহিনী মাকে যাইবার আগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"অনেক হইয়াছে—এবার বিক্রম ও আমার ভোগ শেষ করিয়া দাও।" মা মোহিনীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তুই কাঁদিস না—দেখা যাক্ কী হয়।"

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ ভোরে কবিরাজ মহাশয় বম্বে রওনা হইলেন। মা ভোর ৬টায় উঠিয়া নীচে নামিয়া গাড়ীতে বাবাকে তুলিয়া দিলেন।

সন্ধ্যাতে হরিবাবার কীর্ত্তন হইল। আজ ভক্ত হরিদাসের মৃত্যুদিবস—হরিবাবা সৎসঙ্গে সেই বিষয়ে বলিলেন। আজ পূর্ণিমা—খোলা মাঠে চাঁদের আলোয় কীর্ত্তনে খুব মধুর পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ সকালে ইন্দিরাজী নিজ হইতে ফোন করিয়া বলিলেন যে তিনি আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ পাইবেন ও মা'র সঙ্গে কথা বলিবেন। সঙ্গে ছোট ছেলে সঞ্জয়ও আসিবে।

ইন্দিরাজী, বিমলা, সঞ্জয় ও আরেকজন মহিলা—ইন্দিরাজীর বন্ধু—আসিলেন। উপাধ্যায়জীও আসিয়াছেন। নীচে দিদিমার ঘরে ও বারান্দায় সবাই প্রসাদ পাইলেন। ইন্দিরাজীর আজকাল বেশ যেন ঘরোয়াভাব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী রান্না বিশেষ পছন্দ করেন ও ক্ষীরটী এদের খুবই প্রিয়। মা-ও নীচে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের খাওয়া দেখিতেছিলেন। খাওয়ার পর উপরে আসিয়া ইন্দিরাজী বসিলেন ও পুষ্প একটি গান শুনাইল।

বিকালে রেহানা মা আসিলেন। তিনি মা'র কাছে পুনরায় মহামৃত্যুঞ্জয় জপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাঁহার মতে "বড়া কোঠী"তে অর্থাৎ জওহরলালজীর বাসভবনেই এই যজ্ঞ হওয়া দরকার। কারণ "বড়া কোঠী"র বাতাবরণ পবিত্র শুদ্ধ করা দরকার। ওখানে যদি না হয় তাহা হইলে কমলাজীর প্রেরণাতেই যখন ইহার সূত্রপাত তখন তাঁহার "গুরুস্থান" অর্থাৎ মা'র কোনও আশ্রমে হওয়া উচিত। মা রেহানা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পণ্ডিতজী কী মহামৃত্যুঞ্জয় হইবার পক্ষে? রেহানামা বলিলেন, "মাকা আদেশ পণ্ডিতজী জরুর মান লেঙ্গে।"

আজ দুপুরেই ফোনে খবর আসিল যে বিক্রমকে জয়পুর স্টেশনের ক্যান্টিনের পিছনে পুলিশেরা খুঁজিয়া পাইয়াছে। মা শুনিয়াই বলিলেন—"গণেশজীকে তো প্রথমদিনই বলা হয়েছিল "তুমি ওর 'দেখ্‌ভাল' করো আবার গোবিন্দজীকেও বলা হয়েছিল। কার কাছে আর ওকে রেখে আসবো বলো—তাই গণেশ ও গোবিন্দর কাছে ওর ভার দিয়ে আসি—যাক্ এক্ষনি মুন্নিকে বলে দাও যেন গণেশের মন্দিরে ১০১৲ ভোগ দ্যায়।"

সকলেই নিশ্চিন্ত হইল। অবশ্য প্রথম হইতেই আমরা জানিতাম যে বিক্রমকে ঠিকই পাওয়া যাইবে। মায়ের তো সব কাজেই নিপুণতা—সব জানিয়া শুনিয়াও নিজে ব্যস্ত হ'ন সকলকে কর্ম্মে লাগাইবার জন্য।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ বিক্রমকে নিয়া উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। মা বলিতেছিলেন—"ঠিক অজগরবৃত্তি—কেমন সুন্দর ভাব দেখো—নির্ব্বিকার—কেউ দিয়েছে তবে খেয়েছে—নিশ্চেষ্টভাব। গণেশের ও গোবিন্দের উপর ভার দিয়েছি—কাজেই কেউ না কেউ নিজে থেকে এসে ওকে খাবার দিয়ে খাইয়েছে।"

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ কথাপ্রসঙ্গে মা আশ্রমস্থ ভাইবোনদের বড় সুন্দর কয়েকটি কথা বলিলেন—"তোমরা এপথে এসেছ বিশ্বজয় করতে। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, এক আত্মা—এই তো তোমাদের দিক্—নিজেদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য—রাগারাগি কথাকাটাকাটি বৈষম্যভাব না রাখা—প্রীতির ভাব রাখলে শীলতা বৃদ্ধি হয়। যদি কারুর কথায় মন খারাপ হয়, বিষের মত তা খেয়ে ফেলা—তোমরা সকলেই ভাল, ভাল, ভাল—ভাল হয়ে আলো করো।"

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

আজ কমলা জয়সওয়াল আশ্রমে নামযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছে। সারারাত মেয়েরা অখণ্ড নাম করিল।

১লা অক্টোবর, ১৯৬১।

সারাদিন নামযজ্ঞ চলিতেছে। সন্ধ্যাবেলা মা ৩ ঘণ্টা 'হলে' বসিলেন ও কীর্ত্তনশেষে উপরে আসিলেন।

মায়ের শরীরটা একটুও ভাল যাইতেছে না। মাথার আওয়াজটাও বাড়াবাড়ি চলিতেছে। শ্বাসের গতিও ঠিক নাই—খাইতেছেন না কিছুই।

২রা অক্টোবর, ১৯৬১।

আজ সন্ধ্যাবেলা পণ্ডিত নেহরুর বিশেষ আহ্বানে তাঁহার বাসায় মা'র যাইবার কথা। বিম্‌লা সিন্ধী আসিয়া মাকে নিয়া গেল। সঙ্গে আমি, চিন্ময়, পুষ্প ও চিত্রা। বাগানে সৌম্য পরিবেশে মা'র বসার জায়গা করা হইয়াছে। বাহিরের কেহই নাই। ইন্দিরাজী অল্পক্ষণ পরে আসিয়া মাকে বলিলেন যে ছোট ছেলের হঠাৎ জ্বর আসায় নীচে সময় মত নামিয়া মাকে অভ্যর্থনা করিতে দেরী হইল। একটু পর পণ্ডিতজীও আসিয়া মা'র কাছে বসিলেন। ইন্দিরাজী ও আমরা দূরে সরিয়া গেলাম। পণ্ডিতজী মায়ের সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা

বলিলেন। দূর হইতে দেখিতে বড়ই ভাল লাগিতেছিল—সান্ধিক্ষণে মায়ের পদতলে ভারতের রত্ন জওহরলালজী স্তব্ধভাবে বসিয়া মায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত কথা শ্রবণ করিতেছেন। মা'র গলায় একটা চন্দনের মালা ছিল—মা সেটা জওহরলালজীর গলায় পরাইয়া দিলেন। পণ্ডিতজী মাঝে মাঝে কথা বলিতেছিলেন। মায়ের সঙ্গে পণ্ডিতজীর কী কথা হইল তাহা মা কিছুই বলেন নাই তবে ধর্ম্মবিষয়ের কথোপকথন ইহা উল্লেখ করেন—"বেশ ধরবার দিক্ আছে।" পণ্ডিতজী কথা শেষ করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দিরাজীর সঙ্গে মা একটু কথা বলিলেন ও পরে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের কর্ম্মচারীবৃন্দরা সব মাকে আসিয়া প্রণাম করিল। প্রবেশের সময় মা বাহিরের রাস্তা দিয়া বাগানে আসিয়াছিলেন। ইন্দিরাজী খালি পায়ে মাকে গাড়ী অবধি তুলিয়া দিলেন। এখন মা হল ঘরের মধ্য দিয়া বাহির হইলেন। আগামী কালই পণ্ডিতজী ও ইন্দিরা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে মাদুরা রওনা হইতেছেন।

৩রা অক্টোবর, ১৯৬১।

রেহানামা'র সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। ইনি খুবই কৃষ্ণ-ভক্ত, বৈষ্ণব-ভাবাপন্না। শুনিয়াছি ইহার বিবাহ স্থির হইলে পর পাত্র বলিল তাহাদের ওখানে কৃষ্ণের নাম চলিবে না—এই শুনিয়া ইনি নাকি বিবাহে অস্বীকার করিয়া দিলেন। ইঁহার বিবাহ হয় নাই। শুনিয়াছি ইনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন। মা এখানে আসিলে পূর্ব্বে কচিৎ কখনও ইনি আসিতেন। এবার প্রায়ই আসিতেছেন। বহুক্ষণ মা'র নিকট বসিয়া থাকেন। গান করেন, কথাবার্ত্তা

বলেন। কখনও কখনও রোজই আসিতেছেন। মাকে তাঁহার খুবই নাকি ভাল লাগিয়াছে, তাই মা'র সঙ্গ করিবার আশায় ঘন ঘন আসিতেছেন। বেশ মিষ্ট স্বভাব। যাহারা তাঁহার কাছে আসে সকলকেই আদর করেন। আজও আসিয়াছেন।

মাকে বহুদিন পূর্ব্বে তুলসী পাতায় দ্বাদশ অক্ষর নাম এবং আরও আরও শিব রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদির নাম লিখিয়া প্রথমে চারথারিয়ার রাণী পাঠান এবং পরে আরও কেহ কেহ পাঠাইতেছেন। মা কাহাকেও কাহাকেও তাহা দেন। কেহ চাহিয়াও নিয়া যায়—এই লীলা চলিতেছে। মা ত বন্দোবস্ত করিয়া কিছুই করেন না, কোনও কারণ উপস্থিত হইয়া এক একটা হইয়া যায়। আজও রেহানা মা বসিয়া আছেন। "নামব্রহ্ম" মন্দিরেই অনেককে নিয়া মা বসিয়াছেন। ইতিমধ্যে মায়ের তুলসী পাতা দেওয়া কোনও কারণে আরম্ভ হইল। রেহানা মা ইহা দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিতেছেন—"ইহ তেরিকা মা নে আচ্ছা নিকালা"। মা যে কোন "তেরিকা"র মধ্যেই নাই তাহা তিনি বুঝিলেন কি? মাকে দেখিয়া অথবা মায়ের ব্যবহার দেখিয়া ঠিক ঠিক ভাবে ধরা আমাদের সাধ্যাতীত। তাই আমরা নিজেদের বুদ্ধি বিচার অনুযায়ী কত-কিই না বলিয়া থাকি, ভাবিয়া থাকি। ইহা ভুল, সন্দেহ নাই। অবশ্য বলিবার কিছু নাই। মা সর্ব্বদাই বলেন—"যে যাহা বলে তাহার নিকট সবই ঠিক। কারণ সে যেখানে থাকিয়া যাহা বুঝিতেছে, তাহাই ত বলিবে। ইহাতে দোষ নাই।"

৮ই অক্টোবর, ১৯৬১।

শ্রীমংতুরাম জয়পুরিয়ার 'স্বদেশী হাউসে' কানপুরে এবৎসর মায়ের উপস্থিতিতে দুর্গা পূজার আয়োজন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এইখানে 'সংযম সপ্তাহ'

মহাব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মা দিল্লী হইতে আজ সকালে কানপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। মংতুরাম ভাইয়ের ছেলে সীতারামভাই, ভাগিনেয় কাশীরামভাই, জিতেনদা প্রভৃতি স্টেশনে মা ও ভক্তদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। মায়ের বাসোপযোগী একটী ছোট্ট ফুসের ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। ইহাদের সুব্যবস্থার তুলনা নাই। যেন একটী ছোটখাট সহর বসাইয়া দিয়াছে। বিরাট আয়োজন। শত শত লোক সেবায় ব্রতী—নিস্তব্ধে হাসিমুখে। সীতারামভাই নিজেও সব দেখাশোনা করিতেছেন। কাশীনাথজী নবরাত্রিতে শুধু গঙ্গাজল খাইয়া থাকিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। দিবারাত্র ছোটাছুটি, দেখাশোনা, তদারক এই কঠোর ব্রতের মধ্যেও করিয়া চলিয়াছেন। মা শুনিয়া রাত্রে মিশ্রীর সরবৎ ও ফল ছানা খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথম ও শেষদিন গঙ্গাজলের ব্রত ও মাঝে একবার ফলাহার খাইবার আদেশ মা দিয়াছিলেন। নানা স্থান হইতে অগণিত ভক্তের সমাবেশ—দৈনিক ৫০০ লোক প্রসাদ নিতেছে। নিপুণ পরিপাটিভাবে সমস্ত ব্যবস্থা হইতেছে।

৯ই অক্টোবর, ১৯৬১।

আজ শুভ মহালয়া। দুপুর হইতে প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। কানপুর সহরে নাকি এত বৃষ্টি সারা বর্ষায় হয় নাই। মা'র ঘরে জল ঢুকিতেছে দেখিয়া সীতারামভাই নিজে দাঁড়াইয়া লোক ডাকিয়া জল সরাইবার ব্যবস্থা করাইলেন। সন্ধ্যার দিকে মা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃষ্টি হঠাৎ থামিয়া গেল।

১০ই অক্টোবর, ১৯৬১।

আজ হইতে নবরাত্রি কল্পারম্ভ। বৃষ্টি সমানেই চলিতেছে। তাঁবুগুলি সব ভিজিয়া যাওয়ায় তাঁবুর লোকদের অতিথিশালায় আনা হইল। সবাই ব্যতিব্যস্ত। এত আয়োজন কী এইভাবে পণ্ডশ্রম হইবে। মায়ের লীলা মা-ই জানেন। সীতারাম ভাইয়ের কিন্তু কোন পরোয়া নেই। প্যাণ্ডেলে জল পড়িতেছে—দেবীর গায়েও দু'চার ফোঁটা জল পড়িল। সারারাত জাগিয়া প্যাণ্ডেলের ত্রিপাল খুলিয়া টিনের চাদর লাগান হইতেছে। মা সব শুনিতেছেন, আর হাসিতেছেন। পূজার ৪টি দিন যেন মাটী না হয়—সবায়ের এই আকুল প্রার্থনা।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৬১।

প্যাণ্ডেলে নিত্য ঘটপূজা কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী করিতেছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দ ষষ্ঠীর বোধন হইতে পূজারীরূপে কর্ম্মভার গ্রহণ করিবেন।

বৃষ্টির বিরাম নেই। মা ইতিমধ্যে দুইদিন তেল মাখিয়া বৃষ্টির জলে স্নান করার জন্য বাহিরে মাঠে গেলেন—তখন আশ্চর্য্য, বৃষ্টি বন্ধ, এক ফোঁটা জল কোথাও নাই। অথচ সারাদিন প্রবল বর্ষণ হইতেছে। গতকাল ১২।১৪ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হইয়া হঠাৎ আজ ভোরে রোদ উঠিল।

পূজার মধ্যে আর বৃষ্টি হয় নাই—শুধু সপ্তমীর দিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ এক মিনিট বৃষ্টি খুব জোরে হইয়া বন্ধ হইল। ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সহরে সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু 'স্বদেশী হাউসে'র কাছাকাছি

ও ভিতরে হঠাৎ খুব জোরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে না পড়িতেই বন্ধ। মা পরে এ বিষয়ে বলেন যে ইহা নাকি মাঙ্গলিক লক্ষণ—পূজার মধ্যে এরূপ বারিপাতকে অমৃত বর্ষণ বলে।

আজ সন্ধ্যাবেলা ষষ্ঠীর বোধন। মায়ের আজ নূতন রূপ—পরণে গৈরিক লালপাড় শাড়ী; মাথার চুড়ায় বেণী; গলায় লাল গোলাপের মালা; শ্রীচরণে চন্দন কাঠের পাদুকা। মা যখন প্যাণ্ডেলে যাইতেছিলেন তখন সত্যই মনে হইতেছিল স্বয়ং হিমালয়-দুহিতা যেন আজ 'স্বদেশী হাউসে'র প্রাঙ্গণে আবির্ভূতা।

বোধনের সময় হঠাৎ বরণডালার একটী ছোট্ট প্রদীপ উল্টাইয়া গেল। পাছে ডালায় আগুন লাগিয়া যায়, মা নিজের ডান হাতের অণামিকা দিয়া সবায়ের অগোচরে তাহা নিভাইয়া দিতে গিয়া মায়ের চামড়ায় ছেঁকা লাগে। সীতারামভাই সেটী লক্ষ্য করিয়াছিল। পরে মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন—'পূজা হয়ে যাক্ পরে বলবো'।

নবরাত্রিতে বম্বের বাসুদেব দম্পতি নবাহ রামায়ণ পাঠ করিতেছেন। স্ত্রী পাঠ করেন, স্বামী শ্রোতা। প্রবল বারিপাতে রামজী ভিজিয়া যাওয়ার পরে স্থান বদলাইয়া রামায়ণ পাঠ সীতারামভাইয়ের অফিসের বারান্দায় হইল। অমৃতজী এত ঝড় বৃষ্টিতেও বাহিরের প্যাণ্ডেলে এজন্য পাঠ করিতেছিলেন যে মা তো ঘরের ভিতর যাইবেন না। মা এরূপ দুর্য্যোগের মধ্যে খোলা প্যাণ্ডেলে বসিতে মানা করিলেন। মা বলিলেন—"তোমরা অফিসের বারান্দায় করো। এ শরীর এমনিতে যায় না, তবে 'রামজীর' কাছে যাবে।"

ইহার মধ্যে একদিন মা হঠাৎ ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের খেয়ালে সীতারামভাইয়ের বাগানে একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন ও গাছটীকে প্রদক্ষিণের মত করিলেন। পরে শোনা গেল এটী একটী বিশেষ স্থান—নিত্য পূজা করা হয় ও পঞ্চবটীস্থান। মা কিন্তু কিছু জান তন না জাগতিক দৃষ্টিতে।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৬১।

আজ মহাষ্টমী। দুর্গাপূজা উপলক্ষে অবধূতজী, বিষ্ণু আশ্রমজী, ভক্তমাল, চক্রপাণিজী প্রভৃতি আসিয়াছেন। সারাদিন হয় ভাষণ, নয় কীর্তন, নয় পূজা-আরতি, চণ্ডীপাঠ চলিতেছে। সপ্তমীর রাত্রে অত্যধিক ভীড় হইবার পরদিনই দেখা গেলো দূরে আর একটী সৎসঙ্গের প্যাণ্ডেল হইয়া গিয়াছে। যেন আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ। যাহা কিছু আবশ্যক সীতরামভাই তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। কিছু লোক আরতি পূজা দেখুক, কিছু সৎসঙ্গ ভাষণ শুনুক। তবে ভীড় অর্দ্ধেক হইয়া গেলে লোকেদের বসার অসুবিধা হইবে না।

মাকে মেয়েরা নিত্য নব নব রূপে সাজাইতেছে। কথনো লাল, কথনো সাদা, কথনো হলুদ রঙের বেনারসীতে সজ্জিত করিয়া মাকে পূজামণ্ডপে আনা হইতেছে। কেউ আবার শাহবাগের মায়ের পূর্ব্বরূপ দেখার মানসে চওড়া লালপাড় কাপড় মাকে পরাইতেছে। এই ক'দিন মা সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া চলিয়াছেন। সন্ধিপূজার সন্ধিক্ষণে সীতারাম ভাইর মা সিঁদুরে রংএর কাপড়ে মাকে সজ্জিত করিয়া মণ্ডপে আনিলেন। ১০৮টী প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। চিন্ময়ী মাকে দেখিবে কী মৃণ্ময়ী মাকে দেখিবে—ভক্তরা ভাবিয়া কুল পায় না।

সপ্তমীপূজার দিন মহাস্নান ও শ্রীযন্ত্রের অভিষেক হইল। চিত্রা, ছবি ও ভবানীর শ্রীকৃষ্ণ ও যুগলমূর্ত্তিদের মহাস্নান হইল। সীতারামভাইয়ের এক আত্মীয় বাগলাজীর দুইটি অত্যাশ্চর্য্য বিগ্রহ দর্শন করিয়া আজ আমাদের চর্ম্মচক্ষু সার্থক হইল। একটা স্ফটিকের শিব উপরে শ্রীযন্ত্র একাধারে শিব ও শক্তির সমাবেশ। অপরটী ত্রিকোণাকার শ্রীযন্ত্র। মা দেখিয়া বলিলেন যে এরূপ আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ইহাদেরও মহাস্নান ও

অভিষেক করা হইল। ইহা ছাড়া রাজা প্রতাপ সিং-এর শ্রীযন্ত্রের অভিষেকও আজ হইল।

মায়ের এদিকে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই। তড়িৎবেগে সব কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

১৮-ই অক্টোবর, ১৯৬১।

আজ মহানবমী। সীতারামভাইয়ের স্ত্রী গায়ত্রী দেবী আজ ষোড়শোপচারে মাকে পূজা করিলেন মা'র কুটিয়াতে। নারায়ণস্বামীজী মা'র পূজার বিধি বলিয়া দিতেছিলেন। বাহ্যিক কোন খেয়াল মা'র ছিল না। পরে সীতারামভাই মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিয়াছিলেন—"ঐ সময় জাগতিক ব্যবহার করার খেয়াল থাকে না। এই যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি হয় এসবটা তো জাগতিক ব্যবহারই—খেয়াল করে করা হয়—ঐ সময় সেই খেয়াল থাকে না—তাই শোনা—দেখা—ব্যবহারের প্রশ্ন নাই—আবার যখন খেয়ালটা ফিরে আসে তখন জাগতিক ব্যবহার হয়ে যায়।"

আজ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি পূজামণ্ডপে। মংতুরামজী প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন কোন সাধুদর্শনে—কানপুর হইতে ১২ মাইল দূরে। পূর্ণাহুতির সময় চলিয়া যায়—কিন্তু তিনি তখনো আসিয়া পৌঁছান নাই। শেষে সীতারামভাইকে মা ডাকিয়া পাঠাইলেন। মার ব্যবস্থায় কোনদিন কোন অঙ্গহানি ত্রুটী হয় না। এ আজ অবধি সর্ব্বদা দেখিয়া আসিতেছি। সীতারামজী তখন অবধি সেদিন জলস্পর্শ করিবার সময় পান নাই। কাজে কাজেই মংতুরামজী না আসায় তিনিই পূর্ণাহুতি দিলেন। আশ্চর্য্য, মা'র

কী ব্যবস্থা। নির্ব্বাণানন্দকে মা পূর্ণাহুতির সময় স্পর্শ করিয়াছিলেন। মাঙ্গতুরামজীর গাড়ী খারাপ হইয়া যাওয়ায় এইরূপ বাধা পড়িল।

আজ নবাহ রামায়ণও সমাপ্ত হইল।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৬১।

আজ বিজয়াদশমী। বেলা ১০টার মধ্যে ঠাকুরের দর্পণ বিসর্জ্জন করার কথা। মা পুষ্পকে বিজয়ার গান করিতে বলিলেন। গানটী হিন্দীতে মংতুরামজীকে বুঝাইতে বুঝাইতে মা ভক্তের ভাব শ্রীমুখে ধারণ করিলেন—মা'র ছলোছল নেত্র। দর্পণ বিসর্জ্জনের পরে সীতারামের মাকে মা বলিলেন—"মো লাল কাপড়া পহেনকে আও।" বড় বউ গায়ত্রী ও ছোট বউকে মা'র প্রসাদী দুটী লাল বেনারসী মা দিলেন। সবাই যখন সিঁদুর ছোঁওয়াইতে ব্যস্ত মা তখন লাল বেনারসী জড়াইয়া ঘোমটা দিয়া মণ্ডপে দেবীর কাছে সকলের মাঝে আসিয়া দাড়াইলেন। মাকে দেখিয়া সবাই আনন্দে আত্মহারা। অবনীদা চণ্ডীর ঘটের কাছে বসিয়া নিত্যকার চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। ভীড়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় মা ও সঙ্গের মেয়েরা তাঁহার উপরে পড়িল। কৃপাল ও উদাস অবনীদার উপরে পড়িবা মাত্র বৃদ্ধ অবনীদাকে দেখি অর্দ্ধশায়িত। তাঁহার চশমা খুলিয়া গিয়াছে। চণ্ডীর ঘট উল্টাইয়া গিয়াছে—পুস্তক দূরে গড়াইতেছে। বেচারী রাগে, দুঃখে, ব্যথায়, অপমানে জর্জ্জরিত। মা সেই মুহূর্ত্তে ঘোমটার আড়াল হইতে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"চণ্ডী, চণ্ডী এসেছে।" অবনীদা এই কথা শুনিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মায়ের এক কথায় বৃদ্ধ শান্ত।

পরে এবিষয়ে মা'র মুখে শুনিলাম—"এইরূপ যে বলা হয়েছিল তার কারণ ছোট ছেলেকে যেমন কাঁদলে ভয় দেখায় বাঘ এসেছে—এ শরীর অবনী বাবার ওরূপ অবস্থা দেখে তাকে ভোলাবার জন্য 'চণ্ডী এসেছে' বলেছিল। তখন তার এমন অবস্থা—স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নেই—এ শরীরেরও স্ত্রী কী পুরুষ খেয়াল নেই। যাক্ বিজয়ার কোলাকুলি হলো বাবার সঙ্গে।"

সত্যই অবনীদার বিশেষ ভাগ্য। আজ রাত্রে সীতারামভাই মাকে সেই আঙ্গুলের ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মা বলিলেন—মা শুনিয়াছিলেন যেদিন মা প্রথম এ বাড়ীতে আসেন সেদিন এক ভৈরবী নাকি আসিয়াছিল। তাহাকে বাড়ীর লোকেরা থাকিতে দিতে রাজী হয় নাই। সে মা'র সঙ্গে দেখা করিতে চায়। তাও স্বামী পরমানন্দ, চিন্ময় প্রভৃতি দেয় নাই। তখন সে অভিসম্পাত করিতে করিতে বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। মা ঘরে বসিয়াই শুনিতেছিলেন তাহার অভিশাপ—"আনন্দময়ী মা—সব জ্বলে যাবে।" আমরাও ঘরে ছিলাম। কিন্তু আমরা কিছুই শুনি নাই। মা'র ঐ কথাগুলির বিশেষ খেয়াল ছিল। এতবড় প্যাণ্ডেল—তাঁবু—আগুনের অভিশাপ!

মা বলিতেছিলেন—"এক হয় যদি দুপক্ষই অভিসম্পাত করে তাহলে কাটাকুটী হইয়া যায়—এখানে তো গৃহস্বামী কিছু বলেনি—তাই খারাপটা অনেক সময় ফলবতী হয়।"

ষষ্ঠীর দিন প্রদীপের আগুনটা মা'র নিজের অঙ্গে লাগিয়া যেন সব বিঘ্ন দূর হইয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিন নারায়ণস্বামীরও পায়ে ধূপতীর ছ্যাঁকা লাগিয়াছিল। মা বলিলেন—"বড় বিঘ্ন ছোট ছোট বিঘ্নের উপর দিয়ে দূর হয়ে গেলো।" সীতারামভাইর ছেলের পায়েও পেরেক ফুটিল—ভাসানের সময়। দুপুরে স্বামী পরমানন্দের ঘরের Ceiling Fanটা খুলিয়া স-শব্দে মাটীতে পড়িয়া যায়। তাহার এক মিনিট আগে গিনি সেখান হইতে সরিয়া যায়।

২১শে অক্টোবর, ১৯৬১।

আজ ভোরেই মা কাশী রওনা হইলেন। কাশীনাথজী গতকাল রাত্রে মা'র নিকট বিদায় চাহিতে গিয়া ছোট্ট শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। উষাকালে বিদায়ের সুরে সানাই বাজিয়া উঠিল—'স্বদেশী হাউস' শূণ্য করিয়া মা রওনা হইলেন।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৬১।

মায়ের শরীরটা বাড়াবাড়ি এলোমেলো। হজমের বেশীরকম গণ্ডগোল। বেশী সময় মা কন্যাপীঠের ছাদের ঘরে শুইয়া থাকেন। আজ কন্যাপীঠের লক্ষ্মীপূজা। সকালে আগা সাহেব ও তাঁর স্ত্রী গোপালের ঘরে বসিয়া গোপালের পূজা করাইলেন নির্ব্বাণানন্দকে দিয়া। পরে মায়ের হাত দিয়া গোপালকে সোনার মুকুট দেওয়া হইল। আগা সাহেবের ছেলে নাকি স্বপ্ন দেখিয়াছিল মা তাহাকে বলিতেছেন—"আমি তোমাকে বড় কিছু দেবো।" ইহার পরই ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে টেলিগ্রাম পিওন দাঁড়ানো—Public Service Comm. পরীক্ষায় selected হইয়াছে এই খবর। ছেলের পাকা চাকরী হইয়াছে কিন্তু খবর এখনো আসে নাই। তবে ইহাদের বিশ্বাস যে বড় চাকুরী অবশ্যই হইবে। তাই গোপালকে মুকুট দিবার পরিকল্পনা পূর্ণিমাতে সার্থক করিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপে লক্ষ্মীপূজা মায়ের উপস্থিতিতে ভালমত হইয়া গেল। পরে মা উপরে কন্যাপীঠের ঠাকুরঘরের সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। চন্দন মা'র পূজা করিল। রাত্রে মা বড় মেয়েদের এক একজন করিয়া ঘরে অল্পক্ষণের জন্য ডাকিয়া কথা বলিলেন।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৬১।

কানপুর দুর্গাপূজার পরেই আমরা এখানে আসিয়াছি। কন্যাপীঠের মেয়েদের বিশেষ আগ্রহ কাশীতেই এবার লক্ষ্মীপূজা হয়। তাহাই হইল। লক্ষ্মীপূজার দিন দ্বিপ্রহরেই আগাসাহেব কাশীস্থিত গোপালকে একটী সোনার মুকুট পরাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে আবার পূজা ভোগাদিও হইল। সন্ধ্যার পরে ভোগারতি হইল এবং বহু লোক প্রসাদ পাইলেন। যাহা হউক, আজ আহারাদির পর মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে গেলেন প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক।

বিন্ধ্যাচল পাহাড়। এই পাহাড়ের ওপরেও বিরাট ব্যবস্থা হইল। কাশী হইতে কমিশনার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ কমিশনার সদলবলে আসিয়াছেন।

বিন্ধ্যাচলে মা।

মা'র ব্যবস্থার ত্রুটি কোন দিকেই নাই। সকলেই আনন্দ করিয়া প্রসাদ নিতেছেন, কীর্ত্তন ভজনে যোগ দিতেছেন। সকলেই আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছেন, এই পাহাড়ের ওপরেও কি করিয়া উপস্থিত মত সব ব্যবস্থাই হইয়া যাইতেছে। পূর্বে-ত কিছুই জানা থাকে না, কখন, কোথা হইতে কত লোক আসিয়া উপস্থিত হইবে, অথচ অসুবিধা বা অভাব বলিয়াও কিছু উপলব্ধি হয় না। সত্যই কতভাবে যে মায়ের কত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করে।

মা এখানে ভালই আছেন। দেখিতে দেখিতে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল।

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ মা বিন্ধ্যাচল হইতে মোটরে এলাহাবাদ হইয়া দেরাদুন রওনা হইলেন। সঙ্গে কবিরাজ মহাশয়ও আছেন। মৌনিমা'র অবস্থাও প্রায়

অচল। তাঁহাকে পূর্বেই মেয়েদের সঙ্গে দেরাদুন পাঠান হইয়াছে, কারণ মা জানেন মায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সেবা ঠিকমত হইবে না। তাই এই অচল অবস্থায়ও করুণাময়ী মা তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়াই ঘুরিতেছেন। পূজাতেও তাঁহাকে কানপুরে নিয়া গিয়াছিলেন।

৫ই নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ মা দেরাদুন পৌঁছিলেন। এখানেও এবার মাত্র ৩।৪ দিনই থাকিবেন। এখানে সব ব্যবস্থাদি করিয়া মা শুকতাল সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে যাইবেন।

৭ই নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ বেলা প্রায় ১১টার ট্রেনে মা রওনা হইলেন। বেলা প্রায় ৫টায় মা ও আমরা মুজফ্ফরনগর পৌঁছিলাম। এখানে পৌঁছিয়া দেখি—মাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য এখানে বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছে। প্লাটফর্মে সাজসজ্জা সহ ব্যাণ্ডপার্টি গাড়ীর অপেক্ষায় ছিল। গাড়ী পৌঁছিলে, মাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াই ব্যাণ্ড বাজিতে আরম্ভ করিল। এই নূতন স্থানে এত সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা একটু আশ্চর্য্যই হইলাম। পরে শুনিলাম শুকতালের শ্রীকল্যাণদেবই এই সব ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দ্বাদশ সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে মায়ের শুকতাল আগমন।

৯ই নভেম্বর, ১৯৬১।

এই দ্বাদশ সংযম সপ্তাহ মহাব্রত। তাহা এই শুকদেবের পবিত্র স্থানেই অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে এই পুণ্যস্থানেই শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবৎ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শ্রীচরণদাস বাবাজীও এই স্থানেই এক বটবৃক্ষের তলায় শ্রীশুকদেবজীর দর্শন পান। সুতরাং এ যে এক পরম পবিত্র স্থান সে বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়!

বর্ত্তমানে শ্রীকল্যাণদেব নামে এক মহাত্মার প্রচেষ্টায় এই জঙ্গলে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীশুকদেবের মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। একটা ধর্মশালাও নির্মিত হইয়াছে। শুনিলাম এই মহাত্মা শ্রীশ্রীমায়ের বহু সৎসঙ্গেই অপরিচিত ভাবে যোগদান করিয়াছেন, সাক্ষাৎভাবে কখনো নিজের পরিচয় দান করেন নাই। এইবার এতদিন পরে মায়ের সহিত তাঁহার বাহ্যিক পরিচয় হইল।

দ্বাদশ সংযম সপ্তাহ মহাব্রত ১৯৬১।

দেখিলাম সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে এই স্বামিজী শুকতালে বিরাট ব্যবস্থাই করিয়াছেন। গতবার নৈমিষারণ্যে এই সংযম সপ্তাহ উপলক্ষেই আমাদের পরমানন্দ স্বামীজী এক বিরাট নগর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—এখানেও দেখিতেছি অবস্থা প্রায় তদনুরূপই। তাঁবু, বিজলীবাতি, টিউব-ওয়েল, কিছুরই অভাব নাই। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বহু মহাত্মা এবং রাজা-রাণীরা আসিতেছেন।

সংযম সপ্তাহ সাতদিনের উৎসব। এ উৎসবে মায়ের সান্নিধ্য আমরা যতটা দীর্ঘ সময় পাই, আর কোন উৎসবেই মাকে ততটা পাই না। তাহা ছাড়া এই যে সমবেতভাবে ত্যাগ, তিতিক্ষা, শারীরিক তপস্যা—ইহার মূল্যই কি কম!

প্রথম দিন শুধু গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিতে হয়। এবার এইদিন মা প্রায় সমস্ত দিনই ব্রতীদের মধ্যেই প্যাণ্ডেলে উপস্থিত রহিলেন। মহারাজ

পরীক্ষিৎ ৭ দিন অনশন ব্রত ধারণ করিয়া শুকদেবের নিকট হইতে ভাগবৎ শুনিয়াছিলেন। সে কোন যুগের কথা। আর আজ, যাহারা কখনো উপবাস করেন নাই তাহারাও শ্রীমায়ের শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া গঙ্গাজল-ব্রতী হইয়া পরমানন্দে সমস্তদিন কাটাইয়া দিলেন। আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী, সাধু, সন্ন্যাসী সকলেই উপবাসী হইয়া এই মহাব্রতে যোগদান করিল। মায়ের সান্নিধ্যে সমবেত ধ্যানের সময় সকলেই অন্তরে বিচিত্র ভাব অনুভব করিল।

১১ই নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ সংযম সপ্তাহের তৃতীয় দিন। আজ একাদশী। ব্রতীদের আজ পয়-ফল খাইয়া থাকিতে হইবে। মা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পয়ফল কিভাবে করিতে হয়, তাহার নির্দ্দেশ দিতেছেন। প্রয়োজন মত নিজ হস্তেও কিছু কিছু করিতেছেন। এইভাবে সমস্ত দিন মা নানান কাজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছেন—বিশ্রামের নামও নাই। অথচ মা'র শরীর মোটেই ভাল না।

১২ই নভেম্বর, ১৯৬১।

মায়ের শরীর বিশেষ ভাল যাইতেছে না—এই কারণে প্যাণ্ডেলে মাকে দীর্ঘ সময় বসিতে হয় বলিয়া, মা'র আসনের পেছনে বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইত। আজ সে উপলক্ষে মা স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে বলিতেছেন

যে, "শুয়ে, বসে সৎসঙ্গে যোগ দেওয়া—এখানে ত এটিকেটের প্রশ্ন নাই।" মা মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ করেন।

মা'র কথার উত্তরে স্বামী অখণ্ডানন্দজী বলিলেন,—"মা সাধারণ মানুষের কাছে এটিকেটের প্রশ্ন। মা'র কাছেত তার কোন কথাই নাই।"

অন্যান্যবারের মত এইবারও মা সাধুদের সব ভাষণ টেপ রেকর্ড করিয়া নিতে বলিয়াছেন। তাহাই করা হইতেছে। বিষ্ণু আশ্রমজীর ভাষণ বড় মনোজ্ঞ। বড় বৈরাগ্য উদ্দীপক। ইনি শ্রীরামের কথা সুন্দর সুন্দর উপমার সাহায্যে সরলভাবে প্রকাশ করেন। আজ বলিতেছেন, "মাইল ষ্টোন যেমন গন্তব্য পথে লক্ষ্যের সূচনা দেয় অথচ নিজে কিন্তু এক জায়গায়ই অচল থাকে, ঠিক সেইরূপ বহু মহাত্মা আছেন যারা শ্রোতা, ভক্ত বা শিষ্যদের পরম লক্ষ্যপথ দেখাইয়া দেন, কিন্তু নিজে যেখানে আছেন সেখানেই থাকেন।"

ইহা ছাড়াও অনেক সুন্দর সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি বলেন। যেমন তিনি বলিতেছেন, জগতে ৫টী বস্তু আছে, যাহা উচ্ছিষ্ট সুতরাং অপবিত্র কিন্তু পবিত্র কাজে তারাই লাগে। যথা—

১। দুগ্ধ। বাছুর প্রথমে গাভীর দুগ্ধ পান করে। সেই উচ্ছিষ্ট দুগ্ধই পূজার কাজে ঠাকুরের সেবায় লাগে।

২। এই উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ দ্বারাই শিবের স্নান হয়, পরম শুদ্ধি, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য ইহার সংযোগেই নির্মিত হয়।

৩। মধুমক্ষিকার বমনই মধু। অথচ সেই মধু দ্বারাই পঞ্চামৃত নির্মিত হয়।

৪। গুটিপোকা মুখের লালা দিয়াই গুটি বাঁধে এবং তাহারই ভেতরে সে দেহত্যাগও করিয়া থাকে—অথচ সেই গুটি দ্বারা নির্মিত বসনই পূজার, পরম পবিত্র পরিধেয়।

৫। কাক বটবৃক্ষের ফল নিজের ঠোঁট দিয়া ঠোকরাইয়া মাটীতে ফেলে, এবং সেই উচ্ছিষ্ট বীজ হইতেই পবিত্র বট বৃক্ষের জন্ম।

এইরূপ অনেক সুন্দর সুন্দর কথাবার্ত্তা ও শিক্ষণীয় বিষয় লইয়াই একের পর এক দিনগুলি কাটিতেছে।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ সংযম সপ্তাহের শেষ দিন। আজ সাত দিন ধরিয়া নিত্য রাত্রিতে মৌনের পর মাতৃ-সঙ্গ হইতেছে। একদিন মাতৃসঙ্গের সময় মা বলিতেছেন "শুকদেবের স্থানে বসিয়াও কিছু অনুভব হইতেছে না বলিতেছে—কিন্তু তিনি কৃপা করিয়া এইস্থানে না আনিলে কি তোমাদের এইখানে আসা হইত? তিনি সব সময় আছেন, সকলের মধ্যে আছেন—যতক্ষণ আমি আমার, ততক্ষণ সে বোধ নাই।

মা আরও বলিলেন,—"১২টী সংযমের মধ্যে দ্বাদশতম সংযম ব্রতটী এইখানে হইল। তোমরা এইবার ফিরিয়া গিয়া নিত্য এই তীর্থ স্মরণ করিবে।"

অন্যান্য বারের মত মা এইবারও বলিলেন—"তোমাদের ইচ্ছা হইলে তোমরা মাসে কিংবা সপ্তাহে ১ দিন সংযমিত জীবন যাপন করতে পার—সংযমিত আহার, বাক্য সংযম ও সত্য-নিষ্ঠার দিকটা বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।"

আজ অন্তিম দিন। আজ মা মহানিশা-ধ্যানে ব্রতীদের উৎসাহিত করিবার জন্য, স্বয়ং মহানিশা-ধ্যানে যোগ দিলেন।

আজ সংযম সপ্তাহ শেষ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গেই, আজ হইতেই আর একটী সপ্তাহ—ভাগবৎ সপ্তাহ মা আরম্ভ করাইলেন।

সংযম সপ্তাহে যোগ দিবার জন্য শান্তা পাঠকও আসিয়াছে। এই স্থানের

পারিপার্শ্বিকতা দেখিয়া শান্তার মনে এই ইচ্ছার উদয় হইল যে এই স্থানেই একটি ভাগবৎ সপ্তাহ হইলে ভাল হইত। ইতিপূর্বে নৈমিষারণ্যেও নাকি, এই স্থানে ভাগবৎ সপ্তাহ করাইবার একটা ইচ্ছা শান্তার মনে উদয় হইয়াছিল। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে বেশীর ভাগ ভাগবৎ সপ্তাহ মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থে তাহার প্রিয় পরিজনেরা করাইয়া থাকে। কিন্তু এইবার প্রথম নিষ্কাম ভাবে ভাগবৎ সপ্তাহের সূচনা আরম্ভ হইল। আজ ৬ মাস যাবৎ শান্তা এইভাবে এই স্থানে ভাগবৎ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। নিজের হাতেই সে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি সব সিলাই করিয়া আনিয়াছে। উহার ভাগবৎ প্রীতি যে কত অধিক, তাহা উহার নিত্য ভাগবৎ পাঠ দেখিয়াই বুঝা যায়। ইতিপূর্বে সে নিজেও কয়েকবার ভাগবৎ পাঠ করিয়াছে। এই উপলক্ষে শান্তার মা, বোনেরা সকলে আসিয়াছে। শান্তার বাবা শ্রীগোপাল স্বরূপ পাঠক মহাশয়কেও মা তার করাইয়া আনাইয়াছেন। সকলে উপস্থিত হইলে নিষ্কাম ভাবের ভাগবৎ সপ্তাহ সংযমের অন্তিম দিবসেই শুকতীর্থেই আরম্ভ হইল। ব্যাখ্যা করিবেন প্রখ্যাত মহাত্মা শ্রীবিষ্ণু আশ্রমজী আর মূল পাঠ করিবেন বাটুদা। শ্রীশুকদেব মন্দিরে যাইবার পথের পার্শ্বেই নব-নির্মিত গীতা ভবনে এই পাঠ আরম্ভ করা হইল।

গোপাল স্বরূপ পাঠকের মেয়ে শান্তার নিষ্কাম ভাগবৎ সপ্তাহ।

সংযম সপ্তাহের সেই অতিরিক্ত কর্ম-ব্যস্ত দিনগুলির পর মা এবার একটু বিশ্রাম পাইবেন। মাকে তাঁহার আপন ভাবে একটু বেশী সময় থাকিতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

আজ ভাগবৎ সপ্তাহের প্রথম দিন। আজ শান্তা মাকে হলুদ রংএর রেশমী বস্ত্র পরাইয়া, কোমরে সবুজ রংএর দোপাট্টা ও গলায় লাল ওড়না দিয়া সাজাইয়া মা'র ঘরের মধ্যেই বসাইয়া আরতি করিল। পরে মা'র চিবুকে শান্তা কাজলের একটী ফোঁটা দিতেই মা খুব হাসিতে লাগিলেন।

শান্তা বলিল, "শ্রীকৃষ্ণকেও নজর লাগিবার ভয়ে তাঁহাকে এইরূপ ফোঁটা দেওয়া হইত।"

মা ঐ বেশেই যে ঘরে মূল ভাগবৎ পাঠ হইতেছিল, সে ঘরে আসিলেন। আসিয়াই মা বলিলেন, "মঞ্চের বাঁশ কোথায়? ঘটে সিন্দুর দিয়ে স্বস্তিক আঁকা নেই কেন?" আমরা ত অবাক। আমরা ত কতবার এই ঘর দিয়া যাতায়াত করিলাম, কিন্তু কৈ এই ত্রুটীগুলি তো একবারও আমাদের চোখে পড়ে নাই। সত্যই মায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট বুঝি কিছুই ঢাকা পড়ে না। মা যে সর্ব দিকে পূর্ণ।

শ্রীশ্রীমায়ের সর্বতোদৃষ্টি।

মা ঐ ভুলগুলির উল্লেখ করিয়া বাটুদাকে বলিলেন,—"আচার্যদেবের এ সব ভুল কেন হইল?"

বাটুদা বলিলেন,—"মা তুমি-ই ত আচার্য।"

দত্তাত্রেয় আরতি করিতে গিয়া অনবরতই ভুল করিতেছিল। মা তাহা দেখিয়া চামর ব্যজন কী ভাবে করিতে হয় তাহা নিজেই করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এই ভাবে মা প্রতিনিয়ত আমাদের কত দোষ ত্রুটী যে সংশোধন করিতেছেন, কত যে শিখাইতেছেন তাহার কি ইয়ত্তা আছে!

যাহা হউক, ভাগবৎ সপ্তাহ সুন্দর ভাবেই চলিতেছে। রাসপূর্ণিমা প্রায় আসিয়া গিয়াছে। ঐ পূর্ণিমার পূর্বে এখানে বিরাট একটা মেলা বসে। সেই কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলায় যোগ দিতে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী শুকতালে আসিয়া একত্রিত হইতেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় শুনিলাম ভীড় এবার অনেক বেশী। ইহার কারণ শুনিলাম গ্রামবাসীরা শুনিয়াছে এখানে কে এক আনন্দময়ী মা আসিয়াছে,

শ্রীশ্রীমায়ের অকল্পনীয় আকর্ষণ। এ আকর্ষণে ধনী নির্ধন শিক্ষিত অশিক্ষিতের বিভেদ নাই।

আর তিনি ভাগবৎ সপ্তাহ করাইতেছেন। তাঁহার দর্শনার্থী হইয়াই এবার চতুর্দ্দিকের যত লোক এখানে একত্রিত হইয়াছে।

মায়ের ঘরটী ঠিক শুকতাল আশ্রমের গেটের ওপরে—সামনেই প্রকাণ্ড ছাদ। মায়ের ঘরের সামনে খোলা জায়গাটায় বারে বারে লক্ষাধিক লোক একত্রিত হইতেছে, আবার তাহারা চলিয়া গেলে অন্য দল আসিতেছে। এই ভাবেই পুনঃ পুনঃ লোক সমাগম হইতেছে। আর মা তাদের সেই আকুল চাহনীর সামনে ছোট দুইখানি হাত জোড় করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন, আবার কখনো বা ছাতে পায়চারি করিতে করিতে বলিতেছেন,—"জনজনার্দ্দন রূপে দর্শন দিতে এসেছে।" আবার কখনো বা মা তাঁহার দুই হাতে নকুলদানা, বাতাসা ভরিয়া ভরিয়া ছুঁড়িতেছেন, কখনো বা কলা, মিষ্টি কিংবা বিষ্ণুর সহস্রনামের পুস্তিকা এদিক ওদিক বিতরণ করিয়া দিতেছেন। আর এই সব দেখিয়া লোকেদের কী আনন্দ। মাঝে মাঝে সেই আনন্দের রোলে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। বিপুল জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—"জঙ্গলমে মঙ্গল করনেওয়ালী কী জয়! জগৎমাতাকী জয়!" সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

২০শে নভেম্বর, ১৯৬১।

ভাগবৎ সপ্তাহ চলিতেছে। আজ ১টী বড় বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। দুপুর বেলা নারায়ণ স্বামিজী যেমন নিত্য ভাগবৎ ব্যাখ্যা শোনেন তেমনি শুনিতেছেন। ইতিমধ্যে বিষ্ণু আশ্রমজীর একজন পরিচিত পণ্ডিতকে মা'র সঙ্গে দেখা করাইবার জন্য বিষ্ণু আশ্রমজী নারায়ণ স্বামিজীকে বলিলেন। মা তখন তাঁহার উপরের ঘরে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং নারায়ণ স্বামিজী পড়িলেন উভয় সংকটে। যদি তিনি লোকটীকে নিয়া মা'র

আকাঙ্খা আন্তরিক হইলে ভগবান তাহা পূর্ণ করেনই। একটী বিচিত্র ঘটনা।

কাছে যান, তবে তাঁহার পাঠ শ্রবণে বাধা পড়ে, আর যদি না যান তবে লৌকিকতায় বাধা পড়ে। শেষ পর্যন্ত নারায়ণ স্বামিজী ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে লৌকিকতার খাতিরেও তাঁহার বিষ্ণু আশ্রমজীর অনুরোধ রক্ষা করা দরকার, কাজেই তিনি কিছুটা দুঃখিত চিত্তেই লোকটাকে নিয়া চলিয়া গেলেন। উপরে গিয়া দেখেন মা বিশ্রাম করিতেছেন, দরজা বন্ধ। স্বামিজীর মন খুব চঞ্চল হইয়া উঠিল, কী করেন—পাঠ চলিতেছে অথচ তিনি যাইতে পারিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকটাকে মা'র দর্শন করাইতে পারেন। এই সব কথাই স্বামিজী একটু দুঃখিত চিত্তেই ভাবিতেছেন। ইতিমধ্যেই হঠাৎ মা নিজেই দরজা খুলিয়া ছাতে বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন,—"শোওয়ার ভাব থেকে হঠাৎ উঠে আসার খেয়াল হ'ল।" যাহা হউক লোকটার মা'র দর্শন হইয়া গেল, স্বামিজী লোকটাকে নিয়া পাঠে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন হলে পাঠ না হইয়া কীর্ত্তন হইতেছে। কী ব্যাপার! স্বামিজী শুনিলেন যে স্বামিজী এখান হইতে উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাইকটা খারাপ হইয়া যায়। এবং ঐ কারণে বিষ্ণু আশ্রমজী ব্যাখ্যা বন্ধ করিয়া বলেন,—"কীর্ত্তন কর। মাইক ছাড়া ব্যাখ্যা শোনা যাইবে না।" তাহাই হইল। যাহা হউক স্বামিজী আসিয়া আসনে বসিতেই মাইক শব্দ করিয়া উঠিল, এবং বিষ্ণু আশ্রমজী পুনরায় পাঠ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। কাজেই তাঁর পাঠ শ্রবণে বাধা পড়িল না। সত্যই আন্তরিক শুদ্ধ কামনা ভগবান পূর্ণ করেন!

আজ বৈকালে মা ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ বলিলেন,—"যখন এ শরীরটা দুপুর বেলা শুয়েছিল তখন দেখা গেল কৃপাল এ শরীরটাকে খুব জোরে জোরে মারছে। আর এ শরীর ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে—"শান্ত হও, শান্ত হও।" পরে কৃপালকে মা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক্যা, এ শরীর কা উপর নারাজ হো?"

কপাল তো মরিতে পারিলে বাঁচে। লজ্জানত মুখে অস্ফুট স্বরে বলিল "নেহী মা।"

২২শে নভেম্বর, ১৯৬১।

ভাগবৎ পাঠের আজ শেষ দিন। শান্তার শারীরিক বাধা পড়ায় তার মা-ই পাঠকদের সব ভেট চড়াইলেন। ইহাতে মা বলিলেন,—"সবেতেই মঙ্গল থাকে। এই বাধা পড়ায় মনটা ওর আরো আকুলি বিকুলি করছে—ভগবানের কাছেই পড়ে আছে। ওর মা'র হাত থেকে ভগবান এইটুকু নেবেন, সৎ ইচ্ছা, শুভেচ্ছা—ভাগবৎ করবার কথা শান্তার মনেই প্রথম এসেছিল—পূর্ণফল তারই প্রাপ্য, ওর মা যেটুকু করেছিল, সে ফল ওর মা পাবেই। শান্তার এই বাধাটুকুর মধ্যেও মঙ্গল নিহিত আছে।"

সবেতেই মঙ্গল থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই বাধাটুকু কি ওর নিয়তিতেই ছিল?

মা বলিলেন,—"বাধা ত যখন তখন সৃষ্ট হইতে পারে। ভগবান মনের ভাব দেখে গ্রহণ করেন। এই যে বাধার সৃষ্টি হ'ল—সবটা শান্তা নিজের হাতে পূর্ণাঙ্গীন ভাবে সমাপ্ত করতে পারলো না—এতে ভালোই হ'ল। ওর মনে অহংকার ভাব আসতে পারল না যে সবটা আমি করেছি। ওর পিতামাতার তো ভাগবৎ সপ্তাহ করাবার সদ্‌ইচ্ছা মনে জাগেনি—জেগেছিল ওর মনে—কাজেই যদিও সমাপ্তির ক্রিয়া ওর মা করলো, শান্তার পূর্ণ ফল শান্তাই পাবে। ওর মা যা করেছেন তার ফল ভগবান তাকে দেবেন।"

যাক্ ভাগবৎ সপ্তাহ শেষ হইল। মা আশ্রমের তরফ হইতে আমাকে দিয়া সোনার সিংহাসনে ভাগবৎ বসাইয়া বিষ্ণু আশ্রমজীকে দেওয়াইলেন। সকালের দিকে মা মূল পাঠের কিছু পূর্বে উপরে গিয়া ভাগবৎ গ্রন্থখানিকে ছুঁইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন, পরে সমাপ্তির সময়েও আবার কিছুক্ষণের জন্য গিয়া বসিয়াছিলেন। সমাপ্তির সময়ে মা আশ্রমের তরফ হইতে বহু টাকা ও বস্ত্রাদি অনেককে দান করাইলেন। শান্তার মাও টাকা, গরম চাদর ইত্যাদি দান করিলেন। শুনিলাম এই সবই মন্দিরে থাকিবে—বিষ্ণু আশ্রমজী কিছুই নিবেন না। কল্যাণ দেবেরই এই ব্যবস্থা।

পরে শান্তার এই নিষ্কাম ভাবে ভাগবৎ সপ্তাহ করানো প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন,—"সব মেয়েরা মিলে একবার যোগাযোগ হলে ভাগবৎ সপ্তাহ করান। কেউ পাঠ করবে, কেউ ব্যাখ্যা। নিজেরা নিজেরা সব করবে।"

২৩শে নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ এখানকার আনন্দহাট ভাঙ্গিবার পালা। মা সকলকে লইয়া গঙ্গার ধারে গেলেন। অনেকে স্নান করিল—মা সকলকে গঙ্গাজলের ছিটা দিলেন। এত বড় ২টা উৎসবের শেষে আজই অনেকে বিদায় নিয়া চলিয়া গেল।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬১।

মা শুকতালেই আছেন। আজ স্থির হইল মা এখানে এ মাসের শেষ পর্যন্তই থাকিবেন। ভীড় ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, মা'রও একটু বিশ্রামের

সুযোগ হইতেছে। আজ বিষ্ণু আশ্রমজী মাকে বুলন্দশহর যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সেখানে বিষ্ণু আশ্রমজীর সান্নিধ্যে সহস্রচণ্ডী মহাযজ্ঞ হইবে, মাকে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইলেন।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৬১।

মা আজকাল প্রত্যহই সকালে ছাতের উপর বেশ কিছুক্ষণ সময় রৌদ্রে পায়চারি করেন। আজ সন্ধ্যাবেলা মা বড় বড় মেয়েদের ডাকাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিলেন। সম্প্রতি বড় বড় মেয়েদের মধ্যে সামান্য বিষয় লইয়া কেমন যেন একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতেছে। মা ত সর্বদাই সকলের মধ্যে প্রীতিভাব রাখিতে বলেন। একে অপরের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতে বলেন। মা'র কাছে তো কোন ভেদ ভাব নাই। মা'র কাছে কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, গুজরাতি, হিন্দুস্থানী সব দেশের ছেলে-মেয়েরাই সমান ভাবে আছে। তাহাদের মধ্যে সর্বদাই মিলমিশ রাখিতে বলেন। এই প্রসঙ্গেই মা আজ বলিলেন, "তোমরা সবাই ভালো, বিদ্বান, বুদ্ধিমতী। তোমরা সবাই একই পথের পথিক, সবাই মিলেমিশে থাক। মনে রাগ-দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ভাব রাখিবে কেন? যদি নিজেদের মধ্যে কখনো কোন বিষয় নিয়া মনোমালিন্য ঘটে, তবে তখনি তাহা একে অন্যকে বলিয়া পরিষ্কার করিয়া নিবে। বলবে,—'ভাই, তোমার এই ব্যবহার আমার পছন্দ নয়'। কেউ দুঃখী হলে অন্যজন তাতে আনন্দ না পাওয়া। মা যখন যা করছেন আমার পছন্দ না হলেও আমি হাসি মুখেই তাহা মানিয়া নিব—এই ভাব রাখা। পরের জন্য ত্যাগ করা—

সাধু, ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীদের প্রতি মায়ের করুণাপূর্ণ উপদেশ।

এতে মনের প্রসারতা বাড়ে। তুমি যেটুকু ত্যাগ করলে, ভগবান তা পূর্ণ করে দেন—আর যদি বা নাও দেন মনে করা—'এইটুকু সেবা ত আমার দ্বারা হ'ল।'

"বাজিতপুরে একবার এই শরীরকে কারা যাত্রা দেখাতে নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে বসার জায়গা পাওয়া গেল না। একজন চেয়ারে বসেছিলেন, এ শরীরের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি উঠে আমাকে তার জায়গায় বসতে দিলেন। আমি তার কথায় একটু বসে তার কথা রক্ষা করে ফের উঠে তাকে বসতে দিলাম। একটু পরে একটি চেয়ার খালি হওয়ায়, সেখানে বসলাম। নিজের অসুবিধা হলেও পরের জন্য এরূপ ত্যাগ স্বীকার করা নীতি। আগেকার দিনে গৃহস্থাশ্রমেও কী সুন্দর নীতি ছিল। বড় জা ছোট জা'র মধ্যে কী মিল ছিল। কেউ দোষ করলে বলা হ'ত না, আমি করিনি অমুকে করেছে। বড়কে দেখলে সর্বদা উঠে দাঁড়ানো হতো। কারুর গায়ে পা লাগলে তো প্রণাম করা হতই, এমন কি হাতের ধাক্কা লাগলেও বা গা লাগলেও নমস্কার করা হ'ত। আজকাল এসব দিক দেখাই যায় না।"

বাজিতপুরের একটি ঘটনা—একটী আদর্শ নীতি।

"তোমাদের এসব বিপরীত রীতি নীতি দেখে দিদি ও আমি বলাবলি করি,—এ সবই "বচ্‌পনের" খেলা। তোমাদের সকলের বুদ্ধি তো বুড়া লোকের মত পাকেনি—তাই এ সবই বচ্‌পনের রাগারাগি, অভিমান, কথা কাটাকাটি।"

"সাধনার পথে মনে কোন গ্লানি জমাতে নেই। যত মন পরিষ্কার রাখবে, তত সে পথে অগ্রসর হবার সহায়তা, মনে রাগ এলে সেটা দূর করবার চেষ্টা করবে।"

এই ভাবে মা কত কথাই বলিলেন, কত উপদেশই দিলেন। সত্যই

আমরা ভাগ্যবান নহিলে মা স্বয়ং কৃপা করিয়া প্রতিনিয়ত এইভাবে আমাদের দোষ ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিতেছেন।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ সন্ধ্যাবেলা মা দিদিমার ঘরে পায়চারি করিতে করিতে খুব সুন্দর কতগুলি কথা আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীদের বলিলেন। দিদিমার ঘরে মা'র একটি চূড়াবাঁধা বসা অবস্থায় ছবি ছিল। সেই ছবিটি দেখিয়া মা বলিলেন,—"শরীর কি রকম লম্বা লম্বা দেখাচ্ছে না? গ্রন্থি আলগা হয়ে দেহ লম্বা হতে পারে। আবার যোগীরা বিরাট শরীর ধারণ করে। সবই সম্ভব।"

এই কথা শুনিয়া কমলদা বলিলেন,—"গ্রন্থি আলগা হয়ে, বিরাট হয়ে মা'র শরীর লম্বা দেখিয়েছে, মা'র মুখে শুনেছি। আজ এটা একটা নতুন কথা শোনা হ'ল।"

সাধু ব্রহ্মচারীদের প্রতি আরো উপদেশ।

এই সব কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন "তোমরা সমবেতভাবে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর। যেমন খাওয়া হয় একসঙ্গে, সৎসঙ্গে, কীর্তনে বসা হয় একসঙ্গে, তেমনি একত্রিত হয়ে আধ্যাত্মিক কর্মও করা যায়। ছেলেরা বেশ এক জায়গায় মিলেমিশে একত্রিত হলে, আবার মেয়েরাও অপর কোথাও মিলেমিশে একত্রিত হলে। তা না করে কেবলি 'ফুট' 'ফুট' করে নিজেরা প্রাইভেট করা! অবশ্য এটা ঠিক যে প্রত্যেকের নিজস্ব কতগুলি ক্রিয়া থাকে যা অন্য কারো সামনে করা যায় না। কিন্তু আবার ধুপ জ্বাললে যেমন তার গন্ধ সবাই মিলে অনুভব করে, তেমনি একত্রিতভাবে আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে বসলে সেখানকার আবহাওয়া অন্যরকম হয়ে

যায়। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। এ শরীর তো 'কিছু একটা গড়ব' এরূপ বন্ধনের মধ্যে কোনদিন নাই, থাকবেও না। এক একটা স্থিতি আসে যখন এরূপ গড়বার ভাব আসে। কিন্তু এ শরীরের তা আসে না, কারণ সেও তো বন্ধন হবে। তবে যোগীভাই যেরূপ সংযমের সূচনা করে এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করতে আসে—সেরূপ ক্ষেত্রে এ শরীর বলে, এ রকম কর, ও রকম কর ইত্যাদি; তোমরাও যদি সেরূপ কিছু করার উৎসাহ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কর তখন এ শরীর স্থুস্থ থাকলে, এ শরীর তোমাদের কাছে বলতে পারে—এরূপ ভাবে করো।"

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবের আর একটা দিক।

মা'র এই সব কথা শুনিয়া সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে একটা উৎসাহের ভাব দেখা গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার মা বাজীতপুরের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। জানকী বাবুর স্ত্রী মাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনাকে আর দিদি ডাকতে ইচ্ছা করে না। মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে। একদিন আপনি জগতের মা হবেন, সবাই আপনাকে মা বলে ডাকবে।" মা আবার বলিলেন, "জানকী বাবুর ভয় হ'ত তার স্ত্রী বুঝি এ শরীরের কাছে এসে এসে এরকমই হয়ে যাবে, তাই মানা করায় উনি ২।৩ দিন না আসাতে এ শরীর একদিন খোঁজ করতে গেছে—কেমন আছে ওরা সকলে।"

বাজীতপুরের একটী ঘটনা।

জানকী বাবুর স্ত্রী কেন আর যান না, তার কারণ বলায় মা হাসিয়া উঠিলেন তখন মা মৌন ছিলেন। কাজেই হাসিয়া মা চোখের ইশারায় বলিলেন,—"তুমি যেও—ওসব ভেবো না।"

মা আবার বলিতে লাগিলেন—পাড়ার অনেকে বলিত,—"ঐ বুঝি ধরলো ধরতে এলো। অনেকে ভয় পেতো।"

মা'র কাছে আজ এক গুজরাটী সাধু আসিয়াছেন। তিনি পদ্মাসনে

১৪ ঘণ্টা বসেন। এক মন্দিরে থাকেন। রাত্রিতে মাত্র চারি ঘণ্টা নিদ্রা যান—জল পান করেন না—২৪ ঘণ্টায় ১ বার মাত্র তরকারী ও দুধ খান। ইহাকে বীর মায়ের কাছে লইয়া আসিয়াছে। বেশ বিশাল সবল দেহ। বীরের অনুরোধে তিনি মাকে পদ্মাসন করে দেখালেন। মা বলিলেন,—'আসন করা আর আসন হওয়া দুই জিনিষ। যখন ঠিক ঠিক আসন হয়ে যাবে তখন ঘড়ার ওপর ঘড়া বসালে যেমন নীচের ঘড়া ঠিক বসলে উপরের গুলিও বসে যায়—ঠিক সেরূপ মেরুদণ্ডের জয়েণ্টে স্ক্রু (Joint-এ Screw) লাগবার মত নড়া চড়া না হয়ে বসে যায়। তখন আর ওপরে নড়ার প্রশ্ন আসে না।"

আসন করা আর আসন হওয়া—দুই জিনিষ।

বীর মাকে বলিয়াছিল যে ইহার দেহের ওপরের অংশ আসন হইলেও নড়ে। এই প্রসঙ্গেই মা ওই কথাগুলি বলিলেন।

পরে আবার মা ঠিক এই জাতীয় কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এ শরীরে সাধনার খেলার সময় কখনো গেলাস করে, ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়েছে কিনা সন্দেহ। বছরের পর বছর এখানে জল না খেয়ে চলেছে। তোমাদের কাছে ব্যবহার ঠিক রাখবার জন্যেই আজকাল এরূপ করা হয়। না স্নান,—না খাওয়া,—না জলপান করা।"

২৭শে নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ সকালে শান্তা ভাগবতের অন্তিম ক্রিয়াদি করিয়া মা'র পূজা করিল। পৃথক এক ঘরে সে মাকে কৃষ্ণরূপে পূজা করিয়াছে। যখন ঘরের দরজা খোলা হইল, দেখিলাম শান্তা মাকে শ্রীবৃন্দাবনের বিহারীজীর অনুকরণে মাথার মুকুট পরাইয়াছে—চুল দুই পাশে খোলা—গলায় মুক্তা ও তুলসীর গুঞ্জার মালা। হলুদ রঙের 'টিস্যু' শাড়ী পরান হইয়াছে, গলায়

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীকৃষ্ণরূপ।

বেনারসী লাল ওড়না। আর কোমরবন্ধের রং সবুজ। কোমরে সোনার গোট, বাহুতে সোনার বাহুবন্ধ। হাতে সোনার কঙ্কন। পায়ে চন্দনের খড়ম। মাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মা বেশ সুন্দর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন।

কিছুক্ষণ পরে শান্তা মাকে আরতি করিল। আরতির সময় মা শ্রীকৃষ্ণের ছবিযুক্ত একখানা গীতা তাঁহার বুকের কাছে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আরতি হইয়া গেলে শান্তা একখানি সোনার সিংহাসনে ভাগবৎ বসাইয়া মাকে অর্পণ করিল।

পরে সন্ধ্যার সময় মা এইসব ক্রিয়ার কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "এ সব যোগাযোগ থাকে পূর্ব পূর্ব জন্মের।" পরে আবার বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে একজন কী সুন্দর করলো, এই স্থানের সঙ্গে, এ সময়ের সঙ্গে, এ সবটাই ছিল শান্তার এই বয়সের সঙ্গে। তোমাদেরও যারা এই ভাগবতে যোগদান করলে তোমাদেরও যোগাযোগ ছিল।"

"দেখ, নিষ্কামভাবে কোন বিশেষ কাজ করলে ভগবান তাকে সাহায্য করেন।" গতকাল মা'র খাট পূর্ব পশ্চিমে পাতা ছিল, উদাস বার বার মাকে বলে খাটটাকে উত্তর-দক্ষিণে পাতিল। আজ শান্তা সেই জন্যেই উত্তরমুখী হইয়া পূজা করিতে পারিল। শান্তা কিন্তু এ বিষয়ে উদাসকে কিছু বলে নাই। বা উদাসও কিছু ভেবে করে নাই। ও সব ভগবানেরই যোগাযোগ। উত্তর মুখে নিষ্কাম পূজা করিবার বিধি আছে।

নিষ্কাম ভাবের কাজে ভগবান সহায়ক হ'ন।

আজ রাত্রিতেও মা কুমারী মেয়েদের সহিত অনেকক্ষণ কথা বলিলেন। শান্তার ভাগবৎ সপ্তাহ তাহার পিতামাতা-প্রদত্ত যে টাকা ছিল, যে গহনা ছিল, তাহা দিয়াই সে এই সপ্তাহ করাইয়াছে। একটী বড় মেয়ে এই কথা প্রসঙ্গেই মাকে দ্বিপ্রহরে বলিয়াছিল যে তাহার বিবাহ-দিনে

তাহার বাবা-মা যে টাকা খরচ করিতেন, সেই টাকা চাহিয়া আনিয়াই সে-ও এমনি শুভ অনুষ্ঠান করাইবে।

ইহা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, যেখানে তোমরা এসেছ—সেখানকার টাকা আর পিতা-মাতা ভাই আত্মীয়স্বজনের টাকা এই সবই ভগবানের টাকা। এই উভয়ে কোন প্রভেদ কখনো ভাবিবে না। যদি কাহারো সদনুষ্ঠান করাইবার ইচ্ছা হয়, এখান থেকেও করানো যেতে পারে। সাধ্যানুযায়ী যতখানি সম্ভব করানো হবে।"

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহা পাইতেছে, তাহা সবই ভগবানের দান।

ইহাতে অন্য একটী কুমারী কন্যা বলিয়াছিল,—"এতে ত গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা হবে।"

মা বলিলেন,—"তোমরা সব ছেড়ে এ পথে এসেছ। তোমাদের পিতামাতা স্বেচ্ছায় কাউকে তার প্রাপ্য যদি দেন সেটা অন্য কথা। তাদের কোন সেবায় লাগো না, তবে আবার তাদের কাছে টাকা চাইতে যাবে কেন? আর সব টাকাইত ভগবানের টাকা—সব খানেই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা হয়।"

"পরমপতি একমাত্র ভগবান। যেমন 'সোহাগণের' লক্ষণ আছে কতগুলি তেমনি তোমাদেরও যে গতি ভগবান। তোমাদেরও 'সোহাগণের' লক্ষণ আছে। সেগুলো হলো চন্দনের, ভস্মের ফোঁটা, সাদা ধুতি-গেরুয়া বস্ত্র। তোমাদের এ সাজ কখনো বদলাবে না। তোমাদের ভগবানের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর জন্যে তোমরা সব ছেড়ে এসেছ। আর যদি তাঁকে ছাড়া তোমাদের হাসি গল্প, বাজে কথা, রাগ, অভিমান, চোখের জল ফেলা প্রভৃতিতে আনন্দ পাওয়া হয়, তাহলে বলব সে সব—"উপ—"। ভগবান ছাড়া যা কিছু নিয়ে আনন্দ, তা "উপ"।

ভগবানের সোহাগিণীর লক্ষণ।

"শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা পরমপতি রূপে কামনা করে কাত্যায়নী ব্রত করে। স্বামী মানে স্বয়ং + আমি। এই কাত্যায়নী ব্রতের পরেই শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-হরণ-লীলার সূচনা। বস্ত্রহরণ মানে নিরাবরণ প্রকাশ। তুমি যে মুক্ত—স্বয়ং + আমি—নিরাবরণ—তারই প্রকাশ।"

"স্বামী" ও বস্ত্রহরণ লীলার প্রকৃত অর্থ।

আজ দ্বিপ্রহরে মা আবার একটী বিষয় লইয়া বলিতেছিলেন। মা বলিতেছিলেন,—"যদি কেউ বাস্তবিক মনে প্রাণে ইচ্ছা করে যে বহু সময় ত জগতের আদান-প্রদান-ব্যবহারে, কথাবার্তায় কেটেছে, এখন ওসব ছেড়ে ভগবানের জন্য, ভগবানকে নিয়ে বসব, তবে ভগবানই তার ব্যবস্থা করে দেন। এ শরীর এমন একজন সাধিকার কথা শুনেছে যে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘরে বসে থাকতো জপ-ধ্যান নিয়ে। এতে কিন্তু শরীর অসুস্থ হত না। শরীর অসুস্থ তখনই হয় যখন মন চাইছে বাইরের আনন্দ, আর তুমি জোর করে তাতে বাঁধা দিচ্ছ। সূর্যের আলোয় দিনের পর দিন না বেরিয়েও শরীর সুস্থ থাকে যদি বাস্তবিক জগৎকে প্রত্যাহার করে ভগবানকে নিয়ে বসে যাবার তীব্র ইচ্ছা জাগে।"

২৯শে নভেম্বর, ১৯৬১।

মা শুকতালেই আছেন। মাকে বহু গ্রামের লোকেরা দর্শন করিতে আসে। মাও তাহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে একটু একটু কথাবার্তা বলেন, ফল-মিষ্টি দেন। আর মা যদি কাহারও সঙ্গে একটু বেশী কথাবার্তা বলেন তবে ত আর উপায়ই নাই, সে যেন একেবারে কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়। মা'র শরীর খুব সুস্থ না, তাই ভীড় কমাইবার যতই চেষ্টা করা হউক না কেন,

সবই বৃথা হইয়া যায়। কেহই মাকে ছাড়িয়া যাইতেই চাহে না। তাহাদের ব্যবহারে মনে হয় মা যেন তাহাদের একান্তই ঘরের লোক। মা ছাতের ওপরে, দর্শনার্থীদের নীচে দাঁড়াইয়া দর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই নীচু হইতে দেখিয়াই কেহ কেহ তৃপ্ত হইয়া মায়ের জয়ধ্বনি দিতেছেন, হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আবার অনেকে ইহাতে তৃপ্ত না হইয়া একপ্রকার জোর করিয়াই নিষেধ অমান্য করিয়া ছাতে উঠিয়া আসিতেছে। মা-ও হাসিয়া হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। কাজেই তাহাদের সরান দুঃসাধ্য ব্যাপার। দিনের পর দিন এই ভাবেই কাটিতেছে।

আগামী কাল সকালেই মা'র বুলন্দশহর রওনা হইবার কথা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে সঙ্গীরা প্রায় অনেকেই বাসে কিছু পূর্বেই রওনা হইয়া যাইবেন। পরে মা মোটরে প্রায় ৮টায় রওনা হইবেন। মা'র সঙ্গে শুধু থাকিব আমি, দিদিমা, বুনি ও পানু।

কর্মযোগী কল্যাণদেবের কথা।

এখানে একজন ত্যাগী মহাপুরুষ কর্মযোগী আছেন। তাঁহার নাম কল্যাণদেব। তাঁহার কথা পূর্বেই লেখা হইয়াছে। তাহার কর্মক্ষমতা অদ্ভুত। তাঁহার সাহায্যের জন্যই পরমানন্দ স্বামীজী এত অল্প সময়ে এখানে এরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। কল্যাণদেব শীত-গ্রীষ্ম একভাবেই একটী চাদর গায়ে দিয়া কাটান। আহার কাঁচা মূলা, গাজর ইত্যাদি—রান্নার কোন বালাই-ই নাই। থাকিবার ত কোন কুটিয়া নাই। বলিলে বলেন,—'এই শরীর-ই ত কুটিয়া।'

তিনি আজ সন্ধ্যায় মা'র কাছে আসিয়া বসিয়াছেন। নানান কথাবার্তা হইতেছে। কাল সকালে মা চলিয়া যাইবেন। মা তাঁহাকে তিনি যেমন ব্যবহার করেন, সেরূপ একটী মোটা চাদর ও কিছু ফল দিলেন। মা'র হাত হইতে ফল ও কাপড় পাইয়া তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

শুকদেবের মন্দিরের পূজারীগণও মা'র দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শুকদেবের মন্দিরটী একটু উঁচুতে একটী টিলার উপরে। মন্দিরে শুকদেবের, পরীক্ষিতের এবং আরও কয়েকজন সাধুর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরে ভোগের জন্য মা তাহাদের ১০১৲ টাকা দিলেন। শুনিলাম মন্দিরের প্রধান পূজারী এম, এ পাস এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। মা আসিয়াছেন, ইহাতে তাহাদের কত আনন্দ হইয়াছে এই কথাই তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। কল্যাণদেব উৎসবের শেষ দিনে বিরাট জনতার সমক্ষে একটী ভাষণ দিয়াছিলেন। তাহার সারমর্ম এই যে—সংযম মহাব্রত করিতে আসিয়াছ, তোমাদের কোন অভাব জানাইবার দরকার কি ? মায়ের কোলে বাচ্চা হইয়া যাও মায়ের ওপরে ভার দেও। মা-ই সব দেখিবেন, করিবেন, তোমাদের কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। এখনো বলিলেন মায়ের আগমনে কত ভাবে কত আনন্দ হইয়াছে—বার বার কেবল এই কথাই বলিতেছেন। মাকে তিনি বলিতেছিলেন,—এখানে প্রতি বছরই এইরূপ মেলা হয়, পূর্বে ত অনেক লোক হইত, কিন্তু সম্প্রতি আবার লোকের জোয়ারে ভাটা পড়িয়াছিল। কিন্তু এবার সেই পূর্বের জনসমাগমকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এবার যে এত লোক হইয়াছে তাহার কারণ বহুলোকেই খবর পাইয়াছে এক দর্শন-যোগ্য মাতাজী আসিয়াছেন। মাতাজীর কাছে উৎসব হইতেছে। অনেক সাধুরাও আসিয়াছেন। ভাগবৎ পাঠ হইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মাতাজীর দর্শনের জন্যই এত লোক। কেহ হাটিয়া, কেহ বা গরুর গাড়ী করিয়া, কত কষ্ট করিয়া কত দূর দূর গ্রাম হইতে আসিয়াছে। সকলের মুখেই এক কথা। বলে,—"স্বামিজী মায়ের দর্শন করাইয়া দেও।" স্বামিজী আবার বলিতেছেন, "আরও আশ্চর্যের বিষয়—হয়ত মা ঘরে শুইয়া আছেন, আমি বলিতেছি মা শুইয়া আছেন, এখন দর্শন হইবে না। কিন্তু তাহারা কাতরভাবে অনুনয় করিতেছেন—ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়া এতদূর আসিয়াছি, এখনই না ফিরিলেই নয়, দয়া করিয়া এখনই দর্শন করাইয়া দেও না। আমি

কাতর প্রার্থনা মায়ের কাছে পৌঁছায়-ই।

ভাবিতেছি কি করা—ইতিমধ্যেই দেখি মা নিজেই হঠাৎ দরজা খুলিয়া তখনই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর তাহাদের কী আনন্দ। মায়ের জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।”

এই কথা শুনিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন—“পিতাজী, এই শরীরের দ্বারা ত কিছুই সেবা হয় না। জন-জনার্দন-রূপে তো তিনিই। তাহারা দর্শন দিতে আসিয়াছিল। তাহারাই শরীরটাকে উঠাইয়া বাহিরে নিয়া দাঁড় করাইল।”

কল্যাণদেব আরো বলিতে লাগিলেন,—“এই যে দর্শন, এই দর্শনে ইহাদের কত আনন্দ আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি। গঙ্গামাতা, সেই গঙ্গায় স্নান করিয়া মায়ের দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহাদের জাগিল আর মায়ের দর্শন পাইয়া তৃপ্ত হইয়া ফিরিল। তাহাদের এই যে তৃপ্ত আনন্দের ভাব, ইহা দেখিয়া আমারও কত আনন্দ, তৃপ্তি হইয়াছে। কেহ কেহ আবার পুনঃ পুনঃ মাকে দর্শন করিয়াছে। মায়ের পদার্পণে এই স্থান ধন্য হইয়াছে। কতদিন যাবৎ আমার এই ইচ্ছা ছিল মাকে একবার এদিকে আনার—আজ সেই আশাই পূর্ণ হইল। পূজারীজীও বলিলেন মায়ের আগমনে কত আনন্দ হইয়াছে, এ স্থান পবিত্র হইয়াছে।

কল্যাণদেব আরো বলিলেন, “মুজাফফর্‌নগর হইয়া কাল যাইবার সময় মাকে খানিক সময় ওখানে সকলের দর্শনের জন্য অপেক্ষা করান হইবে।”

শুনিলাম বহু লোকের আগ্রহে কল্যাণদেব নিজেই গিয়া এই সব ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৬১।

আজ সকাল প্রায় পৌনে ৮টায় মা শুকতাল হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গীয় সকলে প্রায় ৬টার বাসে জিনিষপত্র নিয়া সোজা বুলন্দসহর রওনা

হইয়া গিয়াছে। কল্যাণদেবও মা'র অভ্যর্থনার জন্য মুজফফর্‌নগর চলিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রায় ৮॥০টায় মুজফফর্‌নগর পৌঁছিলাম। কল্যাণদেব ও তৎস্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মাকে মোটর হইতে নামাইয়া নিয়া গেলেন।

মা'র শুকতাল ত্যাগ।

যথাস্থানে পৌঁছিয়া দেখি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে মায়ের বসিবার আসন করা হইয়াছে। চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। মোটর হইতে মাকে আনিয়া বসিবার স্থান পর্য্যন্তও পৌছানই এক সমস্যা। কল্যাণদেব এবং আরো বহু লোক, অনেক চেষ্টা করিয়া মাকে আনিয়া কোন প্রকারে আসনে বসাইতে পারিলেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম রৌপ্য সিংহাসনে মায়ের আসন পাতা হইয়াছে। দুইজন পণ্ডিত স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে মাকে মালা চন্দনাদি পরাইয়া দিলেন। কল্যাণদেব কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া সকলকে শান্তভাবে বসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসংখ্য লোক মাকে মালা-চন্দন দিয়া প্রণাম করিবার জন্য উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, তবুও কল্যাণদেব অতি কষ্টে তাহাদের কিছুটা শান্ত করাইয়া যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই যে আজ মুজফফর্‌নগরবাসীদের পরম সৌভাগ্য যে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তাহাদের দর্শন দিতে আসিয়াছেন। বলিতে গেলে আজ পৃথিবীর বহুলোক মাতাজীকে কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। মা শুকতালে পদার্পণ করিয়া স্থানের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া দিয়াছেন, বহু লোক তাঁহার দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছে। তোমরা আজ মায়ের নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া নাও। তোমরা আজ মাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলে ইত্যাদি। তারপর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মা জনতার পক্ষ হইতে আমি আপনার নিকট ইহাদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ২।১টি কথা ইহাদের বলিয়া যান'।

মা ত প্রথমে বলিলেন—'এই শরীরের ত কিছুই বলিবার নাই।' তবুও কল্যাণদেবের বিশেষ আগ্রহে মা বলিলেন—"এ (নিজেকে দেখাইয়া)

ত সকলের মেয়ে। সব বাচ্চাদের এই শরীর দোস্ত বলে। দোস্তদের পিতামাতা এই শরীরেরও পিতামাতা। সবই আপন, পর বলিয়া ত কিছু নাই, কেহ নাই। তাই সকলের কাছে এই শরীরের এই কথা—এই বলিয়া ছোট দুই খানি হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।" মা আর কিছু বলিলেন না। কল্যাণদেব মা'র এই কথার ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ, মা এই ছোট কয়েকটী শব্দের মধ্যেই সব মূল কথা বলিয়া দিলেন। পর বলিয়া মায়ের কাছে কিছুই নাই, কেহ নাই। ইত্যাদি।

পর বলিয়া মায়ের কাছে কিছু নাই, কেহ নাই।

যাক সময় বেশী নাই। কাজেই উঠিলেন। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও জনতাকে শান্ত করা গেল না। অতিকষ্টে কল্যাণদেব ও অন্যান্য সকলে মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। কিছুদূর পর্যন্ত কল্যাণদেবও সঙ্গে গেলেন। পরে সেখান হইতে নামিয়া শুকতাল ফিরিয়া গেলেন।

এই ভাবে মা শুকতালের লীলা সাঙ্গ করিয়া বুলন্দসহরের দিকে রওনা হইলেন।

কথা ছিল, মা'র শরীর ভাল নয় বলিয়া মাকে মোটরে বসাইয়া নেওয়া ঠিক হইবে না—মীরাট হইতে মাকে ট্রেনে নিয়া যাওয়া হইবে। মা-ত নিজের শরীরের দিকে খেয়ালই করেন না—সকলের যাহাতে আনন্দ হয়, সকলের ধর্মভাবের অনুকূল হয়, মা তাহাই করিয়া যাইতেছেন।

মীরাট গিয়া খবর পাওয়া গেল ট্রেনে যাওয়া সম্ভব হইবে না, কারণ প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যারেজ খানা ড্যামেজ হইয়া গিয়াছে। ইহা জানিয়া মা বলিলেন যখন বিষ্ণুআশ্রমজীকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন ট্রেনে যাওয়াই ঠিক হইবে—তৃতীয় শ্রেণীতেই ব্যবস্থা কর। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার দুঃখ করিয়া বলিলেন, তৃতীয় শ্রেণীতেও যাওয়া সম্ভব হইবে না—ভয়ানক ভীড়। আর ঐ অবস্থায় তিন ঘন্টা বসিয়া থাকিতে হইবে।

সুতরাং আর যখন উপায়ান্তর নাই এবং মোটরে গেলে ১ ঘণ্টাতেই পৌঁছিতে পারা যাইবে, তখন মোটরে যাওয়াই স্থির করা হইল।

আমরা বুলন্দসহর রওনা হইলাম এবং বেলা প্রায় ১১ টায় সেখানে পৌঁছিলাম। বুলন্দসহর পৌঁছিয়া, পথেই যজ্ঞশালার ফাটকের কাছেই শ্রীবিষ্ণুআশ্রমজীর সহিত দেখা। তিনি ত এই সময় মাকে দেখিয়া অবাক! তিনি বলিলেন,—'মা মোটরে আসিবেন সূচনা পাই নাই ত। ট্রেন ত ছয়টায় পৌঁছাইবার কথা ছিল'।

বুলন্দসহরে শ্রীশ্রীমা

তখন তাহাকে সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হইল। তিনি মাকে ষ্টেশন হইতে নিবার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই কারণে হয়ত তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। যাক্ কি আর করা। তিনি মা'র থাকিবার স্থানে মাকে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মা'র থাকিবার স্থানটী একটু দূরেই করা হইয়াছে—একজন শেঠের অতিথিশালায়। বন্দোবস্তটী বেশ ভালই হইয়াছে। মায়ের সঙ্গে আমরা প্রায় ২৮।৩০ জন লোক। সকলের জন্যই বেশ ভালো ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিষ্ণুআশ্রমজী আসিয়া বলিয়া গেলেন ৩টায় মাকে প্যাণ্ডেলে ও যজ্ঞশালায় নিয়া যাওয়া হইবে। তাহাই হইল। মাকে মোটরে কীর্ত্তন ও ব্যাণ্ডপার্টি-সহ প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া হইল। মায়ের বসিবার জন্য বিশেষ আসন রাখা হইয়াছে। আরও কয়েকজন সাধুরা এবং বিষ্ণুআশ্রমজীও প্যাণ্ডেলে আসিয়া বসিয়াছেন। সকলেই মা আসিয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মা প্যাণ্ডেলে যাইতেই ক্রমান্বয়ে দুই জন পণ্ডিত মায়ের অভ্যর্থনা করিল। ইহাদের একজন শুনিলাম, ঋষিকেশ হইতে আসিয়াছেন। ইনিই এই যজ্ঞের প্রধান আচার্য্য। তিনি মাকে মালা চন্দনাদি পরাইয়া দিলেন। অভ্যর্থনা কালে তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহা এই যে

দেবতারাও শ্রীশ্রী-মায়ের নিত্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

আজ এই সহরবাসীদের বিশেষ সৌভাগ্য যে শ্রীশ্রীমা এই সহরে সকলকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। চণ্ডীপাঠ কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাই আজ জগন্মাতা প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। দেবতারাও যাঁর দর্শনের জন্য নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করে, সেই দেবদুর্লভ তিনি আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি ও বহু পূণ্যার্জিত সৌভাগ্য না থাকিলে কি হয়?"

প্রধান আচার্য্যের পরে দ্বিতীয় পণ্ডিতটীও কিছু বলিলেন। তিনি বলিলেন—"ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন 'আমার ভক্ত আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীর আগমনে ও তাঁহার দর্শনে আজ সকলেই কৃতকৃতার্থ ও ধন্য হইল। তিনিই, স্বয়ং তিনিই আজ এইরূপে এখানে উপস্থিত।"

এই সব হইয়া গেলে মাকে যজ্ঞশালায় নিয়া যাওয়া হইল। সেই স্থানেই ব্রাহ্মণগণ চারিদিকে গোল হইয়া চণ্ডীপাঠ করিতে বসিয়াছেন। মধ্যস্থানে যজ্ঞ কুণ্ড। এ স্থানেও পণ্ডিতদ্বয় মাকে মালা ও চন্দন দিলেন। মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিলেন। দেখা হইয়া গেলে আমরা আমাদের থাকিবার জায়গায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রি ৮৷৷৹ টার সময় মাকে আবার প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া হইল। সেই স্থানেই আশ্রমের নিয়ম অনুসারে রাত্রি পৌনে ৯ টায় মৌনের পর মাকে প্রশ্ন করিয়া, মা'র শ্রীমুখের কিছু কিছু বাণী সকলে শুনিলেন।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৬১।

আজ যোগানন্দজীর আশ্রমের সিষ্টার দয়া তাহার বড় বোন এবং আরও একটী মেম ও ক্রিয়ানন্দ মায়ের দর্শনে দিল্লী হইতে আসিয়াছেন।

অনেকক্ষণ তাহারা মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন। তাহারা আজ এখানেই থাকিয়া কাল সকালে ফিরিয়া যাইবেন বলিলেন। তাহাদের আহারের ব্যবস্থা হইলে, তাহারা আহার করিতে গেলে তবে মাকে বিশ্রাম করিতে নিয়া যাওয়া হইল।

মা'র শরীর বড়ই ক্লান্ত। মাকে আজ আর প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া হইল না—মাকে বিশ্রাম দেওয়া খুবই প্রয়োজন বোধ হওয়ায় এই ব্যবস্থা করা হইল। পরে রাত্রি প্রায় ৮৷৷০টায় মাকে প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া হইল। আজও মৌনের পর মাকে কিছু কিছু প্রশ্ন করিয়া মায়ের বাণী সকলে শুনিলেন। পরে মাকে অনুরোধ করায় মা প্যাণ্ডেলে কিছু সময় নামও করাইয়াছেন। মায়ের মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া অনেকেই খুব আনন্দ পাইয়াছে। আবার কেহ কেহ মাকে বলিল যে সাধুরা প্রবচন দেন, মা-ও যেন কিছু বলেন। মা তাহাদের সেই কথা শুনিয়া ছোট ছোট দুইখানি হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—"এই শরীরটা ত তোমাদের ছোট্ট মেয়ে, লেখা পড়া কিছু জানে না। প্রবচন আদি এই শরীর কিছুই দেয় না। তবে তোমরা ছোট্ট মেয়েকে আদর করিয়া তাহার আধো আধো বুলি শুনিবার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তোমরা যেমন বাজাইবে তেমনই শুনিবে। এই শরীরের ত বলিবার শুনিবার কিছুই নাই। তোমরাই বাজাইবে, অর্থাৎ প্রশ্ন করিবে, তখন তোমরাও শুনিবে, এই শরীরও শুনিবে। যদি কিছু বলা না আসে, বলা হইবে তোমরা ভাল করিয়া বাজাও নাই, তাই বাজিল না।"

পরে প্যাণ্ডেল হইতে মা ফিরিয়া ঘরে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন আসিয়া মা'র ঘরে, মা'র কাছে বসিলেন। তাহার মধ্যে আছেন পূরণচাঁদ শেঠজী। ইহারই অতিথিশালায় আমরা আছি। ইনিই মায়ের পার্টির সব ব্যবস্থাদি করিতেছেন। আর আছেন একজন ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার মিঃ ঋষি। ইহা ছাড়া কলিকাতার মায়ের ভক্ত শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায়ও

সস্ত্রীক আছেন, মাথুর প্রভৃতি আরো কয়েকজনও ছিলেন। শেঠজী ঋষিজীকে সস্ত্রীক দেখাইয়া বলিলেন,—"মা, ইহারা স্বামী স্ত্রী খুব পূজা পাঠ করে, খুবই ভক্ত লোক।"

অবশ্য কথাগুলি যে সত্য তাহা তাহাদের চেহারা দেখিয়াই মনে হইতেছিল। মিঃ ঋষিজী মাকে বলিলেন,—"মায়ের কীর্ত্তন অদ্ভুত শুনিলাম। এমন আর কখনো কোথাও শুনি নাই। মনে হইতেছিল ইহা যেন আর না থামে। আরও মনে হইতেছিল ইহাতেই বোধহয় সমাধিও হইতে পারে।"

ক্রমে আরও নানান কথা উঠিল। ঋষিজী মাকে বলিলেন—'আমার ভ্রূর মধ্যে ধ্যান হইয়া যায়, কিন্তু শুনিয়াছি হৃদয়ে ধ্যানই বেশী ভাল।' ইহার উত্তরে মা যাহা যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই :

"ভ্রূমধ্যে ধ্যানই ভাল। গীতায় উর্দ্ধমূল অধঃশাখা বলা হইয়াছে। কাজেই মস্তিষ্কের দিকেই মূল স্থান। গাছের মূলে জল দিলে যেমন গাছের সর্ব অঙ্গেই পায়, সেইরূপ মস্তকই হইল মূল স্থান।" ইত্যাদি।

ক্রিয়ানন্দ, সিষ্টার দয়া প্রভৃতিও মা'র সঙ্গে কথা বলিল। ক্রিয়ানন্দ প্রশ্ন করিলেন, "মা আমি এইরূপ বসি (সুখাসন করিয়া দেখাইলেন) কিন্তু ১০ বছর যাবৎ অনেক চেষ্টা করিয়াও বেশী সময় বসিতে পারি না, তাই চেয়ারে বসিয়াই ধ্যান করিতে চেষ্টা করি। আসনে বসাই কি প্রয়োজন ?

ধ্যান-জপের অনুকূলতার জন্যই আসন।

মা বলিলেন, "দেখ, ধ্যানের অনুকূলতার জন্যই আসন। যদি কাহারো এমনিতেই ধ্যান ভালো জমে, তবে আর আসনের প্রয়োজন নাই। আসনে যদি ধ্যান ভাল না জমে, শরীরের দিকে, আসনের দিকেই খেয়ালটা থাকিয়া যায়, তবে আর লাভ কি হইল। আসল লক্ষ্য ত হইল তাঁর দিকে মনটা দেওয়া, তা যেমন করিয়া হয়, তাই করা।"
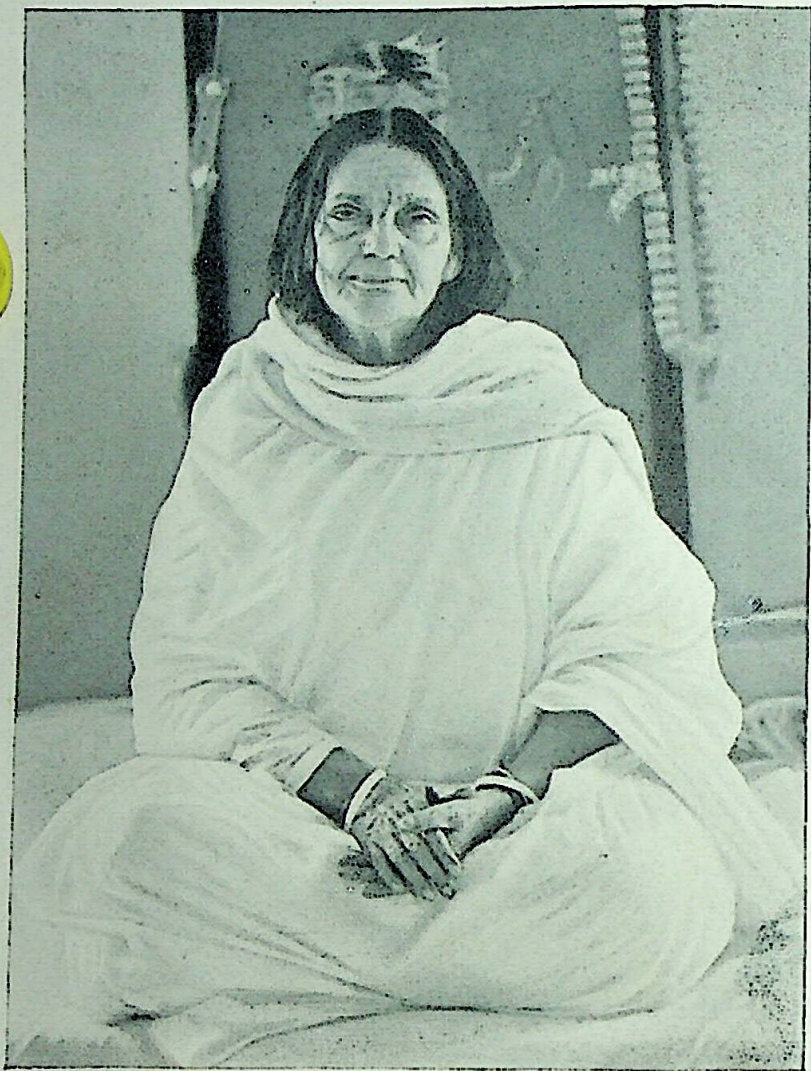
ক্রিয়ানন্দ—"মা আমার গুরুদেব বলিয়াছিলেন, আসনের দিকে এত লক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই, হৃদয়-আসনে তাঁহাকে বসাইতে চেষ্টা কর।"

মা—"তাইত কথা। এই হৃদয় আসনে তাঁহাকে বসাইবার অনুকূল হইবে বলিয়াই আসন ইত্যাদি করা।"

এইরূপ কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। মা'র কাছে আসিয়া তাহারা কত আনন্দ পায়, এই জাতীয় আরও নানান কথা তাহারা বলিতে লাগিল। দয়া বোন কতভাবে মাকে আদর করিয়া বলেন,—'মিঠা মা'। 'আমার প্রেম নেও।' এই ২।১টী বাংলা শব্দ যাহা শিখিয়াছে তাহাই বলে। এইভাবে তাহারা সকলে কত আনন্দ প্রকাশ করিল। মা ত করুণাময়ী, প্রেমময়ী, মাতৃরূপে তাহাদের সঙ্গে কত মধুর ব্যবহার করিলেন। মা'র ত সকলের সঙ্গেই মধুর ব্যবহার। আগামী কাল বেলা প্রায় ৯টায় তাহারা চলিয়া যাইবে।

২রা ডিসেম্বর, ১৯৬১।

আজ যাইবার সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই দয়া বোন, ক্রিয়ানন্দ প্রভৃতি মা'র কাছে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। যাওয়ার সময় তাহারা গাড়িতে উঠিতে বাহিরে গেলে, মা-ও ঘরে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতেছিলেন। মাকে সহাস্যমুখে ঐভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহারাও মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই দয়া বোন মা'র দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—'আমার মিঠা মা।' তাহারা চলিয়া গেল।

রাত্রিতে মা প্যাণ্ডেল হইতে ফিরিয়া আসিলে পুরণচাঁদ শেঠের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা আসিয়া মা'র কাছে বসিল। স্ত্রী বলিতেছিল, "মা'র কাছে আসিলে আর যাইতে ইচ্ছা করে না।"

মায়ের কাছে আসিলে আর যাইতে ইচ্ছা করে না।

ভাবিয়া অবাক হই—এই ভদ্রমহিলার এইবারই ত মা'র সঙ্গে প্রথম দেখা। মায়ের কী বিচিত্র বিভূতি।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬১।

শ্রীবিষ্ণুআশ্রমজী সকলকে প্যাণ্ডেলে জানাইয়া দিয়াছেন যে কেহ যেন মায়ের বিশ্রাম গৃহের নিকটে ভীড় না করে। মা প্যাণ্ডেলে আসিলেই মা'র দর্শন হইবে। তাই মা'র বিশ্রাম কক্ষের নিকট আর বিশেষ ভীড় হয় না, তবে কেহ কেহ ত আসেনই। আজ সন্ধ্যায় দ্বারকা মঠাধীশ শংকরাচার্য্য কৃষ্ণবোধাশ্রম আসিয়াছেন। রাত্রিতে প্যাণ্ডেলে তাঁহার বক্তৃতা হইল। সেই সময় মাকেও প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া হইয়াছিল।

আগামী কাল সকালেই মা'র বৃন্দাবন মোটরেই ফিরিয়া যাওয়ার কথা।

এখানে বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, এই পুরণ চাঁদ শেঠজীর পরিবারটী দেখিলাম বিশেষ ভদ্র ও ভক্ত পরিবার। শুনিলাম সাধুদের ইহারা সর্বদাই এইরূপ সেবা করেন। আমরা সকলেই ইহাদের ব্যবহারে আনন্দ পাইয়াছি। শেঠজীর স্ত্রী আজও রাত্রিতে মা'র কাছে আসিয়া বসিয়া রহিলেন। পুনঃ পুনঃ একই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "মা, ভগবৎ ভক্তি যেন হয়। আর যাহা আছে যথেষ্ট।" এখানে ইহাদের চিনির কারখানা আছে। শুনিলাম খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ইহারা আজকাল জনসাধারণের মত নহেন—ও ব্যাপারে ইহাদের যথেষ্ট সংযম। স্ত্রী তো কোথাও বাহিরে কিছুই খান না। সে আরও একটী কথা বলিল যে তাহারা প্রতি বৎসর ২।১ মাসের জন্য পাহাড়ে বেড়াইতে যাইত, তাহাতে ৪।৫ হাজার টাকাও খরচা হইত। কিন্তু টাকাটা কিছু নহে, পাহাড়ে গেলে সেখানে ভোগ-বিলাসের মাত্রা এত অধিক চোখে পড়িত যে তাহাতে

তাহাদের নিজেদের মনও চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাই তাহারা আজ ৪।৫ বৎসর ধরিয়া আর পাহাড়ে যায় না। ইহার পরিবর্তে তীর্থ স্থানে বেড়াইতে যায় আর তাহাতে তাহাদের মন-ভাল থাকে, এবং টাকা পয়সাও ধর্ম কাজেই ব্যয় হয়। এই জাতীয় অনেক কথাই বলিল। আমার তাহার এই ভাবটা বড় ভাল লাগিল। তাহার বড় ছেলে ও তাহার বৌও এখানেই আছে। তাহারাও মা'র কাছে আসিয়া বসিত, এবং মা'র কাছে আসিতে পাইয়া তাহারা কত ভাগ্যবান—এই জাতীয় কথাই বলিত।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬১।

আজ প্রায় বেলা ৮টায় আমরা বৃন্দাবন রওনা হইলাম। পথে বিষ্ণুআশ্রমজীর আগ্রহে মা খুরজাতে এক শেঠানীর মন্দির ঘুরিয়া গেলেন।

মন্দিরটা সুন্দরই। গণেশজীর মন্দির। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের অনেক লীলা মন্দিরের দেয়ালে চিত্রিত রহিয়াছে। শুনিলাম ইনি ধর্মার্থে অনেক দানাদি করেন। মন্দির দেখিয়া আমরা প্রায় বেলা ১২টায় বৃন্দাবন আসিয়া পৌছিলাম। হাথরাস পৌছিয়া দেখি, দিল্লীর রঘুবংশজী মাকে বৃন্দাবন নিবার জন্য তাহার গাড়ী সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই মোটরেই আমরা বৃন্দাবন পৌছিলাম। পার্টির আর সব বাসে বৃন্দাবন পৌঁছিয়াছে। এখানে মুন্নি তাহার ৺পিতা পরশুরামজীর উদ্দেশ্যে ভাগবৎ সপ্তাহ করিবে পূর্বেই স্থির হইয়া আছে। ভাগবৎ আরম্ভ হইবে ১৩ই হইতে।

খুরজা হইয়া মায়ের বৃন্দাবন আগমন।

এখানে আসিয়া মা বিশ্রামেই আছেন। সঙ্গে আমরা লোকও অল্পই আছি।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬১।

গতকল্য রাত্রিতে রামকৃষ্ণ মিশনের বিজয় মহারাজ মা'র দর্শনে আ.সয়া বলিয়া গিয়াছেন যে আজ মাকে তাহাদের নূতন হাসপাতাল দেখাইতে নিয়া যাইবেন। তাহারা বৃন্দাবনে আমাদের আশ্রমের অতি নিকটেই একটি নূতন হাসপাতাল নির্মাণ করাইয়াছেন। তাই আজ প্রায় বেলা ৪টায় বিজয় মহারাজ মাকে নিতে আসিয়াছেন। মা'র সঙ্গে আমরাও অনেকেই হাসপাতাল দেখিতে চলিলাম। মিশনের একজন সন্ন্যাসী মাকে হাসপাতালের সব ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই স্থানটিই মা'র আশ্রমের জন্য আমরা নিয়া একটি কুটিয়া তৈয়ারী করাইয়া, হরিবাবা প্রভৃতি সাধুদের আনাইয়া গৃহ প্রবেশ করান হইয়াছিল। গৃহ প্রবেশ হইয়া গেলে মিষ্টি বিতরণও হইয়াছিল। এমন কি মাকে নিয়া এক রাত্রি আমরা ঐ কুটিয়াতে ছিলামও। পরে ঐ জমি হাসপাতালের জন্য নেওয়া হইলে, আমরা আশ্রমের জন্য এই বর্ত্তমান জমি নিয়াছিলাম। এই বিষয়টা উল্লেখ করিয়া মা বিজয় মহারাজ ও যিনি হাসপাতাল দেখাইতেছিলেন তাহাদিগকে হাসিয়া বলিলেন,—'বাবা, তোমাদের এই ছোট্ট মেয়েটা একরাত্রি এখানে বাস করিয়া গিয়াছিল।' এই কথায় তাহারাও হাসিয়া সমর্থন করিলেন।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬১।

আজ কিছুদিন যাবৎই দেখিতেছি মা'র ভাবটা যেন কি-রকম। আজিও ভাবটা সেইরূপই। মা, আজ এখানে যে মন্দিরের ভোগ পাক করে সেই পাচকের হাত দিয়া একটু রুটি খাইলেন। পরে হেমিদির হাতে একটু তরকারী খাইলেন। খাইতে খাইতে বলিলেন মাধুকরী আরম্ভ করিলাম। মা'র জন্য যে ভোগ পাক করা

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবান্তর।

হইয়াছিল, তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিলেন না। আর ইহাও বলিয়া দিলেন যে "এই শরীরের জন্য না জিজ্ঞাসা করিয়া যেন রান্না ইত্যাদি না করা হয়"। ভাবটা যেন আমাদের কেমনই লাগিতেছে। এই ভাবটা ২।৪ দিন চলিল, পরে আবার ধীরে ধীরে প।রবর্ত্তন হইয়া গেল। কী জানি কী ব্যাপার। মা'র লীলা মা'ই জানেন।

আজও একজন বাঙ্গালী সাধু আসিয়া তাহার আশ্রমে মাকে নিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্বেই এ ব্যাপারে মাকে আসিয়া অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছিলেন।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬১।

আজও মা'র ভাবটা স্বাভাবিক না। কখন কি করেন, আমরা যেন ভয়ে আড়ষ্ট। ভাবটা কিরকম, ঠিক ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, অনেকটা এইরকম যেন কাহারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই, যা খেয়ালে হইবে, তাহাই করিবেন। যদিও বেশ জানি মা'র ত কোন সময়ই কোন বন্ধনই নাই, তবুও দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া. মিশিয়া যেটুকু ব্যবহার করেন—আজ যেন তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই—ইহাতেই আমরা ভীত হইতেছি। আশ্রমবাসী সাধুদের ও আমাদের সঙ্গে এই ভাবেরই কথা কিছু কিছু বলিলেন। সকালে এই ভাবটা খুবই প্রবল ছিল, পরে ধীরে ধীরে যেন একটু অন্য রকম ভাব দেখিয়া, আশ্রমের সাধুরা আজ সকলে মা'র প্রসাদ নিবেন বলায়, মা রান্না করিবার অনুমতি দিলেন। মা'র ভোগের পর কেশবানন্দ, কমল, প্রকাশ, চিন্ময়, স্বরূপ, চৈতন্য প্রভৃতি মা'র এখানে প্রসাদ পাইল।

রাত্রিতে প্যারিস হইতে যে সাহেব ও মেম আসিয়াছে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। তাহাদের জিজ্ঞাস্য হইল "সকলে ছোঁয়াছুঁয়া করিয়া খাইলে

কি দোষ? সকলের বিছানায় সকলে বসিলে, কি দোষ? আমরা শিক্ষা পাই ভগবানেরই ত সব—তাই সকলকে ভালবাস। কিন্তু এইরূপ করিলে তো সংকীর্ণতাই বৃদ্ধি পায়……ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মা ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে—যাহারা এই পথে চলিতে চায় তাহাদের শক্তি নষ্ট হওয়া ঠিক নহে। দশজনের সঙ্গে ছোঁয়া, খাওয়া, বসাতে নিজের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, অপরের ভাবও সংক্রামিত হইয়া সাধন পথের ক্ষতি করে। যখন রোগের বীজাণু হইতে রক্ষা করিবার জন্য রুগীকে সকলের নিকট হইতে পৃথক রাখিতে হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবেরও বীজাণু আছে, এবং তাহাও সংক্রামিত হয়, আর এই যে স্পর্শসুখ ইহা ভোগের ব্যাপার—গার্হস্থ্য জীবনের কথা—সাধন পথের এই কথা নয়। আর যদি কাহারও এমন সৌভাগ্য হয় যে পাত্র ভরিয়া গিয়াছে, তখন জল উপচিয়া পড়িয়া সকলেরও উপকার করিবে, নিজেরও পাত্র ভরাই থাকিবে। কিন্তু পাত্র ভরিবার পূর্বে যদি বিলাইতে যাওয়া হয় তবে পাত্র খালি হইয়া নিজেরও ক্ষতি, আর কাহারও উপকারও করা সম্ভব হইবে না।

স্পর্শদোষে শক্তিক্ষয়।

পরিবেশন ইত্যাদি আলাদা ভাবে করা হয় কেন? ইহাদের যেমন অভ্যাস নিজেরাই খাওয়া চামচ দিয়া উঠাইয়া নিয়া সকলেই তাহা খায় তাহা এখানে হয় না কেন? ইহার উত্তরে মা যাহা বলিলেন, তাহা এই যে, আমাদের এখানে প্রথাই এই যে একের উচ্ছিষ্ট সকলে খায় না। সকলে খাইতে বসিলে যিনি পরিবেশন করিবেন তিনি কাহাকেও ছুঁইবেন না, আলাদাভাবে খাবারটা দিয়া যাইবেন। তবে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল যে ইহাই একমাত্র পথ নয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু মত, বহু পথ আছে।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬১।

আজ সকালে উঠিয়া মা বাগানে ও আশ্রমের ভিতরে নানান জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পরে মন্দিরে গিয়া মহাপ্রভুর ও রাসের সব কাপড় আদি গুছাইয়া রাখাইলেন। আগ্রা হইতে ভার্গব সস্ত্রীক আসিয়া, কাল হইতে এখানে বাটুদাকে দিয়া যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাইতেছেন। আজও কিছু কিছু কাজ আছে। এই উপলক্ষে যজ্ঞাদি, কুমারী ভোজন ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদিও হইবে। ভার্গবের এই সব করাইয়া আজই বৈকালে চলিয়া যাওয়ার কথা। মাকেও তাহারা পূজা, আরতী ইত্যাদি করিল।

গোপাল স্বরূপ পাঠকজীর মেয়ে পুষ্প এখানে চণ্ডীপাঠ করাইতেছেন। মুন্নি ও পুষ্প মাকে বিশেষভাবে পূজাদি করিল। মা নিমগাছের গোড়ায় প্রকাণ্ড এক বেদী নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে গীতা জয়ন্তী আরম্ভ করাইলেন। ইহা তিন দিনে শেষ হইবে। অবধূতজীর ইচ্ছায় এই তিন দিন রাসও হইবে। মা রাসের ঠাকুরজীর বসিবার জন্য একটি সুন্দর বেদীও করাইয়া দিলেন। বিদ্যাপীঠও আজকাল এখানেই আছে। তাহারাও মাকে পাইয়া নানান ভাবে আনন্দ করিতেছে। ভাগবৎ ভবনে কোন কোন পণ্ডিত আসিয়া মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজজীও মা'র সঙ্গেই আছেন। তাঁহার সঙ্গে সদালোচনায় অনেকেই আনন্দ পাইতেছেন। মায়ের ভক্তগণও নানাস্থান হইতে আসিয়া মায়ের সঙ্গ করিয়া যাইতেছেন। মায়ের নির্দ্দেশে মহাপ্রভু এবং শিবের ভোগের ঘর মন্দিরের সংলগ্ন করিয়া করান হইতেছে। ইহা হইয়া গেলে ভোগে আর কাহারও দৃষ্টি পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে না।

মাকে একদিন বন্-মহারাজজী তাঁহার উৎসবে নিয়া গেলেন। মায়ের নির্দ্দেশে বন্‌মহারাজজীকেও একদিন আশ্রমে ভিক্ষা দেওয়া হইল। এই ভাবেই নানা প্রকারের আনন্দের মধ্য দিয়া একে একে দিনগুলি কাটিতেছে।

ইহারই মধ্যে হঠাৎ আজ কাশী হইতে সংবাদ আসিল যে কন্যাপীঠের ৮।১০টী মেয়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও হামজ্বর, কাহারও বা টাইফয়েড হইয়াছে। ডাক্তারগণ যথাসাধ্য চিকিৎসাদি করিতেছেন।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬১।

আজ মা বলিতেছেন—"গত পরশু, (অর্থাৎ ২৮-১২-৬১) রাত্রি হইতেই কেবলই সন্তোষের (দিল্লীর ডাক্তার সন্তোষ সেন) খেয়ালটা আসিতেছে। কাল বিকালবেলাও দেখিলাম এই শরীরটাকে কতভাবে আদর করিয়া খাওয়াইতেছে। প্রথমে দেখা গেল ভাত, ইত্যাদি। তখনই এই শরীরের খেয়াল হইল, 'এই শরীরেরত কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সকলের পক্ষে......' এই খেয়ালটা আসিতেই দেখা গেল ভাত নয় ভাল ভাল মিঠাই, সব ভাজা ইত্যাদি খাওয়াইয়া দিল। কেবলই সন্তোষের খেয়ালটা আসিতেছে।"

যাহা হউক, এইভাবেই কাটিতেছে। লোকজন বিশেষ নাই। মা নিজের ভাবে বিশ্রামেই আছেন।

৫ই জানুয়ারী, ১৯৬২।

আজ মা খুব ভোরে উঠিয়া আমাদের বৃন্দাবন আশ্রমের নীম গাছের নীচে বেদির ওপর পায়চারি করিতেছিলেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় মা তাঁহার বিশ্রাম কক্ষের পাশের ছোট কুটিয়াটীতে আসিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে শুইয়া পড়িলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ শুইয়া আছেন, এমন

সময় তারে সংবাদ আসিল কন্যাপীঠের একটি মেয়ে (ক্ষমার বড় ভাইজী) হঠাৎ মারা গিয়াছে। কন্যাপীঠের গুটিকয়েক মেয়ে যে অসুস্থ ছিল তাহাত গত ৯ই ডিসেম্বরই সংবাদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু এ সংবাদে একেবারে মর্ম্মাহত হইলাম।

কন্যাপীঠের একটি মেয়ের মৃত্যু ও শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে মায়ের অপার অলৌকিক করুণা।

মা সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্য মেয়েদের দিয়া পাঠ, কীর্ত্তন, জপাদি আরম্ভ করাইলেন। অশৌচের এক মাস এইভাবে সব করিতে বলিলেন।

আজ প্রায় ২৫ বৎসর হইতে চলিল কন্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে 'মঞ্জু' নামে একটি মেয়ে একবার সামান্য অসুখেই হঠাৎ মারা গিয়াছিল, আর আজ এই মেয়েটী মারা গেল। নহিলে কন্যাপীঠে এরূপ ঘটনা ত আর ঘটে নাই। অথচ এই যে একসঙ্গে ৮।১০টী মেয়ে অসুস্থ হইয়া পড়িল, এইরূপও আর কখনো হয় নাই। কাজেই এ সংবাদে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়িল। কী আর করা, সবই তাঁহার ইচ্ছা।

আর মেয়েটীর ভিতরেও একটু অসাধারণত্ব ছিল। বাহিরের দিক হইতে মেয়েটীর মায়ের সঙ্গে একটা খুব বেশী দেখাশোনা না হইলেও—শুনিলাম মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই মায়ের ছবিখানি বিশেষ আগ্রহে নিজের কাছে কাছে রাখিত। সর্ব্বদাই প্রায় 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিত এবং তার ঠাকুরমা যখন তার মা বাবাকে সংবাদ দিবে কি না—জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন মেয়েটী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিত। বলিত,—"আমি যে 'মা' 'মা' বলি তাহা মাকে ডাকি না, ডাকি মা আনন্দময়ীকে!"

যাহা হউক, ক্ষমার মা নাতিনীটি মারা যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পাইয়া মায়ের নিকট আসিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া সতী ও আশ্রমের একটী সেবক সুধীরকে নিয়া বৃন্দাবন আসিয়া উপস্থিত। প্রথমে আসিয়া মনের দুঃখে ও ব্যথায় মায়ের কাছে নানা ভাবের কথা বলিতেন। তাহার কথায় তিনি ক্ষমার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট এই ভাবই প্রকাশ পাইল।

ক্ষমার মা বৃন্দাবন আশ্রমে দুপুরবেলায় আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, আর কিছুক্ষণ পরেই মা তাহাকে ডাকিয়া কাছে নিয়া নানান ভাবে বুঝাইয়া বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন—বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ইহার পর হইতেই তিনি একেবারে শান্ত হইয়া গেলেন।

পরের দিন আশ্রম প্রাঙ্গনে তিনি ঘুরিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল—"কেমন আছেন?" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দিলেন,—"কেন? মা'র কাছে আসিয়াছি, খারাপ থাকিব কেন? বেশ ভাল আছি।" চোখে মুখেও বেশ একটা শান্ত প্রসন্ন ভাব। ইনিও আজ কয়েক বৎসর যাবৎ-ই সংসার ছাড়িয়া কাশীতে আশ্রমেই বাস করিতেছেন। বিশেষ প্রয়োজনে কথনো সখনো বাড়ীতে অল্প দিনের জন্য যান, আর সব সময় নিজের সাধন ভজন নিয়া আশ্রমেই থাকেন।

আর ক্ষমার বাবা আমাদের গিরীনদা ত বহু বৎসর যাবতই আশ্রমবাসী। প্রথমে কাশীতে ছিলেন, পরে, এখন পুরীর আশ্রমে আছেন।

মেয়েটী যখন অসুস্থ হইয়া পড়িল, ক্ষমা নিজের গভীর বিশ্বাসে আর তাহার মা বা বাবাকে খবর দেয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, মা'র আশ্রয়ে আছে, বাড়ীতে খবর দিবার আর কোন প্রয়োজন হইবে না। আর কন্যাপীঠেও এসব ঘটনা ঘটেও না, কাজেই ও যে মারা যাইবে তাহা ও কল্পনাও করিতে পারে নাই। মেয়েটী বড়ই ভাল ছিল। আশ্রমে আসিয়া থাকার একটা তীব্র বাসনার জন্যেই ও আশ্রমে আসিয়াছিল। এইসব নানান কারণেই ওর মৃত্যুতে সকলেই খুব দুঃখিত হইয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, বাপ মাকে বা গিরীনদাকে তো কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই, অথচ তাহারা সকলেই মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ক্ষমার নিকট যে পত্র দিয়াছে তাহাতে মায়ের প্রতি তাহাদের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভাব একেবারে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সবই মায়ের লীলা!

ক্ষমার মা বৃন্দাবনে মায়ের কাছেই আছেন। তাহার ঐ শান্ত ভাব দেখিয়া মা বলিলেন,—"ত্যাগ, সাধন ভজনের এই ফল।"

বহু স্থানেই দেখা গিয়াছে, পাপী, তাপী, শোকার্ত্ত—যেই হউক না কেন—যে কেহ যখন মা'র কাছে আসিয়াছেন, তাহারা আশ্চর্যরকম ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া, অন্তরে যথেষ্ট শান্তি লাভ করিয়াছেন।

৬ই জানুয়ারী, ১৯৬২।

বহুদিন পূর্বে কন্যাপীঠে একটা মেয়ে ছিল, তার নাম শ্রদ্ধা। আজ সংবাদ আসিল সেই মেয়েটীও আজ হঠাৎ মারা গিয়াছে। শ্রদ্ধা আমাদের কন্যাপীঠের মেয়ে বিশুদ্ধার বড় বোন। সে বহু বৎসরই কন্যাপীঠে ছিল, পরে বাপ মার আগ্রহে বাড়ী গিয়াছিল। সম্প্রতি ৮।১০ মাস পূর্বে মেয়েটীর বিবাহও হইয়াছিল। এই সংবাদে আমাদের মন আরও দুঃখিত হইয়া পড়িল। এই মেয়েটীর পিতা নগেনদাও মা'র একনিষ্ঠ ভক্ত। ইনিও শান্তির আশায় তাহার বড় ছেলেকে নিয়া মা'র কাছে বৃন্দাবনে চলিয়া আসিয়াছেন।

কন্যাপীঠের মেয়েদের অসুস্থতা এবং তাহার মধ্যে একটীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মা বলিলেন, "যে সব মেয়েরা ভাল আছে তাহারা সকলে যেন বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যায়।"

আজ সতী ক্ষমার মাকে পৌছাইয়া দিয়া এক দিন পরেই কাশী ফিরিয়া গেল। তাহাকেই সব বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সতীকে মেয়েদের নিয়া বিন্ধ্যাচল গিয়া থাকিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্ষমা ত যাইতে পারিবেই না—আরও কয়েকটি মেয়ে অসুস্থ আছে। সতীর সঙ্গে মা বিমলাকেও মেয়েদের সেবার জন্য দিয়া দিয়াছেন। বিমলা এখানে মা'র এবং দিদিমার সেবায় ছিল, কিন্তু মা বলিলেন, "এখানে যাহা হয় হইবে,

বিমলা ওখানে গিয়া মেয়েদের সেবা করিবে।" কাজেই বিমলাও চলিয়া গেল। এত বছর যাবৎ এই দেখিয়া আসিতেছি, মায়ের নিকট কাহারও বা কিছুর জন্যই কোন অপেক্ষাই থাকে না। আবার মা'র দৃষ্টি ত সব দিকেই, কাজেই এতগুলি মেয়ে পাহাড়ের ওপরে থাকিবে, কাজেই দীনবন্ধু এবং এটোয়ার দাদাকেও মা বিন্ধ্যাচল গিয়া থাকিতে বলিলেন।

মা এই মৃত্যুর ব্যাপারে ক্ষমাকেও এক পত্র লিখাইলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নরূপ :

"ক্ষমা ত প্রাণ দিয়া সকলকেই সেবা করিয়াই যাইতেছে, তাই যেন করে। তাহার অবস্থাটাও খুবই বোঝা যাইতেছে। ধৈর্যের সহিত শান্ত ভাবে যেন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যায়। আকুলি ব্যাকুলী ভাব নিয়া সমস্ত পরিজন গৃহ ছাড়াইয়া আনিয়া বিশ্বনাথই কোলে তুলিয়া নিলেন।" সত্যই মেয়েটী খুবই আগ্রহ করিয়া আশ্রমে চলিয়া আসিয়াছিল!

মা বৃন্দাবনেই আছেন। একদিন মা কথায় কথায় বলিতেছিলেন, বহুদিন পূর্বে মা সূক্ষ্মে দেখিতেছিলেন আমাদের আশ্রমে বর্ত্তমান শিবের মন্দিরের (তখনও আমাদের এই আশ্রম হয় নাই) প্রায় পেছনের দিকটায় যমুনা প্রবাহিতা। তাহারই তটে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল একটী ছেলে দাঁড়াইয়া আছে, আর একজন তাহার মাথায় ছাতি ধরিয়া আছে।

পরে আমরা শুনিয়াছি বহু পূর্বে এই দিকেই যমুনার প্রবাহটা ছিল. আর আমাদের এই আশ্রমের জমিটা গোচারণ ভূমির মধ্যেই ছিল।

এর মধ্যেই একদিন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রধান একজন বড় পণ্ডিত আসিয়াছেন। ভাগবৎ ভবনে বসিয়া মার সঙ্গে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কিছুটা এইরূপ :

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, শুনিয়াছি আপনার অনেক আশ্রম আছে?"

মা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"বাবা, উহারা ত আশ্রম-টাশ্রম করে, এই শরীর ত উড়নেওয়ালা পক্ষী, যখন যেখানে হয় ঢুকিয়া যায়, আবার বাহির হইয়া যায়। আর আশ্রম বল তো, বিশ্বজোড়া একই আশ্রম। আশ্রম অর্থাৎ যেখানে শ্রম নাই।',

বিশ্বজোড়াই মায়ের আশ্রম।

মা'র কথা শুনিয়া, পণ্ডিতজী খুব খুশী।

আবার পণ্ডিতজী প্রশ্ন করিলেন,—'আচ্ছা মা, ধাম ও জগতে প্রভেদ কি ?"

মা—"সাধারণতঃ জগৎ ও ধামে প্রভেদ আছেই সকলের কাছে। কিন্তু যাহার নিকট নিত্যধাম প্রকট হইয়াছে, তাহার কাছে এ সবই সমান। কোথায় তিনি নাই!..."এই জাতীয় আরো অনেক কথা মা বলিলেন। সব শুনিয়া এবারও পণ্ডিতজী খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

ধাম ও জগতে পার্থক্য।

যোগীভাই মা'র কাছে আসিয়াছেন। কুম্ভ পর্যন্ত তিনি মা'র সঙ্গে থাকিবেন।

১১ই জানুয়ারী, ১৯৬২।

মা বৃন্দাবনেই আছেন। শরীর মোটেই ভাল না। মা'র খাওয়া ত এমনিতেই অতি অল্প; তাহার ওপর কিছুদিন যাবৎ আরও সংক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন। আজকাল সারাদিন প্রায় কিছুই খান না। বেলা প্রায় ২৷৩ টার সময় একটু দুধ ও সামান্য একটু জল খান, আর সন্ধ্যার পর সিদ্ধ তরকারী। তাহাতে তেল, নুন বা ঘি কিছুই দেওয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। আর তার সঙ্গে একখানা রুটি। ইহা খাইয়া নিজের ভাবেই আছেন। ভাবের মধ্যেও সাধারণ ভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। সকলে হঠাৎ এই পরিবর্তন

ধরিতে পারে না। এই জানুয়ারী মাসের শীত, কিন্তু তাহাতেও গরম চাদরও বড় একটা ব্যবহার করেন না। ঘোরাফেরার সময় একটী পাতলা কম্বল গায়ে দেন। বিছানাতেও শুধু কম্বলই পাতা, গায়েও কম্বলই দেন। কম্বলের ওপর চাদর বা ওয়াড়, কিছুই নহে, শুধু কম্বল। সাধারণ ব্যবহারের ভাবটা যেন দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। শরীরও সুখাইয়া যাইতেছে। কিন্তু কাহারও কিছু করিবার বা বলিবার শক্তি নাই।

আজ বেলা প্রায় ২২/৩ টার সময় মা কান্তিভাইকে ডাকিয়া বলিলেন—"এতগুলি মেয়ে বিন্ধ্যাচলে থাকিবে, দাদা ও দীনবন্ধুকে সঙ্গে থাকিবার জন্য পাঠান হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু পুরুষ বেশী থাকা দরকার। পাহাড়ের ওপর—নির্জন স্থান।"

কান্তি ভাইকে এ কথা বলিতেই কান্তি ভাই বিন্ধ্যাচলে যাইতে অস্বীকার করিয়া বসিল।

মা তার উত্তরে একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন,—"বেশ, তোমরা কথা না শুনিলে, আর কি বলা !! কিন্তু তোমাদেরও তো আশ্রমে হেমদি প্রভৃতি আপন মায়ের মতই কত করে। সকলকেই সকলে আপদে বিপদে দেখা উচিৎ।"

ইহা বলিয়াই মা আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"যাক, তোমরা যা ভাল বোঝ কর। বিন্ধ্যাচলে গেলে কান্তি ভাইকেও কোনই কাজের ভার দেওয়া হইত না, শুধু ওখানে থাকা। ইহাতে ভালও দেখাইত। এই জন্যই বলা হইয়াছিল।" ইহা বলিয়াই মা চুপ করিয়া গেলেন।

ইহার একটু পরেই বাহিরে আসিয়া, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—

আমার বিন্ধ্যাচল গমন।

"দিদি, তুমি তো কথা বলিলে শুনিবে-ই। তুমি কাশী চলিয়া যাও। এই সময়তে যাওয়া দরকার।" আবার একটু পরে, উদাস, চিন্ময় ও অরুণাকে ডাকিয়াও ঠিক এই

কথাই বলিলেন। এবং বলিলেন,—"তোমরাও দিদির সঙ্গেই যাও, দিদিকেও দেখিও।"

এদিকে গাড়ীর সময় বেশী নাই, বুনি ও চিত্রা খুব তাড়াতাড়ি করিয়া আমার জিনিষপত্র কিছু ঠিক করিয়া দিল। এই অবসরে আমিও একটু রান্না করিয়া মাকে একটু খাওয়াইয়া, প্রসাদ নিয়াই ব্যস্তভাবে রওনা হইলাম। করুণাময়ী মা আমাদের 'মোটরের কাছে সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা প্রণাম করিতে মা যেমন বলেন,—"ভাল মত যাইও, ভাল মত আইও।" এইরূপ তিনবার বলিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরাও সজল নেত্রে মায়ের দিকে চাহিতে চাহিতেই গাড়ীতে বসিলাম—মোটর ছাড়িয়া দিল।

মথুরায় গিয়া গাড়ী ধরিতে হইবে। এতক্ষণ যেন ধারণায়ও আসে নাই যে মাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। মনে হইতেছিল, শুধু মা'র আজ্ঞা পালন করিতেছি, মা যাহা যাহা বলিতেছিলেন শুধু তাহাই করিয়া যাইতেছিলাম। এখন গাড়ী ছাড়িয়া দিলে যেন ঠিক উপলব্ধি হইল যে-মাকে ছাড়িয়া যাইতেছি, এদিকে মা'র শরীর বা ভাব কোনটাই ত স্বাভাবিক নয়। মা'র কাজ করিবার আমরা ত তিনজনই চলিয়া আসিলাম —উদাস, বিমলা এবং আমি। বুনি ত অসুস্থই। মা'র কৃপাতেই বাঁচিয়া আছে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতেই যাইতেছি। কখনও কিছুরই অপেক্ষা মা'র নাই। ইহা ত আর আজ নূতন নয়। তবুও চিন্তা করা আমাদের স্বভাব।

হাথরস গিয়া আমাদের মথুরার গাড়ী বদলাইতে হইবে। তাই এ পর্যন্ত মা কমলকেও আমাদের সঙ্গে দিয়া দিয়াছেন। সব দিকেই ত মা'র পুরাপুরি লক্ষ্য।

কৃপাল পিতার কাছে ভূপাল আছে। তাহার মেয়ে গুণিতাও কন্যাপীঠে

অসুস্থ কাজেই তাহাকেও তার করিয়া আনাইয়াছেন। সেও আমাদের সঙ্গে যাইতেছে।

১২ই জানুয়ারী, ১৯৬২।

আজ আমি কাশী আসিয়া পৌছিয়াছি। কাশী আসিয়া দেখি কন্যাপীঠের ৪টী মেয়ের টাইফয়েড এবং ৩টীর হাম-জ্বর হইয়াছে। চন্দন বিশুদ্ধা প্রভৃতিরও শরীর খুব ভাল নহে। উহারা যতটা পারে সেবা করিতেছে। বিমলা আসিয়াও সেবার ভার নিয়াছে। আর মা'র আদেশ অনুযায়ী ১৪।১৫টী মেয়ে নিয়া সতী বিন্ধ্যাচল চলিয়া গিয়াছে। ডাঃ মাথুর চিকিৎসা করিতেছেন। আজ এই বিপদের সময় ৺গোপালদাদা থাকিলে কি সুবিধাটাই না হইত। ডাঃ মাথুর চিকিৎসা ঔষধাদি এমন কি রোগীদের আনন্দ দিবার জন্য খেলনা পর্যন্ত কিনিয়া আনিয়াছে দেখিলাম। ইহাও সব মায়েরই কৃপা—নহিলে এভাবে রোগীদের পরিচর্যা কোন ডাক্তার করিয়া থাকে।

আমার সঙ্গেও ডাঃ মাথুরের দেখা হইল। অতি ভদ্রলোক। আশ্রমের সেবা করিতে পারিয়াই যেন নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে।

আমি কয়েকদিন কাশী থাকিয়া আরো কয়েকটী মেয়ে সুস্থ হইলে তাহাদের ও কৃপালকে নিয়া বিন্ধ্যাচল চলিয়া আসিলাম।

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৬২।

আজই আমি বিন্ধ্যাচল আসিয়াছি। পথে মোটরে বসিয়াই বিশুদার ভাই প্রেমানন্দের নিকট খবর পাইলাম আগামীকল্য শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় ও সাধন কাশী আসিতেছেন।

এখানে আসিয়া চুণির পত্র পাইলাম। পরে আবার চিত্রার পত্রও আসিল। মায়ের শরীর ঐ এক প্রকারই চলিতেছে। খাওয়াও ঐ একই প্রকার। কাশ্মিরী লক্ষ্মী (যিনি আশ্রমেই থাকেন) মা'র আদেশে, আমি চলিয়া আসিলে পর সেই রাত্রিতেই, তরকারী সিদ্ধ ও একখানা রুটী তৈয়ারী করিয়া মাকে খাওয়াইয়া দেয়। পৌষ সংক্রান্তি দিন যোগী ভাইয়ের ভাণ্ডারায় শান্তা মাকে রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছে।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৬২।

আজ পূর্ণিমার দিন, শিব ও মহাপ্রভুর ঘরে হেমিদি রান্না করিয়া শিব ও মহাপ্রভুর ভোগ দিয়াছেন। মাকেও আজ ভোগ দেওয়া হইয়াছে। মা নাকি বলিয়াছেন আজ রাত্রিতে কুমারী মেয়েরাই মহাপ্রভুর ভোগ রান্না করিবে। তাই চিত্রা ভোগের ঘরে রাত্রিবেলা লুচি ও তরকারী রান্না করিল। চিত্রা লিখিয়াছে, মাকেও উহা হইতে একটু খাওয়াইয়া দিয়াছি। আরও লিখিয়াছে ইহারই মধ্যে একদিন অনুসুয়াও মা'র বিশেষভাবে ভোগ দিয়া, মাকে একটু খাওয়াইয়া দিয়াছে।

মা ত বৃন্দাবনেই আছেন। ইহার পরের প্রোগ্রাম এখনো কিছু ঠিক হয় নাই। ভক্তরা অনেকেই আসিতেছেন, যাইতেছেন। আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সাহেব মেমও আসিতেছে।

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬২।

আজ আমি বিন্ধ্যাচল হইতে কাশীতে কণ্যাপীঠের মেয়েদের দেখিতে আসিয়াছি। দেখিলাম মা'র কৃপায় সকলেই অনেক ভাল। ডাঃ মাথুরও খুব প্রাণ দিয়াই সব সেবার কাজ করিতেছে। সকলেই বলিতেছে—৺ডাক্তার

গোপাল দাসগুপ্তের পরে আর এমন ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। সবই মায়েরই ইচ্ছা, চক্রধারীর-ই চক্র।

দেখিলাম চিত্রার এক চিঠি আসিয়াছে। চিত্রা লিখিতেছে,—"মা'র শরীর বিশেষ ভাল না। নিজের ভাবেই অনেক সময় চক্ষু বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকেন। নিজের কাজও অনেকটা নিজে নিজেই করেন, কাহাকেও কিছু করিতে বিশেষ বলেন না……ইত্যাদি।"

এবার শুনিতেছি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কাশীতে অর্দ্ধোদয় যোগ। ৫৬ বৎসর পরে এই যোগ আসিয়াছে। আবার এই সময়েই নাকি অষ্টগ্রহের মিলনে পৃথিবীর বিশেষ অমঙ্গল হওয়ারও আশঙ্কা অনেকে করিতেছেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্তই নাকি বিশেষ খারাপ। এবং এই মিলনের প্রভাব নাকি বৎসরাধিক কাল থাকিবে—জ্যোতিষিরা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আমি আজ সন্ধ্যার পূর্বেই বিন্ধ্যাচল ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন গঙ্গার উপর পন্টুন ব্রিজ থাকায় ২ ঘণ্টার মধ্যেই কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল পৌঁছান যায়।

এখানে আসিয়া দেখি মা'র ওখান হইতে ২খানা, কমলের ২খানা, পুষ্পের ১খানা ও স্বামিজীর একখানা—এই ছয়খানা পত্র আসিয়াছে। মা'র সংবাদ প্রায় একই। পুষ্প দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে—"এতদিন যাবৎ মা'র কাছে আছি, মা কত হাসিখুসী ছিলেন, কত কথা বলিতেন—এখন সে সব কিছুই নাই। সেবাও কিছুই প্রায় করিতে পারি না—নিজেই করিয়া নেন। বড়ই দুঃখ হয়"……ইত্যাদি। চিত্রাও প্রায় ইহাই লিখিয়াছে—'মা প্রায় ৯টা অবধি দিদিমার ঘরে থাকেন। তারপর সাধুদের সঙ্গে একটু প্রাইভেট

হয়, পরে অনুসূয়া একান্তে মা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকে, তার পরেই মা একেবারে চুপচাপ শুইয়া পড়েন। বিশেষ দরকারী কাজের কথা থাকিলে ২/১টা কথা বলেন, নতুবা একেবারে চুপচাপ।' প্রয়োজন হইলে কমলের সঙ্গে স্বরূপের সঙ্গে, কাজের কথা বলেন। এইসব শুনিয়া মনটা খারাপ লাগে, কিন্তু কি করিব, নিরুপায়।

কমলের পত্রেও এই ভাবের কথাই আছে। কমল লিখিয়াছে মা বলিলেন, "মেয়েরা সুস্থ হইলে ঘর-দরজা ঠিকমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া যেন বিন্ধ্যাচল হইতে মেয়েদের নেওয়া হয়। রোগীর সেবিকারা যেন সুস্থ মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা না করে। নিয়মিত সাবধান মত যেন সকলে থাকে।"

চূড়ামণি যোগের কথায় মা লিখাইয়াছেন, "সাধুরা যাহারা বিন্ধ্যাচলে আছে, ইচ্ছা হইলে যেন কাশীতে স্নানে যায়।"

আজ সন্ধ্যায় সতী, বেলু, উদাস, প্রভৃতি মেয়েরা আমার ঘরে বসিয়া মা'র কথাবার্ত্তা বলাবলি করিতেছে। সতী বলিতেছে, "একবার চিত্রা মাকে লিখিয়াছিল, 'জপে মন বসে না'। মা উত্তরে লিখাইয়াছিলেন, "উত্তাল তরঙ্গ, লবণাক্ত জল, ইহার মধ্যেই সমুদ্র স্নান করিয়া তৃপ্ত হইতে হয়।" শুনিয়া ভাবিলাম, মা ত এইরূপ কত কথাই প্রতিনিয়ত আমাদের বলিতেছেন, কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করি কই!!

জপে মন বসে না।

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আজ সকালে স্বামি পরমানন্দজীর চিঠি পাইলাম। লিখিয়াছেন—"মা ৬ই ফেব্রুয়ারী তুফান এক্সপ্রেসে বৃন্দাবন হইতে এলাহাবাদ যাইতেছেন। সেইদিন রাত্রি প্রায় ১১৷৹টায় এলাহাবাদ পৌঁছিয়া গোপালঠাকুর মহাশয়ের

আশ্রমে যাইবেন। তথায় তিনদিন থাকিয়া ৯ই ফেব্রুয়ারী সকালে বিন্ধ্যাচল যাইবেন। সেখান হইতে ১০ কিংবা ১১ তারিখে কাশী যাইবেন। কাশীতে ১২।২।৬২ হইতে ভুবনদার ছেলের জন্য ভাগবৎ করার কথা ছিল, তাহা আরম্ভ হইবে—এইরূপ কথা হইয়াছে।”

মায়ের আসার সংবাদে সকলেরই আনন্দ হইল। ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের দেহ রক্ষার পরেও তাঁহার স্ত্রী ও মেয়েরা মাকে বছরে তিন দিনের জন্য তাহাদের ওখানে নিতেছেন। গোপাল ঠাকুর থাকিতেও মা ঐরূপ যাইতেন। মা'র শরীর সুস্থ না থাকিলে, ঠিক সময় মত নিতে না পারিলেও মা'র নিকট প্রার্থনা জানাইয়া রাখেন যে যখনই মা'র সুবিধা হইবে কৃপা করিয়া যেন অবশ্যই বছরে একবার যান। এবারও মা'র শরীর খারাপের জন্য এতদিন যাওয়া হয় নাই। তাই করুণাময়ী মা বোধহয় এই সময় যাইতেছেন। আর ভুবনদার এক ছেলে, যিনি এরোপ্লেনের চালক ছিলেন,—প্লেন হইতে পড়িয়া মারা গিয়াছে। তাহার জন্যই এক ভাগবৎ হইবার কথা ছিল—এই ভাগবৎ সে উপলক্ষেই হইবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

পূর্বে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল ক্ষমার মৃত ভাইজী চুয়ার মৃত্যুর ১ মাস পূর্ণ হইবে আগামীকাল; এ উপলক্ষে কি করা? আজ টেলিগ্রামেই তাহার উত্তর আসিয়াছে—“১০৮ কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।” মা'র তার পাইয়া কাশীতে পানুর নিকট এ সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মেয়েটীর ভাগ্য যে কত ভাল, তাহাই কেবল আজ আমার মনে

হইতেছে। প্রথমতঃ ত কাশীধামে, তাহাও আবার মায়ের আশ্রমে আসিয়া মুক্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ এই এক মাস ব্যাপী তাহার জন্য, জপ-কীর্ত্তন-পাঠ নিয়মিত হইতেছে। তদুপরি আবার এই বিশেষ দিনে এই ১০৮ কুমারী ভোজন। পূর্বে যে মেয়েটী মারা গিয়াছিল, তাহারও ঠিক এরূপই ব্যবস্থা হইয়াছিল। মায়ের চরণে আসিয়া পড়িলে তাহার কি আর একটা গতির ব্যবস্থা না হইয়া পারে। কিন্তু, এমনই আমাদের জীব-স্বভাব যে কিছুতেই মায়ের শ্রীচরণে আশ্রয়ের রুচি হয় না।

মায়ের চরণে স্মরণ নিলে গতির ব্যবস্থা হবেই।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আজ অর্দ্ধোদয় যোগ। এই উপলক্ষে সাধুরা এখানেই গঙ্গা স্নানাদি করিলেন। বেলু ত সব মেয়েদের নিয়া সময় মত গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। যোগ ছিল বেলা ১২টা হইতে বৈকাল ছয়টা পর্যন্ত।

অর্দ্ধোদয় যোগ।

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

বেলু বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ের নীচেই একটী ছোট্ট বাড়ী করাইয়াছে। সেই বাড়ীতেই নিত্য সে ভোরে চলিয়া যায়, স্নান পূজাদি সারিয়া আবার উপরে, আশ্রমে চলিয়া আসে। এইরূপই বৈকালেও মেয়েদের সঙ্গে নিয়া একটু বেড়াইয়া, সন্ধ্যার পূর্বে তাহার বাড়ীতে চলিয়া যায়, এবং পূজাদি সারিয়া আবার সন্ধ্যার পরে চলিয়া আসে।

একটী অলৌকিক ঘটনা।

আজ সকালে পূজাদি করিয়া প্রায় বেলা ৯ টায় বেলু উপরে আসিয়া আমাকে বলিতেছে,—"তুমি আমার নিকট কাহাকে পাঠাইয়াছিলে, আমাকে গঙ্গা স্নান করিবার কথা বলিয়া?" তাহার কথা শুনিয়া আমি ত অবাক! বলিলাম,—"আমি ত কাহাকেও পাঠাই নাই। কি ব্যাপার!"

তখন বেলু ঘটনাটী বলিল। ঘটনাটি এই:—

"আজ ভোরে নিচে নামিয়াই দেখি, আমার বারান্দায় একটী স্ত্রীলোক একটী বাচ্ছা কোলে নিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই হিন্দীতে বলিল,—"দিদি আমাকে পাঠাইয়াছে যে আপনি যেন আজ গঙ্গা স্নান করিয়া যান।"

ইহা বলিয়াই বেলু বলিতেছে, "আমি আজ ১৭।১৮ বৎসর ধরিয়া এখানে আছি। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটীকেও আমি কখনো দেখি নাই, চিনিও না।" যাহা হউক, বেলু আবার বলিতেছে,—"তখন আমি তাহাকে বলিলাম,—"দিদি কি করিতেছে?" সে বলিল, "জপ করিতেছে।"

আশ্চর্যের বিষয়, আমি ঐ সময় জপই করিতেছিলাম, কিন্তু ইহা কেহই জানে না।

বেলু আবার বলিল,—"জ্যোতিষিরা বলিয়াছিল আমার এই সময়টা খুব খারাপ। তাই স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়াই মনে হইয়াছিল 'মৃত্যু, গঙ্গায় টানিয়া নিতেছে না ত?' যাক্, আমি তাহাকে বলিলাম,—'আচ্ছা তুমিও সঙ্গে চল।'

সে বলিল,—"আচ্ছা তবে, এই বাচ্ছাটীর অসুখ তাহাকে 'ঝাড়-ফুস্' করাইতে আমি এই গ্রামে একজনের কাছে নিয়া যাইতেছি। আমি এখনই আসিতেছি।"—এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেল। আমি গঙ্গায় গিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভাবিলাম, 'যাহা হয় হইবে নামিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম।'

আসিবার পথে স্ত্রীলোকটী যে গ্রামটী দেখাইয়াছিল, সেই গ্রামে গিয়া এইরূপ একটী স্ত্রীলোক বাচ্ছা কোলে নিয়া আসিয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। কয়েক জায়গায় খোঁজ করিয়াও তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলাম না।"

বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। ইহার মধ্যে কী রহস্য কে জানে!!

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

কাল রাত্রি ১১॥ টায় মা'র এলাহাবাদে পৌছিবার কথা ছিল।

আজ দেখি বেলা প্রায় ১১ টার সময় জয়পুরিয়াদের মোটর গাড়ী বিন্ধ্যাচল আসিয়া উপস্থিত। মোটর ড্রাইভারের হাতে বিন্দুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে বিন্দু লিখিতেছে,—"মা কাল রাত্রিতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। মা বলিলেন, এই গাড়ীতে আপনি, চিন্ময়দা ও অরুণা দিদি চলিয়া আসিবেন। আর কাহারও আসিবার দরকার নাই।"

এলাহাবাদে মা।

ঐ পত্র পাইয়া ১॥/২ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলাম। গিয়া দেখি মা'র শরীর বিশেষ খারাপ। মা শুইয়াই আছেন। একটী বিশেষ কাজে আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই কানপুর রওনা হইয়া গেলাম। দেখিলাম মা'র সঙ্গে মেয়েরা কেহই আসে নাই। শুধু সঙ্গে আছে হেমিদি এবং লক্ষ্মীজী। শুনিলাম কমল টুণ্ডলা পর্যন্ত আসিয়াছিল, তাহাকেও ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছেন। জিতেনদা রাস্তা হইতে মা'র সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তিনিই মাকে এলাহাবাদ পৌছাইয়া, তখনই কানপুর ফিরিয়া গিয়াছেন। মায়ের চেহারা ও শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল না। কিন্তু তবুও বাধ্য হইয়া কানপুর যাইতেই হইল। রাত্রি প্রায় ৯টায় কানপুর পৌছিলাম।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আজ জিতেনদা বেলা প্রায় ৪টার সময় এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও বলিতেছিলেন যে মথুরা স্টেশনে মা'র সঙ্গে যখন দেখা হইল, তখন মা'র অবস্থা দেখিয়া তিনি বড়ই ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। মা'র যেন মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, চোখের দৃষ্টিও যেন কেমন দুর্বলতায় ভরা—এরূপ যেন আর কখনো দেখেন নাই।

যাক্ এখানকার কাজ সারিয়া আবার রাত্রি ৮॥৹টার ট্রেনে আমি এলাহাবাদ ফিরিয়া চলিলাম। রাত্রি প্রায় ১২॥৹টায় মা'র নিকট ৺গোপালঠাকুর মহাশয়ের আশ্রমে পৌঁছিলাম। আসিয়া দেখি মা শুইয়া শুইয়া কাহারো কাহারো সঙ্গে ২।১টি কথা কহিতেছেন। সুবোধ ও বিন্দু আমাকে স্টেশন হইতে নিয়া আসিয়াছে। তাহারা মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা আমাকে বলিলেন, "দিদি, তুমি দিদিমা ও সকলকে নিয়া কাল সকালে কাশী চলিয়া যাও। এই শরীর যদি ঠিক থাকে তবে ২।১ জনকে নিয়া বিন্ধ্যাচল হইয়া কাশী যাইবে।" সুবোধ ও বিন্দুকে তাহাই বলিয়া দেওয়া হইল। আমিও বলিলাম,—"তুমি যাহা বলিবে তাহাই হইবে।" কাশীর জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া, মা'র সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

মা আজ প্রায় সকাল ৮টায় জয়পুরিয়াদের মোটরে বিন্ধ্যাচল রওনা হইলেন। সঙ্গে লক্ষ্মী, হেমিদি ও চিণ্ময় গেল। আমরা দিদিমাকে নিয়া সকাল ৯টার গাড়ীতে কাশী রওনা হইলাম।

বিন্ধ্যাচলে মা।

মা প্রায় বেলা ৯॥•টায় বিন্ধ্যাচল পৌঁছিলেন, আর আমরা ১২টায় কাশী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

বিন্ধ্যাচল হইতে ফোন আসিল মা আজ বেলা ১১টায় রওনা হইয়া গিয়াছেন। এখান হইতে বিজয়নগরমের রাজমাতা মোটর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, মা তাহাতেই আসিলেন। বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী প্রায় ২ ঘণ্টার পথ। কাজেই ১টা হইতেই আমরা অপেক্ষারত।

অসুস্থ শরীর লইয়াও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে মায়ের কাশী আগমন।

সংবাদ পাওয়া গেল মা আসিবার পথে প্রথমে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজজীর বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন, পরে শ্রীযুক্ত কালীদাদাকে দেখিয়া আসিবেন। ইনিও দীর্ঘদিন ধরিয়া অসুস্থ। মাকে দেখিবার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

মা'র এবার এসময়ে কাশী আসার কারণ এইগুলি। অবশ্য ইহা ছাড়া আরো কারণ আছে। ভুবনদার মৃত পুত্রের জন্য ভাগবৎ করাইবেন, তাহার ইচ্ছা তাহা শ্রীমায়ের সম্মুখে কাশীতেই হয় তাহাও এই ১১ই, অর্থাৎ আগামী কালই হইবার কথা। তাই করুণাময়ী মা ভক্তদের এই সব বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই এইরূপ অসুস্থ শরীর নিয়াও এখানে আসিতেছেন। আর সকলকে ত বৃন্দাবনই রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ হইল চুয়ার মৃত্যু উপলক্ষে ১০৮ কুমারী ভোজন।

যাহা হউক কিছুক্ষণ পরেই মা আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। আশ্রমে ঢুকিয়াই মা আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটু সময় বসিলেন। ঐ সময় মুক্তিবাবা, নারায়ণ স্বামিজী প্রভৃতি মা'র নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ঐ স্থানে বসিয়াই মা'র সঙ্গে উহাদের কিছু কথা হইতেছে। অর্দ্ধোদয় যোগের কথায় কথা উঠিল যে এবার যে এতদিন যাবৎ জ্যোতিষিরা বলিতেছিলেন যে অষ্টগ্রহ একত্রিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় প্রলয় হইবার সম্ভাবনা হইবে—তাহার কী হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ও নাকি সপ্তগ্রহ একত্রিত হইয়াছিল, আর এবার ত অষ্টগ্রহ। কাজেই সেই সব কথা শুনিয়া সকলেই ত আতঙ্কে অস্থির। এমন কি বড় বড় Factory, Mill আদিও অনেক বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কারণ কর্ম্মীরা সব যার যার বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের নিকট একত্রিত থাকিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। ৩।৪।৫ ফেব্রুয়ারী – এই তিন দিনই বিশেষ আতঙ্কের দিন ছিল। এই তিন দিন এই ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া বহু স্থানে স্থানে যজ্ঞ, জপ, কীর্ত্তন পাঠাদি চলিতেছিল। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক প্রতিটি লোকের কানে ভগবৎ-নাম-কীর্ত্তন অনবরত ঢুকিতেছিল, অথচ কিছুই হইল না। কাজেই এইসব করিয়া কী হইল?

অর্দ্ধোদয় যোগের ফল।

মা এইসব কথা শুনিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"বহুদিন পূর্বে একবার এই শরীরের খেয়াল হইয়াছিল যে এমন একটা অবস্থা আসিলে বেশ হয় যে বহু লোক প্রাণ দিয়া একই সময়ে তাঁহাকেই ডাকে। এই অষ্টগ্রহ-সম্মিলনের আতঙ্কে দেখিলাম তাহা ফলিয়া গেল। একই সময়ে বহু লোক প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ডাকিতে বাধ্য হইল।"

মা'র এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং মা'র কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আজ ভাগবৎ পাঠের মাহাত্ম্য আরম্ভ হইল। মা অসুস্থ শরীর নিয়াও কিছুক্ষণ পাঠে যাইয়া বসিয়া আসিলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আজ ভাগবৎ পাঠ আরম্ভ হইল। মা'র শরীর খুবই অসুস্থ, তবুও আরম্ভের সময় গিয়া মা একটু সময় সেখানে বসিয়া আসিলেন। আর অবশিষ্ট সময় মাকে নিজের ভাবে, চুপচাপ থাকিতে দিবার চেষ্টা করা হইল।

পাঠ যথারীতি আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে পাঠক শ্রীনিত্যানন্দজী পাঠ করিতে আসিয়াছেন। আজই আবার ডাঃ মাথুরের বাড়ীতেও পাঠ আরম্ভ হইল। সেখানে পাঠক বৃন্দাবনের শ্রীনাথ শাস্ত্রী। তাহাদের খুবই আশা এই উপলক্ষে মা যদি একবার তাঁহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেন।

কাশীতে ভাগবৎ সপ্তাহ।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

মা আজ দুপুরে শুইয়া আছেন। মা'র ঘরে একমাত্র আমি বসিয়া আছি। হঠাৎ মা আমাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আজ অনেক সময়ই সোলনের রাণীকে দেখিতেছি। বৃন্দাবনেও একবার দেখিয়াছিলাম। তখন যোগীভাইকে সঙ্গে নিয়াছিল। কিন্তু আজ দেখিলাম যোগীভাই সঙ্গে নাই। কি হইয়াছিল জানিস্? রাণী বৃন্দাবনে আসিয়া বলিতেছে, 'আমার ঊর্দ্ধদিকে যাওয়ার যেন একটু বাধা হইতেছে, কি করি?"

"এই শরীর কিছুই জবাব না দেওয়ায় সে চলিয়া যাইতেছিল তখন বলা হইল, "বস"। সে বসিল। তখন যোগীভাইকে দেখা গেল। কাল কিন্তু আর যোগীভাই সঙ্গে নাই। ইহার কারণ কি বুঝলি, না?" আমি বলিলাম—"না।"

মায়ের সান্নিধ্যের ফলে ঊর্দ্ধগতি লাভ।

মা—"পূর্বে যোগী ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধনটা কাটাইয়া যাইতে

পারিতেছিল না, তাই ঐ কথা বলিয়াছিল। এবার আর যোগীভাই সঙ্গে নাই, অর্থাৎ সেই সংযোগটা উর্দ্ধদিকে যাইতে পারিয়াছে।"

আমি ব্যাপারটা স্পষ্টতঃই বুঝিলাম,—"তোমার কাছে বসিয়া উপদেশ নিয়া গেল, তাহাতেই তাহার বন্ধন কাটিয়া উর্দ্ধগতি হইল।"

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আজ রাত্রিতে ডাঃ মাথুর মা'র দর্শনে আসিয়াছেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন,—"গোপাল বাবা চলিয়া যাওয়ার পর ত আর এখন ডাক্তার এখানে কেহ ছিলই না। বৃন্দাবনে একদিন খেয়াল হইতেছিল, কুমারী মেয়েরা ভগবতীরই সব রূপ তো,—কন্যাপীঠে এতগুলি মেয়ে, কিছু হইলে ত তেমনভাবে চিকিৎসাদি করিবার উপস্থিত কেহ বাহিরের দিক হইতে দেখা যায় না—তার পরই সংবাদ গেল এতগুলি মেয়ে অসুস্থ। আর ইহাও খবর গেল 'ডাঃ মাথুরকে ডাকা হইয়াছে এবং দুই ভাই-ই প্রাণ দিয়া সেবা করিতেছে।'

ইহা বলিয়াই মা ডাঃ মাথুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,— "তুমি ভগবান, কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে সেবার জন্য!" ইহা বলিয়া মা হাসিলেন। ডাঃ মাথুর হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—"মা আমি ত ছিলামই।"

ডঃ মাথুর

মা বলিলেন,—"হ্যাঁ ছিলেই ত। কিন্তু এই ভাবে ত প্রকাশ হইলে!"

এই মাথুরদের পরিবার অনেকদিন যাবৎ-ই মা'র কাছে যাওয়া আসা করিতেছেন। এখন তাহাদের বাড়ীতে ভাগবৎ পাঠ হইতেছে, পূর্বেই লেখা হইয়াছে। তাহাদের বিশেষ ইচ্ছা, এ উপলক্ষে মা যদি একবার তাহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। কিন্তু কিছু বলিতে সাহসও পাইতেছেন

না। অবশেষে মাকে প্রার্থনা করিতেই মা বলিতেছেন,—"বেশ ত তুমি শরীর ঠিক করিয়া নিয়া যাইতে পারিলে নিয়া যাইবে।"

সে বেচারা আর কি করে মায়ের চরণেই মা'র আরোগ্যের প্রার্থনা জানাইয়া চলিয়া গেল। ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু মাও তাহাকে আশ্বাস দিলেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আজ বৈকালে ডাঃ মাথুর আসিয়া মাকে তাহাদের বাড়ী নিয়া গেলেন। সেখানে শ্রীনাথ শাস্ত্রী পাঠক। বহুলোক উপস্থিত। ইহারা পূর্ব হইতেই বিশেষভাবে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং মা উপস্থিত হইলে, সকলেই আপন আপন আসনে বসিয়াই মাকে প্রণাম করিল। উহাদের বাড়ীর অনেকেই মাকে আরতি করিল। শ্রীনাথজীর প্রার্থনায় মা পাঠের সমাপ্তি পর্যন্ত তথায় উপস্থিত রহিলেন। ডাঃ মাথুরের পিতা একখানি কাগজ আপন হাতে আনিয়া মা'র হাতে দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

"ভগবান কী দয়া হ্যায়, কি কুয়া প্যাসে কে পাস আ গয়া হ্যায়।
কুয়া প্যাসে কা পাস আয়া। অব কৃপা করকে জল ভী কণ্ঠকে নীচে উতারিয়ে, যাহাঁ প্রাণ, অপান, উদান সব হি আটকে হুয়ে হ্যায়, আউর বহুৎ ব্যাকুলতা হ্যায়।"

মা সেখান হইতে ফেরার পথে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বাবু এবং কালীদাদার বাসা হইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

আজ মা দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন। স্টেশনে যাইবার পথে আমাদের আশ্রমের এক কর্মী সুরেশ বাবুর বাসা হইয়া গেলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন—এই কারণেই মা তাহাকে দেখিয়া গেলেন।

যাইবার সময় মা আর কাহাকে কাহাকে নিয়া কবে আমাকে দেরাদুন পৌঁছিতে হইবে তাহা বলিয়া গেলেন।

২রা মার্চ, ১৯৬২।

সংবাদ পাইলাম মা হরিদ্বারে রাজাসাহেবের "বাঘাট হাউসে" আছেন। সুতরাং আমি কাশী হইতে রওনা হইয়া আজ "বাঘাট-হাউসে" মা'র চরণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম মা দেরাদুনে কয়েকদিন থাকিয়া এখানে আসিয়াছেন। দেরাদুনে মৌনী মা অসুস্থ অবস্থায় আছেন—মা সেখানে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। মা'র শরীরের অবস্থা একই প্রকার দেখিতেছি কিন্তু করিবার কিছুই নাই—কিছুই শক্তি নাই। শুধু দুশ্চিন্তাই করিতে পারি।

হরিদ্বারে মা

৪ঠা মার্চ, ১৯৬২।

আজ শিবরাত্রি। কুম্ভেরও আজ প্রথম স্নান। এইবার হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ। সকাল হইতেই আকাশে মেঘ ছাইয়া আছে, ঠাণ্ডা বাতাসও খুব বেগে প্রবাহিত হইতেছে। মা'র শরীরের ভাবটাও দেখিতেছি খুবই এলোমেলো।

হরিদ্বারে শিবরাত্রি ও পূর্ণ কুম্ভ

মা সকলকে সাবধানমত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে এবং সাধুদের প্রোসেশন দেখিয়া আসিতে বলিলেন। প্রথমে মেয়েরা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম আজ ভীড় বেশী নাই, কাজেই মেয়েরা মহানির্বাণী আখড়ার প্রোসেসন ভালভাবেই দেখিয়া আসিয়াছে। ঐ সময় সব মণ্ডলেশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বরগণ ধ্যান করিতেছিলেন।

এই সব শুনিয়া মা বলিতে লাগিলেন,—"বহু বৎসর পূর্বে যোগীভাই এ শরীরকে একবার কুম্ভের স্নান দর্শণ করাইয়াছিল। এক রাত্রির জন্য ৬০০৲ টাকা দিয়া গঙ্গার উপরে একটা ঘর (৫ তলার ওপরে) নেওয়া হইয়াছিল সে কী দৃশ্য।—বিরাট ভাবের খেলা—সকলেই একমুখী হইয়া অগ্রসর হইতেছে। ভোলানাথও এক পূর্ণ কুম্ভের সময়ই দেহরক্ষা করিয়াছেন।

আমরা 'বাঘাট-হাউসেই' আছি। এখানেই এবারে মা'র উপস্থিতিতে শিবরাত্রি হইবে। মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীভাবে মণ্ডলি করিয়া সকলে পূজা করিতে বসিবে, তাহা বলিয়া দিলেন। সেই অনুসারে মেয়েরা সব সাজাইয়া নিল।

যথাসময়ে নির্বাণই সকলকে চারি প্রহরের পূজা করাইল। মা'র জন্য সুন্দর করিয়া একটি বেদী সাজাইয়া, মা'র আসন বিছাইয়া রাখা হইয়াছিল। মা প্রথম প্রহরের পূজার সময় আসিয়া সেখানে বসিয়া সকলের পূজা দেখিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় প্রহরের পূজারও কিয়দংশ দেখিয়া, শরীরটা ভাল না থাকায়, মা উপরে চলিয়া গেলেন। চতুর্থ প্রহরের পূজার পর সকলে ব্রতকথা শুনিয়া প্রায় ভোর ৫টায় গিয়া মাকে প্রণাম করিল।

৫ই মার্চ, ১৯৬২।

আজ সোমবার। আজিও অনেকক্ষণ চতুর্দ্দশী তিথি ছিল। মা আশ্রমের অনেক সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারি ও ব্রহ্মচারিণীকে রামেশ্বরের বিভূতি দিয়া ত্রিপুণ্ড্রক দিয়া দিলেন। দিয়া বলিলেন,—"এই শরীরের এই শিবপূজা হইল।"

৭ই মার্চ, ১৯৬২।

আজ যোগানন্দ আশ্রমের ক্রিয়ানন্দ নামক সাধুজী আসিয়াছেন। মা তাহাকে কোন কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, "তোমাদের যেমন এ শরীরের সঙ্গে খোলা ব্যবহার, তেমনই এ শরীরেরও খোলা কথাবার্ত্তা।" মা আবার বলিতেছেন, "সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে স্বয়ং কল্পিত—গাঁঠ বাঁধা, চরম স্থানে পৌঁছালে তখন গাঁঠ খুলে যায়—দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে যাওয়া।"

মা আজ বুনি ও কয়েকটী মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে নাকি বলিতেছিলেন যে মা যেন স্বপ্নে দেখাইলেন, কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। মা সব মেয়েদের ব্যবস্থা করিয়া ওখানেই রাখিয়া আসিয়া ছিলেন, আবার ট্রেনে উঠিয়া মা'র যেন একটা "হ্যাচকা টান"—কমলকে ডাকিয়া অর্দ্ধেক পথ হইতে বৃন্দাবনে ফেরৎ পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন সকলকে নিয়া তাড়াতাড়ি দেরাদুন চলিয়া যাইতে। কিন্তু এলাহাবাদে পৌঁছিয়া যখন পরমানন্দ মায়ের নিকট বলিয়াছিল যে "বুড়ীরা এই ঠাণ্ডায় দেরাদুন যাইতে চাহে না", তখন মা বলিয়াছিলেন, "তবে থাক্।"

একটি দুর্ঘটনার পূর্বাভাস।

এখন আমাদের মনে হয় যদি সকলে তখন দেরাদুন চলিয়া যাইত তবে পুষ্পর মায়ের গুহাতে ঐ দুর্ঘটনা ঘটিত না। মা বলেন,—"কখনো কখনো ঘটনা স্পষ্ট হয়—আবার কখনো পূর্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে—সবই সম্ভব। যদি পাকা খেয়াল এসে যায় যে এটা করতে দেওয়া হবে না, তবে সেটা অকাট্য। তা ঘটবে না। তবে সব সময় সে রকম পাকাপাকি খেয়াল আসে না। অনেক সময় এও জানা থাকে যে ওরা মানতে পারবে না—যা হবার হয়ে যাচ্ছে।"

ঘটনা পূর্ব নির্দ্দিষ্টও থাকে সৃষ্টও হয়।

পুষ্পর মা বৃন্দাবনে কয়লার গ্যাসে বন্ধ গুহাতে অজ্ঞান অবস্থায় সারা রাত পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সে যে মরিয়া যায় নাই, ইহা একমাত্র মায়ের কৃপাতেই সম্ভব হইয়াছে। মা তাহাকে পুনঃ পুনঃ ঐ গুহাতে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভুল বোঝার জন্য তিনি সেই গুহাতেই রহিয়া গিয়াছিলেন।

মা আবার বলিতে লাগিলেন,—"কখনো এমন হয় যে আমিই সব ব্যবস্থা করছি, আবার আমিই সব তখনই বদলাচ্ছি। কোন বন্ধন ত নাই—এখনই জানলা বন্ধ করো আবার এখনই খোল।—তোমরা হয়ত অবাক —হয়ত সূক্ষ্মে কোন মহাত্মার প্রবেশের জন্য ঐরূপ করা হইল"—এই কথা বলিয়াই মা কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—"দিলীপ রায়ের বিষয়ে সূক্ষ্মে কোন ঘটনা আজ দুপুর বেলায় দেখা গিয়াছিল, সে বিষয়ে এখন খেয়াল হইল।"

মায়ের কোন বন্ধন নাই।

৮-ই মার্চ, ১৯৬২।

মা একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, "এ সেদিন বড় সুন্দর নিষ্ঠার কথা বলিয়াছিল।"

এ কথা শুনিয়াই আর একজন বলিয়া উঠিলেন,—"নিষ্ঠা বড় না লক্ষ্য বড় ?"

মা—"রাস্তায় স্থিতি হিসাবে এই বড় ছোটর কথা। গুরু

যেখানে যাহাকে যে আদর্শ লক্ষ্যের জন্য বলিয়াছেন, যে জাতীয় ক্রিয়া দিতে এক লক্ষ্য দিতে এক লক্ষ্য হওয়ার জন্য, সর্ব আদর্শ উহাতেই নিহিত থাকে না কি? শিষ্য যখন একনিষ্ঠ হইয়া এক লক্ষ্যে চলিতে থাকে, সেইখানে আদর্শ লক্ষ্য কোথায় থাকে না। শিষ্যকে প্রথম যখন গুরু বলিয়া দেন, সে তখন এত শত ধরিতে পারে না, গুরুর আদেশ যথাশক্তি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া যায়। গুরুর আদেশে লক্ষ্য পূর্ণের জন্য যে চলা তাহাকেই নিষ্ঠা বলে। একটা হইল ক্রিয়া ভোগ, আর একটা হইল ক্রিয়া যোগ ক্রিয়া ভোগের দিক ত জানই। ক্রিয়া যোগের পথে যিনি চলেন, তিনিই মুক্তির রাস্তায়। ক্রিয়া মানে কিন্তু সব দিকেই ক্রিয়া—অবশ্য রকমারী আছে। জপ, স্মরণ, ধ্যান, পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, সেবা, হঠযোগ, রাজযোগ, ক্রিয়া যোগ, মন্ত্র যোগ, প্রাণায়াম যজ্ঞাদি সবই ত ক্রিয়া। যিনি যে ধারা পান, সেই ধারায়-ই নিত্য যুক্ত হইয়া ঐ ক্রিয়াদিতে ক্রিয়া, মুক্তি চেষ্টায়। নিত্য মুক্ত, অতীত, অনতীত যেখানে সেখানে প্রশ্নই ওঠে না। প্রথম ক্রিয়া যুক্ত হওয়া একনিষ্ঠ হইয়া (যে ধারায়ই হোক) তবে ত ক্রিয়া মুক্ত। যোগী মানে নিত্য যুক্ত। আর নিত্যযুক্ত যেইখানে, এই মুক্তিও সেইখানে।"

নিষ্ঠা বড় না লক্ষ্য বড়। ক্রিয়া যোগ আর ক্রিয়া ভোগ।

আবার ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন যে, মা যেইবার প্রথম ঢাকা হইতে হরিদ্বারে আসেন তখন হরিদ্বারের পূর্ব দৃশ্য দেখেন। মা দেখেন,—চতুর্দ্দিকে শান্ত আবহাওয়া, ঘাস, জঙ্গল, ঝুপড়ী, দুই একটা কুটিয়া, নদীর সরু ধারা—চতুর্দ্দিকে বড় বড় পাথর, জনহীন, নিঃসঙ্গ। মা আবার বলিলেন,—"অনেক জায়গায় গেলে আবার সেখানকার মুল ছবি পরিস্কার দেখা যায়। যখন সিমলা কালী

বাড়ীতে যাই তখন সেখানকার পূর্ব আমলের ছবি, কার দ্বারা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত সব দেখা হয়েছিল।”

বিস্তৃত দৃষ্টি মা।

আবার অন্য কোন কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—“তোমাদের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য যে রূপটা শ্বাসের গতি হওয়া দরকার সে রূপটা হচ্ছে না—তাই তোমাদের দৃষ্টিতে খারাপ। নয়তো যেমন ভাবে চলা চলছে তো। এ শরীরের আবার অসুস্থতা কি? যা হবার হচ্ছে।”

মায়ের আদেশ পালন করা সম্বন্ধে মা বলিতেছিলেন, “এ শরীরের যা করবার করেই যাবে; তোমাদের সে আদেশ শোনা না শোনার অপেক্ষা রাখে না। তালা বন্ধ থাকলেও তো কতবার বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হয়। আদেশ পালন না করলেও এ শরীরের সে জন্যে দুঃখ, অভিমান, রাগ কিছুই আসে না। জীব-স্বভাব—ওদের তো দোষ নাই। তবে বার বার আদেশ রক্ষা না হ'লে কখনো বলা হয়—'তুমি তো কথা শুনবে না—বলা আসছে না।

মায়ের আদেশ পালন করা সম্বন্ধে মায়ের উক্তি।

১১ই মার্চ, ১৯৬২।

আজ বিকালে মা মহেশ্বরানন্দজীর Camp-এ গেলেন। সেখানে একটী স্ফটিক নির্মিত শিব দেখাইবার জন্য মাকে নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। ফেরার পথে মা কনখলে নিতাইএর বাড়ীতে মৌনিমাকেও দেখিয়া আসিলেন।

আজ রাত্রিতে আবার মা'র ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নানান কথাবার্ত্তা হইল। কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন যে বহু বৎসর পূর্বে মা একবার ঢাকায়

ক্ষেত্রবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। রাত্রিতে মা ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রীর পাশে শুইয়াছিলেন। কিন্তু মা'র শরীরে ত অধিকাংশ লীলার খেলা রাত্রিতেও চলিত। মা ভাবিলেন সকলে শুইয়া পড়িলে যেমন মা'র শরীরটা বসিত তেমনই বসিবে। এদিকে ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী মা'র সেই ভাবাবস্থা দেখিয়া নিজেও ভাবে মগ্না। ঐ সময় মা'র খেয়াল হইল—"একই সময় বিশ্বময় সকলেই প্রাণ দিয়া ভগবানকে ডাকিতেছে, এইরূপ হইলে কেমন হয়?" অষ্টগ্রহের সমাবেশে সেদিন ঠিক এই ব্যাপারটাই হইয়া গেল।

১২ই মার্চ, ১৯৬২।

আজ রাত্রিতেও ব্রহ্মচারীদের নিকটে মা অনেক কথা বলিলেন। একটা কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—"যেটা করা, তা ভাল করে করা। করতে করতেই রস বোধ হয়।"

যাহা করা ভালভাবে করা।

আবার কি কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—"এ শরীরের কাছে তোমরা পরমানন্দের খোঁজে আসিয়াছ, এ শরীর উপলক্ষ্য করে দুঃখ হয়, এটা এ শরীরের খুব ঠিক লাগে না। তাই অনেক সময় বলা হয়, তোমাদের যদি কোন কথা শুনে মন খারাপ হয় তোমরা এসে এ শরীরকে স্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিও—'মা, তুমি কেন এরূপ বলেছিলে বা করেছিলে।' নিজেরা বিপরীত কিছু ভাবিয়া নিলে শরীরের উপরেই দোষ পড়ে। অবশ্য জীব স্বভাব তো—এ শরীর বোঝে যে তোমাদের দোষ নাই—তোমরা হাসিমুখে আনন্দে থাকো, গম্ভীর মুখ দেখিলে এ শরীরের ঠিক লাগে না। সংসারে সর্বত্র ত এটা,

করুণাময়ী মায়ের করুণা।

সেটা নিয়া দুঃখ আছেই—এখানে আসিয়াও কেন মন ভার মুখ ভার করিয়া থাকা।

সেবার শুকতালের সংযম সপ্তাহে, সপ্তাহ শেষ না হইতেই তিনজন তোমাদের আশ্রমের সন্ন্যাসী বৃন্দাবনে চলিয়া যায়। এত বিরাট উৎসব—আর তারা সমাপ্তির পূর্বে চলে গেল। এ শরীর শুনেছে যে তারা নাকি পরে বলেছিল যে মা মানা করলে যেতো না। মানা কেন করবে?—উৎসবের পুরা দায়িত্ব কি একা পরমানন্দের? মা কি শুধু তারই? তারই কি সর্বদা সব বোঝা বহন করতে হবে? তোমাদের কি কোনই দায়িত্ব নাই?"

"পরে বৃন্দাবনে আসিয়াও এ শরীর শোনে যে কোন কথা প্রসঙ্গে কয়েকজন সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল, 'আমরা নিজের পথ দেখব।' তখন এ শরীরের, নিম গাছ তলায় হাঁটিতে হাঁটিতে, কী রকম যেন বলার ঢং আসিয়া গেল—এ-রূপটা আর হয় নাই। এ শরীরটা বলিল,—'বেশ, তোমরাই ত এ শরীরকে ছুটি করে দিচ্ছ। তোমাদের কাছে এ শরীর নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। তোমাদের জন্যই এ শরীর। তোমরা যখন বলতে পারলে, যে যার পথ দেখবে, তখন এ শরীরেরই বা কে কার! তোমাদের আশ্রম, তোমাদের মন্দির, তোমাদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর। এ শরীরের তো কোন বন্ধন নাই—সে উড়াপাখী। তোমাদের আশ্রমে ঢোকে বেরোয়। তোমাদের আশ্রম তোমরা চালাবে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার সময় এ শরীর সর্বদা বলে থাকে,—'ঠাকুর তোমার ব্যবস্থা তুমি করে নিও; এখানে তো কোন বন্ধন নাই।' একবার যদি পাক্কা খেয়াল এসে যায়, কাঁদা-কাটি কোন কিছুতে একে রাখতে পারবে না,—একবার যদি বেরিয়ে পড়ে, কেউ ফেরাতে পারবে না, একদম খোলা রাস্তা।"

মা'র কথাগুলি শুনিয়া আমাদের ত সকলের ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল,

অনেকের চোখেই জল। মা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় এই কথাগুলি বলিয়াই 'হা' 'হা' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপরে আবার মা বলিলেন,— "এসব শুনে সন্ন্যাসীরা বলেছিল, 'মা আমাদের ক্ষমা কর। আমরা তোমার আদেশ মত চলার চেষ্টা করব।' তারপর থেকে উহারা এ শরীরের কাছে এসে কিছু সময় নিজেদের ভাবে বসিত।"

গত ১১ই মার্চ হইতে এখানে ভাগবৎ সপ্তাহ চলিতেছে। গোপালঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যা রেণুদি তার স্বর্গীয় পতিদেবের আত্মার উর্দ্ধগতি কামনার্থে ভাগবৎ করাইতেছেন।

১৭ই মার্চ, ১৯৬২।

আজ বাঁধ হইতে হরেকৃষ্ণের চিঠি আসিয়াছে। শ্রীহরিবাবা এখন বাঁধেই আছেন। হরেকৃষ্ণের পত্রে জানা গেল যে এই বৎসর বাবার উপস্থিতিতে দোল পূর্ণিমাতে মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। মা'র শরীরটা কিছুদিন যাবৎই খারাপ যাইতেছে, হরিবাবা ইহা জানেন। কাজেই মাকে বাঁধে নিবার জন্য পত্রে তিনি বিশেষ অনুরোধ প্রকাশ করেন নাই এবং তিনি লিখাইয়াছেন, 'মা'র যাতে আনন্দ তাই যেন মা করেন।'

১৮ই মার্চ, ১৯৬২।

আজ অতি ভোরেই মা পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া কি যেন বলিলেন।

দোলপূর্ণিমাতে মা'র বাঁধ যাত্রা।

সকাল হইতেই মা'র হাব ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল বোধ হয় মা কোথাও যাইবেন। আজই ভাগবৎ সমাপ্তি। মা'র কথানুযায়ী আজই যজ্ঞ ও পূর্ণাহুতির সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যথাসময়ে মা ব্রহ্মচারীদের ঘরে খাইতে গেলেন। খাওয়ার পরে উঠিতে উঠিতেই মা বলিলেন, "আমি আজ বাবার কাছে যাব।" এই বলিয়াই ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শুনিলাম মা'র সঙ্গে কেবল পরমানন্দ, হেমিদি ও লক্ষ্মী যাইবে। মা আমাকে বলিলেন,—"দিদি, তুমি থাক—সব দিকটা না হইলে সামলাইবে কে?"

ভাগবৎ ব্যাখ্যা ৬টায় সমাপ্ত হইল। শান্তিজল এবং আনুসঙ্গিক যা যা করণীয় সব সারিয়া ফেলা হইল। দোলেতে মা এখানে থাকিবেন না, ইহাতে অনেকেরই মন খারাপ হইয়া গেল। যাইবার পূর্বে মা অনেককে আবীরের টিকা পরাইয়া দিলেন।

মা ৭টায় বাঁধে রওনা হইয়া গেলেন।

২৩শে মার্চ, ১৯৬২।

আজ সকালে কেশব বাঁধ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট শুনিলাম যে আজই মা ৪টার সময় বম্বে এক্সপ্রেসে দেরাদুন যাইতেছেন। ঐ গাড়ী হরিদ্বার স্টেশনে ৪টায় আসিবে। সংবাদ পাইয়া আমি যোগীভাইয়ের সঙ্গে স্টেশনে চলিয়া গেলাম। বম্বে এক্সপ্রেস আসিল, কিন্তু মা তাহাতে আসিলেন না। তাহার পরবর্ত্তী গাড়ীটীও দেখিয়া, হতাশ হইয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পরে রাত্রি ১০টায় একটা গাড়ী আছে। সেটি অবশ্য দেরাদুন যায় না—হরিদ্বার পর্যন্তই আসে। হঠাৎ দেখি সেই গাড়ীতেই মা আসিয়াছেন।

হরিদ্বারে মা।

গোপীবাবু গত ২১শে কাশী হইতে এখানে আসিয়াছেন। মা আসিয়াই তাহার ঘরে গেলেন।

মা'র চেহারা একটু ভালই দেখিতেছি। মা নিজেও বলিলেন, "বাঁধে গিয়া শরীরটা ভাল হইয়া গেল।"

এখানে তারার আজ ২ দিন যাবৎ হাম বাহির হইয়াছে। মা দেখিয়াই তাহার প্রকৃত সেবা শুশ্রূষার জন্য রায়পুরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার সেবার জন্য গোপালুদিও গেল।

পরে মৌনি মা কনখলে কেমন আছেন তাহার সব সংবাদ নিলেন। এই সব করিতে করিতেই রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। তাহার পরে মা আবার কিছুক্ষণ বাঁধের গল্প করিলেন। বাবার ভক্তদের শ্রদ্ধা নিষ্ঠা ও নির্বিচারে গুরুবাক্য পালনের গল্প শুনাইলেন।

মায়ের মুখে হরি বাবার ভক্তের গুরু বাক্যে নিষ্ঠার গল্প।

মা বলিলেন,—"বাঁধ বাঁধিবার জন্য বাবা সবাইকে মাটী ঢালিতে বলিয়াছিলেন। মাটী কাটিতে গিয়া এক বুড়ী ও তাহার মেয়ে মাটী ধ্বসে চাপা পড়ে। পরে মাটী খুঁড়িয়া ২ জনকেই পাওয়া যায়। বুড়ীর মাটী চাপাতে খুব রক্তপাত হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞান হওয়া মাত্র সে বলে যে গ্রামে ফিরে যাবার আগে আমাকে আরো ২ চুপড়ী মাটী ফেলিতে হইবে। কারণ বাবার কথা পালন করিতে হইবে ত!" এই গল্প বলিয়া মা বলিলেন, "দেখ বাবার কথা ওরা কী ভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। বাবা যেখানে সেখানেই থাকবো তাতে মরি আর বাঁচি—এই ভাব বড় সুন্দর।"

২৬শে মার্চ, ১৯৬২।

আজ সোমবার শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চম দোলযাত্রা। শোভাদি মাকে সিল্কের কাপড়, গোলাপের মুকুট, মালা প্রভৃতি দিয়া সাজাইয়া দিল। সেই বেশ পরিয়াই মা উপস্থিত সকলের সঙ্গে রং খেলিলেন।

২৭শে মার্চ, ১৯৬২।

আজ ভোরে উঠিয়াই মা বলিলেন, "শরীর আবার পূর্ব্বের মত খারাপ হইয়াছে।" তবুও আজই মা'র দেরাদুন যাইবার খেয়াল এবং বেলা ৪টায় পরমানন্দ এবং লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া মা দেরাদুনে চলিয়া গেলেন।

অমৃত বাসুদেব আজ সকালে ৮ লক্ষ জপ সমর্পণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল। সকালেই মা'র উপস্থিতিতে তার পূর্ণাহুতি হইল, এবং তাহাদের গাড়ীতেই মা দেরাদুন গেলেন।

২৮শে মার্চ, ১৯৬২।

কন্যাপীঠের মেয়ে যমুনার বাবা, চিদানন্দ স্বামী পূজার পর হইতেই আমাদের দেরাদুন আশ্রমে আছেন। তিনি বহুদিন হইতেই আমাদের আশ্রমে বাস করিতেছেন। পূর্বে তিনি আমাদের কলিকাতা আশ্রমে থাকিতেন। চিদানন্দ স্বামী অন্ধ সন্ন্যাসী।

অভয়ের স্ত্রী যমুনা কিছুদিন হইল পুনরায় আশ্রমে চলিয়া আসিয়াছে। মায়ের আদেশে সে তার বাবার সেবায় রত। মা দেরাদুনে আসিয়াছেন এই জন্য যে যমুনার বাবার শরীর বিশেষ অসুস্থ। মা আসিয়া তাহার যাবতীয় সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন যাহাতে যমুনার মনে কোনরূপ দুঃখ না থাকে যে তাহার বাবার সুচিকিৎসা হয় নাই। যাহা হউক মা'র পূর্বে—৩০শে দেরাদুন হইতে ফিরিয়া আসার কথা ছিল। কিন্তু সংবাদ পাওয়া গেল মা আজ আসিবেন না—যমুনার বাবার অবস্থা খারাপ।

চিদানন্দ স্বামীর মৃত্যু।

৩১শে মার্চ, ১৯৬২।

আজ ভোরবেলা মা হরিদ্বার আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে একটী স্টেশন ওয়াগনে (station wagon) চিদানন্দ স্বামীর মৃতদেহ। মা'র নিকট শুনিলাম যে মা'র খেয়াল ছিল যে স্বামিজীকে নিয়া গত কালই হরিদ্বারে চলিয়া আসেন, কিন্তু ডাক্তার নিষেধ করিলেন যে এই সঙ্কট অবস্থায় গাড়ীর ঝাঁকুনিতে হয়ত কিছু হইয়া যাইতে পারে। চিদানন্দ স্বামীর দেহ রক্ষার বিষয়ে মা বলিলেন, "মহাযাত্রা, সবটা যোগাযোগ আপনা আপনি ঘটে যাওয়া। সদ্‌বুদ্ধি ছিল, মেয়ের হাতে সন্ন্যাসী শেষ সময়ে আর সেবা নিল না—বিকাল হইতেই যমুনা আর তাহার সেবা করতে পারে নাই।" তারার বাবা সমানে মাথার কাছে বসা অবস্থায় 'নমো নারায়ণায়' 'নমো নারায়ণায়' স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। চিদানন্দজীও প্রায়ই প্রণব ও 'মা' বলিতেছিল। মা-ও ত সকাল হইতেই ঘরে। রাত্রি ১১টায় মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, আমি যাই?" স্বামিজী,—"হ্যাঁ মা" বলিয়া উঠিলেন। ভোর ৪টার সময় রমেশদা বাহিরে গেল, সমরকে (কমলের ছেলে) পাশে বসাইয়া গেল। রমেশদা ফিরিয়া আসিয়া দেখে, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ শরীর—শেষ সময় কায়েস্থও কাছে থাকিল না। রমেশ ত ২৪ ঘণ্টা ধরিয়াই পাশে বসা কিন্তু শেষ সময়ে পাশে রহিল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বালক।

যাক্ হরিদ্বারে নীল ধারায় শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬২।

হরিদ্বার কুম্ভে শ্রীশ্রীমা।

আজ অমাবস্যা। কুম্ভ-স্নানের একটা যোগ। বড় বড় মেয়েদের ও বুড়ীদের মা শৈলেশ, কমল ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ড স্নানে পাঠাইলেন। ব্রহ্মকুণ্ডের একেবারে পাশে চারতলার ওপরে একটী ঘর টিহরির মহারাজা ১০০০৲ টাকা ভাড়া

দিয়া নিয়াছিলেন। মা যোগীভাইকে বলিয়াছিলেন যে মেয়েরা ওই ঘর ও ঘরের সামনের বারান্দা হইতে যেন সাধুদের স্নান ও মিছিল দেখে। ১১টা হইতে ১১॥টা পর্যন্ত নিরঞ্জনী আখাড়ার মিছিল এবং তাহার পরে আরও কয়েকটী মিছিল দেখিয়া মেয়েরা ফিরিয়া আসিল।

সকলে ফিরিয়া আসিয়া মা'র হাতে কুম্ভের জল পাইল। এ সময় মা বলিলেন,—"এই যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক—কোন জাগতিক কামনা বাসনা নাই—শুধু এক কামনা কুম্ভ স্নান, এক লক্ষ্য—যেন কুম্ভে স্নান হয়ে যায় ভালভাবে। স্নান মাহাত্ম্য ও ক্রিয়া মাহাত্ম্যেরও তো একটা ফল আছে। তাহা ছাড়া যার যার ভাগ্য, কর্ম্মানুসার ফল প্রাপ্তি। অবশ্য কামনা বাসনার বীজ ত থেকে যায়ই—পরে প্রকাশ হয়।

আবার বার বছর পরে যোগ—কে, কোথায়, কী রূপে, কে জানে!"

মাকে একবার যোগীভাই এই সাধুদের মিছিল দেখাইয়াছিল। সে প্রসঙ্গে আজ মা বলিলেন,—"২৪ ঘণ্টা শুধু দেখতে দেখতে কীভাবে কাটিয়া গিয়াছিল; খেয়াল নাই।"

৫ই এপ্রিল, ১৯৬২।

আজ হইতে নবরাত্রি আরম্ভ হইল। অবধূতজী এ উপলক্ষে কিছু বলিলেন।

৭ই এপ্রিল, ১৯৬২।

শ্রী১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরীজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষে তাঁর সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্ত শিষ্যরা সকলে মিলিয়া ৭দিন ব্যাপী উৎসব করিবে, সেই উপলক্ষে

এখানে সকলে একত্রিত হইয়াছে। বিদ্ধজী নীচের হল খুব সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিয়াছে। হীরু ব্রহ্মচারী দিদিমার উষারতি, গুরুপূজা ও সন্ধ্যারতি করিল। বৈকালে মহামণ্ডলেশ্বরেরা এক এক দিন এক এক জন ভাষণ দিলেন। মা সেইসব ভাষণে উপস্থিত থাকেন। সকালে চৈতন্যগিরীজী উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন। মা'র কৃপায় উৎসব সুন্দরভাবে চলিতেছে।

শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব।

১২ই এপ্রিল, ১৯৬২।

আজ সকালবেলা নিরঞ্জনী আখাড়ার মোহন্ত আসিয়া মাকে বলিলেন যে তাঁরা মাকে হাতির উপরে বসাইয়া শোভাযাত্রা করিতে চাহেন। মা সব শুনিয়া বলিলেন,—"বাবারা আদর করে ছোট বাচ্চীকে নিয়ে যাবে—যা হয়ে যায়—শরীরটা তো এলোমেলো।"

শ্রীশ্রীমাকে নিয়া হাতির পিঠে বসাইয়া শোভাযাত্রা।

শুনিলাম আসিবার সময় তাহারা গঙ্গামন্দিরে গঙ্গামাতার কাছে মা'র শারিরীক সুস্থতার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে শোভাযাত্রার বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া পড়িল। সকলের মুখেই এক কথা, "আনন্দময়ী মায়ের জৌলুষ বেরুবে।"

মাকে ঠিক ৯॥০টায় মোটরে করিয়া আখড়ায় নিয়া গেল। সম্মুখে বিরাট অতি সুসজ্জিত হাতি দাঁড়াইয়া আছে। হাতির উপরে বসাইয়া এরূপ আখড়া পদ্ধতিতে মাকে নিয়া আর শোভাযাত্রা করা হয় নাই, কাজেই আমরা সকলেই একটু উদ্‌গ্রীব।

মাকে মোটর হইতে নামাইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া হাতির উপরে স্থিত রূপার সিংহাসনে বসান হইল। অতি সাধারণ সাদা কাপড়ে ঐ সময় মাকে যে

কী অপূর্ব দেখাইতেছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চুলগুলি আলুলায়িতা, গলায় গোলাপ ফুলের মালা, আর আজ বাসন্তী পূজার অষ্টমী। আমরা সকলে দেবীর গজে গমন দেখিলাম। দুই পাশে সারিবদ্ধ জনতার দিকে মা হাত জোড় করিয়া স্মিতহাসি হাসিতেছিলেন। ১॥০ মাইল ব্যাপী এ শোভাযাত্রা নিরঞ্জনী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বরের আশ্রমে আসিয়া থামিল। মা হাতি হইতে নামিয়া আসিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মা মোদীর যজ্ঞের পূর্ণাহুতিতে চলিয়া গেলেন।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৬২।

আজ কুম্ভের মোক্ষস্নান। অত্যধিক ভীড়। স্নানের যোগ আছে, বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। বেলা ২টায় আশ্রমের অনেকে স্নান করিতে গেল।

বিকাল ৫॥০টার সময় মা হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে নামিয়া একেবারে 'বাঘাট হাউসের' সামনের গঙ্গার ঘাটে নামিয়া গেলেন। দেখা গেল যে পাশের শ্মশানঘাটে একটী মৃতদেহ সৎকার করা হইতেছে। শোনা গেল যে সেবক সমিতির প্রধান অধ্যক্ষের পত্নীর মৃতদেহ সৎকার করা হইতেছে। পুণ্যাত্মা সন্দেহ নাই, মাকে টানিয়া আনিয়াছে তার অন্তিম ক্রিয়ার সময়। গোধূলি বেলা—কুম্ভযোগ—মা'র সান্নিধ্য—গঙ্গাতট—অপূর্ব সমাবেশ। মা উপস্থিত সকলকে "হরে কৃষ্ণ নাম" করিতে বলিলেন।

কুম্ভের মোক্ষস্নান দিবসে একটী ঘটনা।

সন্ধ্যা ৭টায় অনেকে মা'র অনুমতি নিয়া স্নান করিয়া আসিল। রাত্রি ৯টায় পুলিশের পাহারায় মেয়েরা স্নান করিয়া আসিল।

রাত্রি ১০টা পর্যন্ত মহাযোগ। ১০টার পূর্বেই একটী পুলিশের লোক

আসিয়া তাদের গাড়িতে করিয়াই মাকে ব্রহ্মকুণ্ডের বিপরীত দিকের ঘাটে নিয়া গেল। সেখানে মা গঙ্গায় নামিয়া জল স্পর্শ করেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া মা সকলের মাথায় কুম্ভের জল দিলেন।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৬২।

আজ বাংলার নব বর্ষ। সকাল হইতেই মা'র শরীরটা আজ একটু অসুস্থ। আজ প্রায় সারাদিন মা শুইয়াই রহিলেন। বিকালে কনখলে নিতাইদার শান্তি নিকেতনে গেলেন।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৬২।

আজ সকালে সকলে দেরাদুন ফিরিয়া আসিল। মা চিদানন্দজীর ভাণ্ডারার পরে আসিবেন।

মা বিকালে আসিয়া পৌঁছিলেন।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৬২।

কুম্ভেতে মা যখন গঙ্গায় গিয়াছিলেন তখন মেয়েদের অনেকে যাইতে পারে নাই বলিয়া অনেকের মনে দুঃখ ছিল। সে কথা প্রসঙ্গে আজ সকালে মা বলিলেন,—"কুম্ভ স্নানে মা'র সঙ্গে না যাইতে পারার জন্য মনে এত দুঃখ যাদের—ঐ ভীড়ে তাদের আর কিছু বলা হয় নাই,—তারা কেউ কেউ নাকি কেঁদেছে,—কাঁদুক, একটু কাঁদা ভালোই—এ শরীরের জন্যেই ত। যদি বাস্তবিক বলো, তোমরা যখন স্নান

করছিলে ঠিক সেই সময় এ শরীর জলেতেই—তোমরা না দেখতে পার কিন্তু এ শরীর সবাইকে দেখেছে। এ শরীরের দেখা হয়ে গেছে, আর এক কথায় যদি বলো—তোমাদের স্নান করা মানে আমারই স্নান হয়ে গেছে সেই সময় যদি তোমরা দেখতে একটা হৈ হল্লা লেগে যেতো—ভালোই হয়েছে—তোমরা দেখনি, আমি দেখেছি।”

মা'র মুখে এই কথা শুনিয়া অনেকের মন তবু একটু শান্ত হইল।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৬২।

বৃক্ষতলে মায়ের ভোগ।

আজ পূর্ণিমা। মা মধুক্ষরা আম গাছের নীচে নতুন বেদীর ওপরে বসিলেন। রাত্রিতে সকলেই চাতালে যখন খাইতে বসিল, মা-ও সেই সময় গাছ তলাতেই ভোগে বসিলেন।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৬২।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পণ্ডিত জবাহরলালজী ও বিজয়লক্ষ্মী।

আজ বেলা প্রায় ১২টায় স্থানীয় Collector ও তার কয়েকজন সঙ্গী আসিয়া প্রাইবেটভাবে মাকে বলিয়া গেলেন যে আজ সন্ধ্যায় পণ্ডিত জবাহরলালজী, বিজয়লক্ষ্মী এবং পদ্মজা নাইডু মা'র দর্শনে আসিবেন। কিশনপুরে পণ্ডিতজীর এই প্রথম আসা।

সংবাদ পাইয়া মা উপরের ঘরে তাহাদের বসিবার আয়োজন করাইলেন। সকালে উঠিয়াই মা'র এক প্রাচীন ভক্ত লক্ষ্মীতঙ্কার মনে হইল মা'র জন্য কিছু বাদামের বরফি নিয়া যাই। তাহা মাকে দিতেই মা তাহা অতিথিদের

জন্য রাখিয়া দিতে বলিলেন,—"সব আপনা আপনি যোগাযোগ হয়েই যায়।"

সন্ধ্যা ৬টায় পণ্ডিতজী ও বিজয়লক্ষ্মী আসিলেন। তাহারা প্রায় ২০।২৫ মিনিট মা'র নিকট একান্তে বসিলেন। মা দুজনকেই ছোট চন্দন কাঠের কৌটায় যজ্ঞ ভস্ম দিলেন। লক্ষ্মীজী ফল, বরফি, বাদামের সরবৎ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের আপ্যায়িত করিলেন।

নীচে হলে ছবি ব্যানার্জীর কীর্ত্তন হইতেছিল। উভয়ে সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া কীর্ত্তন শুনিলেন পরে তাঁহারা শিব মন্দিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেশদা পণ্ডিতজীকে শিবের প্রসাদী মালা পরাইয়া দিলেন। কণ্যাপীঠের মেয়েরাও পণ্ডিতজীকে এক একটা করিয়া গন্ধরাজ ফুল দিল। এবং যাইবার সময় মা পণ্ডিতজীর হাতে একটি লাল রংয়ের গোলাপ দিয়া হাত জোড় করিয়া বিদায় দিলেন।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৬২।

আজ মা কয়েকজনকে নিয়া হরিদ্বার গিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। সেখানে ব্রহ্মচারীদের দেখিতেই মা গিয়াছিলেন।

২রা মে, ১৯৬২।

আজ ১৯শে বৈশাখ। আজ মায়ের শুভ জন্মদিন। আজ মায়ের জন্মোৎসবের আরম্ভ। আজ রাত্রি ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত মাতৃমন্দিরে যোগেশদা মা'র জন্ম তারিখের পূজা করিলেন। রাত্রি ৩টায় যোগেশদা প্রথমে উপরের ঘরে আসিয়া মাকে শোওয়া অবস্থাতেই মা'র চরণ পূজা করিয়া গেলেন। মা আজ আর নীচে নামিলেনই না। তিথি পূজার মতই আজ কীর্ত্তন,

দেরাদুনে মায়ের জন্মোৎসব আরম্ভ।

ধ্যান, চণ্ডীর ঘট বসানো, মা'র ফটোতে পূজা আরতি ভোগ সবই হইল। আজ হইতে ২৩শে মে পর্যন্ত অখণ্ড নাম জপ ও অখণ্ডভাবে সব প্রোগ্রাম রক্ষা করা আরম্ভ হইল। নিত্য ২বার মা'র আরতি হইবে।

৪ঠা মে, ১৯৬২।

মা'র জন্মোৎসব উপলক্ষে আজ বাঁধ হইতে শ্রীহরিবাবা এবং তাহার সঙ্গে রাসপার্টি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ হইতেই রাসলীলাও আরম্ভ হইয়া গেল। হরিবাবা নিয়মিত প্রোগ্রামে আসিতে লাগিলেন।

৬ই মে, ১৯৬২।

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। অক্ষয় তৃতীয়ার কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—"এ শরীরকেও গিরিজী অক্ষয় তৃতীয়া করিয়েছিল। তবে ৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়ার দরুণ ব্রতের সমাপ্তি হয় নাই।

অক্ষয় তৃতীয়া।

সাহবাগে এসে মৌন অবস্থায় অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত করা হইয়াছিল। স্থানীয় পুকুর থেকে তিন ঘড়া জল আনান হইয়াছিল। যে পুকুর থেকে ঐ জল আনান হইয়াছিল, সে পুকুরটারও একটা বিশেষত্ব ছিল। এ শরীর পুকুরে নারায়ণ প্রত্যক্ষ করেছিল। ঐ পুকুরে জল-ক্রিয়াও হয়েছিল। ঐ সময় শরীর অত্যন্ত কৃশ হয়েছিল। কারণ তখন একবার খেয়াল হয়েছিল যে ঋষিমুনিদের যেমন কৃচ্ছ সাধনা করে শরীর কৃশ হয়, এ শরীরেরও শুধু হাড় ও চামড়া—সে সময়ের বোধ হয় ছবি নাই। প্রাণগোপালবাবু ব্রত উদ্‌যাপন দেখে উৎসব করেন। শরীরের মা তখন রান্না করেছিল সাদা পোলাও, ভাজা মুগডাল আর মিষ্টান্ন।"

মা বলিলেন,—“অক্ষয় তৃতীয়াতে ১। সত্যযুগ আরম্ভ ২। পরশুরামের জন্মদিন ৩। জপ তপ দান যা কিছু কর সব অক্ষয় হয় ৪। বদ্রীনাথে মন্দিরের দরজা খোলে ৫। বৃন্দাবনে বিহারীজীরও চরণ দর্শন হয়। এই দিনে জল দান করে ঠাকুরকে বলা, “ঠাকুর, আমার সর্ব পিপাসার নিবৃত্তি কর—অক্ষয় তৃপ্তি লাভ, চির তৃপ্তি লাভ করা।”

৭ই মে, ১৯৬২।

আজ ছবি ব্যানার্জীর যুগল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উৎসব উপলক্ষে ১২ ঘণ্টা অখণ্ড ‘হরেকৃষ্ণ’ নাম চলিতেছে। সব বড় বড় মেয়েরা জলপূর্ণ ঘড়া দান করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ৭২টী ঘড়া দান হইল। একমাত্র মায়ের উপস্থিতিতেই এই সব বিরাট কাণ্ড সম্ভব।

৮ই মে, ১৯৬২।

মা আজ শ্রদ্ধানন্দ স্বামিজীর রাজপুরের আশ্রমে গেলেন। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। ৮ই মে তাঁর শিব প্রতিষ্ঠার দিন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল ঐ দিনে মা তাঁহার আশ্রমে পদার্পণ করেন। সেইজন্য তিনি স্বহস্তে পত্র লিখিয়া মাকে আহ্বান জানাইয়া ছিলেন। সেই উপলক্ষে মা এখানে আসিয়াছেন।

বহু বৎসর পূর্বে একবার ভাইজী এই স্থানটী দেখিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল যে এমন মনোরম পাহাড়ের কোলে মায়ের জন্য একটী কুটিয়া হয়। এই প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—“বাবার আশ্রম, তারপর এখানে হয়ে গেল, এখানে ত সবই এক।”

১২ই মে, ১৯৬২।

আজ ভোলানাথের তিথি পূজা। এই উপলক্ষে শিব মন্দিরে ভোলানাথ শিবের বিশেষ ভোগ রাগাদি সহ পূজা হইল।

১৭ই মে, ১৯৬২।

ইতিমধ্যে আমি কয়েক দিনের জন্য দিল্লী গিয়াছিলাম। আজই দিল্লী হইতে ফিরিয়াছি। মা'র শরীর একপ্রকার ভালই চলিতেছে।

১৮ই মে, ১৯৬২।

গতকাল রাত্রিতে মা বড় বড় মেয়েদের লইয়া কিছু লীলা করিয়াছেন। কখনো কাহাকে ধরিয়া "হর হর বম্ বম্" শব্দ করিতেছেন, আবার কখনো কাহারো হাতে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্যের ভঙ্গিতে নাচিতে লাগিলেন, আবার কখনো রুমাল হাতে লইয়া রুমাল উড়াইয়া উড়াইয়া নাচিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের লীলা।

মায়ের এই লীলা প্রসঙ্গেই আজ সকালে মা অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। অনুসূয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা মহারাষ্ট্রীয়েরা ঠাকুর মন্দিরে নিজেদের আনন্দ ব্যক্ত করিবার জন্য ঐ রকম রুমাল উড়াইয়া নাচে। মা কি তাহা দেখিয়াই কাল রাত্রিতে ঐ রকম করিলেন ?"

মা—"না এ শরীর পূর্বে কখনো ঐসব দেখে নাই। স্তব-স্তুতি বা সাধনার খেলা যেমন আপনা আপনি হইয়া গেছে, এও ঠিক তাই।" মা আরও বলিলেন—"দেবদেবীরা দর্শন দিতে এসেছে, তাদের যারা

আরতি করতে এসেছে, রুমাল নিয়ে এ শরীর তাদের আদর করেছে।"

১৯শে মে, ১৯৬২।

বুদ্ধপূর্ণিমাতে নামযজ্ঞ।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। এই উপলক্ষে আজ নামযজ্ঞের অধিবাস হইল। পরে সারারাত স্থানীয় করণপুরের মেয়েরা মহামন্ত্র নাম করিল। পরদিন ছেলেরা সারাদিন নাম রক্ষা করিবে।

২২শে মে, ১৯৬২।

শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা।

আজ জন্মোৎসবের শেষ দিন। তিথি পূজা শেষ রাত্রে হইবে। উৎসব উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বিশেষ বিশেষ মহাত্মারা আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। হরিদ্বার হইতে আসিয়াছেন মহামণ্ডলেশ্বর মহেশ্বরানন্দজী, ঋষিকেশ হইতে আসিয়াছেন অন্ধ স্বামী শরণানন্দজী এবং চক্রপাণীজী, শুকতাল হইতে আসিয়াছেন বিষ্ণু আশ্রম। তাহা ছাড়া হরিবাবাজী মহারাজ ও স্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী ত আছেনই। দেশ বিদেশ হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভারতীয়, ইংরেজ, অ্যামেরিকান, ফারসী, ফরাসী নানান দেশের লোক আছেন। সংখ্যা প্রায় ৪০০ অপেক্ষাও অধিক। প্রতিবেলায় প্রায় ১০০০ লোক প্রসাদ পাইতেছে। দিবারাত্র যেন এক বিরাট উৎসব লাগিয়াই আছে।

মধ্যরাত্রির পূর্ব হইতে শিব মন্দির ও মাতৃ মন্দিরের আঙ্গিনায় পূজার আয়োজন চলিতেছে। মা'র খাটখানিকে খুব সুন্দর করিয়া সাজান

হইয়াছে। মাথার দিকে সাধু মহাত্মাদের বসিবার আসন, পায়ের দিকে ভোগের নানাবিধ দ্রব্য সাজান হইয়াছে। সম্মুখে স্ত্রী পুরুষ ভক্তবৃন্দের বসিবার স্থান। হরিদ্বার হইতে ব্রহ্মচারী নির্বান, নির্ম্মল ও ভাস্কর আসিয়াছে।

ক্রমে পূজার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় ৩টা বাজে। মহাত্মাদের মধ্যেও অনেকে আসিয়া আপন আপন আসনে বসিয়াছেন। সমস্ত আঙ্গিনায় প্রায় ৭।৮ শত ভক্ত উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে, কখন মা আসিবেন এবং পূজা আরম্ভ হইবে। কিন্তু এবার মা'র যেন পূজাস্থানে আসিবার কোন খেয়ালই নাই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নির্বান, ভাস্কর, নির্মল, অবধূতজী এবং যোগীভাই গেলেন মাকে খেয়াল করাইয়া নিয়া আসিবার জন্য। এবার তাহাদের সকলের সমবেত ঐকান্তিক আহ্বানে মাকে আসিতেই হইল। মা ধীরে ধীরে আসিয়া পূজার খাটে শুইয়া পড়িলেন। কীর্ত্তন ত পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। এবার আরম্ভ হইল, সকলের আকাংখিত মাতৃপূজা। পূজা চলিতে লাগিল। সাড়ে তিনটার পর মৌন আরম্ভ হইল। মৌন সমাপ্ত হইলে, বেদপাঠ, গুরু সঙ্গীত, গুরু স্তব, শিব স্তব, দেবী স্তব, রাম স্তব, কৃষ্ণ স্তব, বদ্রীনাথ স্তব, মহাপ্রভুর স্তব, রাস পঞ্চাধ্যায়ী এবং মোহ মুদ্গর পাঠ হইল। এই স্থানে ও কালে এই সবগুলি এত সুমধুর শুনাইতেছিল যে তাহাকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

যথাসময়ে পূজা সমাপ্ত হইল। ইহার পর আরম্ভ হইল মহাত্মাদের আরতি। সে-ও এক অপূর্ব দৃশ্য। গেরুয়া রঞ্জিত বেশবাসে মহাত্মারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, লক্ষ্ণৌর হরিশবাবুর দুই ছেলে, প্রভাতবাবুর দুই ছেলে ও বিদ্যাপীঠের দুই ছেলে মিলিয়া একযোগে আরতি করিল। আরতীর সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মাদের প্রণামীও দিয়া দেওয়া হইল। প্রায় ৫টার পর আরতি শেষ হইলে উপস্থিত সকলে আসিয়া মা'র চরণে প্রণাম করিয়া ও আশীর্বাদীয় প্রসাদ গ্রহণ করিয়া একে একে বিদায় লইল। এবার খুবই

সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সকলের প্রণাম করা সম্পন্ন হইল। প্রণামের একটীই লাইন—এ লাইনে ধনী দরিদ্রের কোন তারতম্য নাই, কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নাই। সে দৃশ্যই কি কম সুন্দর—চাকর, ঝি, ড্রাইভার-এর সহিত রাজা মহারাজা, কালেক্টার, রাজকর্মচারী এমন কি হিমাচল প্রদেশের গভর্ণরও সস্ত্রীক লাইনে দাঁড়াইয়া যথাসময়ে শান্তভাবে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

এই প্রণাম পর্ব শেষ হইতে প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গেল। সকলের প্রণাম শেষ হইলে ধীরে ধীরে মাকে উঠাইয়া আনা হইল। মা তখনো গভীর ভাবে নিমগ্না। ঐ অবস্থায়ই মাকে ঘরে আনাইয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইল। আমরা সকলে মা'র ঘর খালি করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

২৩শে মে, ১৯৬২।

এবার আনন্দের হাট ভাঙ্গিতে লাগিল। খুব ভোরেই আজ শরণানন্দজী বিদায় লইয়া গেলেন। তাহার পর বিকালবেলা মোটরে স্বামী মহেশ্বরানন্দজী হরিদ্বার এবং বিষ্ণু আশ্রমজী শুকতাল চলিয়া গেলেন। অবধূতজীও কালই ভোরে চলিয়া যাইবেন। ভক্তদের মধ্যেও অনেকেই আজ রাত্রির গাড়িতে বিদায় গ্রহণ করিল। জন্মোৎসবের বিরাট মেলা ফুরাইয়া গেল।

৯ই জুন, ১৯৬২।

জগৎগুরু শংকরাচার্যের মায়ের নিকট আগমন।

জন্মোৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, লোক সংখ্যা কমিতে কমিতে এখন অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য নিত্য সকালেই রাম কিংবা মহাপ্রভুর লীলা নিয়মিতই চলিতেছে। ঐ লীলার সময় স্থানীয় বহুলোকের ভীড় হয়। মা নিজের ভাবেই আছেন। বেশীর ভাগ সময় মা উপরে-ই থাকেন, কোন কোন দিন বা একেবারেই নীচে নামেন-ই না।

ডাঃ পান্নালাল ও পণ্ডিত সুন্দর লালজী এখানেই আছেন। তাহাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে মা সুন্দর সুন্দর বহু কথা বলেন। আজ বৈকালে জগৎগুরু শংকরাচার্য আসিয়া মা'র সহিত দেখা করিয়া গেলেন। সৎসঙ্গে ভাষণও দিলেন।

২৪শে জুন, ১৯৬২।

আজ রাত্রিতে আশ্রমের বড় বড় মেয়েরা আসিয়া মায়ের কাছে বসিয়াছে। কেহ কেহ মাকে সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কিছু কিছু জিজ্ঞাসাও করিতেছে। একজন প্রশ্ন করিল,—"লোকালয়ের বাইরে গিয়ে নির্জ্জনে থেকে আমাদের সাধন ভজন করার বিষয়ে কি মত ?"

মা—"দেখো, সেরকম স্থিতি তো নয় যে কেউ কিছু করতে এলেই তোমাকে দেখে, 'হে ভগবতী' বলে দূরে সরে যাবে—স্ত্রী শরীর—একবার যদি দাগ পড়ে চিরজীবন সে দাগ রয়ে যায়। আর ভগবানের ওপর বিশ্বাসের কথা যদি বল—ঠিক ঠিক নির্ভরতা বিশ্বাস এলে তার ভাব, বলার ধরণ অন্যরকম হয়।"

মা আরো বলিলেন,—"পরমার্থ চিন্তনে সাধক-সাধিকাদের অখণ্ড ভাবে লাগা দরকার। অন্য কোন চিন্তা গ্রহণীয় নয়। যত বেশী সময় পরমার্থ চিন্তনে দেবে, ততই অন্যদিকের মোহ, চিন্তা কম হবে। যে এ পথে তন্ময়তার সহিত লেগে যায় তার পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য হানিতেও সাধনার ক্ষতি বা অন্তরায় হয় না। পরমার্থ পথে দৃঢ়ভাবে মন দিলে ভগবান সব ভার নেন। পিতা-মাতার সেবা না করলেও ভগবান সেদিকের ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য তীব্র বৈরাগ্য না এলে কর্ত্তব্য বুদ্ধি যাওয়া কঠিন।

সাধন ভজন বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটা বাণী।

ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। ডাক্তার যেমন ফোঁড়া কেটে বিষাক্ত বস্তু বার করে রোগ নিরাময় করে—ভগবানও দুঃখ দিয়ে ধুয়ে মুছে কোলে টেনে নেন। ভগবান সমস্ত দোষ শোধন করেন—বলেন তোরা আমাকে তোদের সব মলিনতা দিয়ে দে—তার বদলে অমৃতত্ব গ্রহণ কর—এরূপ দোকানদারী তিনি করেন, তিনি আসল ব্যাপারী।"

"সময় না হলে হয় না ইহাও ঠিক, তবে পুরুষার্থ করে যেতে হয়—সব মুহূর্ত্তেই তিনি প্রকট হ'তে পারেন, কে জানে কার কোন মুহূর্ত্ত কখন আসবে।"

"ভক্তকে তিনি ব্যথা দিয়ে দুঃখ দেন, তার আগ্রহ আকুলতা বাড়াইবার জন্য। তার ব্যথার পূজা চোখের জল তিনি গ্রহণ করেন।

নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভোগ হয়—কারো মানসিক ভোগ, কারো বা শারিরীক ভোগ। তা বলে, কর্ম্মক্ষয় হচ্ছে বলে, ভুগিয়াই যাব, চিকিৎসা করাব না, এও ঠিক না। সবই পরিমিত হওয়া দরকার। চিকিৎসা দ্বারা ভোগ পরিমিত হবার নিয়ন্ত্রণ আছে, অতএব তা করাতে হয়।"

২৫শে জুন, ১৯৬২।

আজ সকালে সৎসঙ্গে বসিয়া মা কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—"গুরু সেবা নিয়ে সেবক-সেবিকাদের আপোষে রেষারেষি কেন? সকলের সেবার অধিকার নাই—এও একটা কথা—নিরভিমান না হ'লে প্রকৃত সেবার অধিকার আসে না। গুরু যা বলে অবিচারে

তা পালন করা। অন্য কেউ যদি সাময়িক সেবার ভার পায় তা'হলে ভাবা যে আমার যিনি প্রিয়, তাকেই তো সেবা করছে, এতে মন খারাপ বা মুখ ভার করা উচিৎ নয়। তিনি, যখন যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন। তিনি যা করেন সবই মঙ্গলের, কল্যাণের জন্য সাময়িক দুঃখ, সেবা হতে বঞ্চিত হয়ে,—সে তো আমার তিতিক্ষা, ধৈর্য্য বৃদ্ধির জন্য।"

"অনেকে ভাবে যে অতিথি সেবা করা, সময় নষ্ট। মা'র সেবাই আসল সেবা। এ শরীর বলবে যে যারা এখানে মন্দির দর্শন করতে, হরিবাবার কথা শুনতে কিংবা রাস দেখতে আসে, তারা যে রকম লোকই হোক না কেন,—সাময়িক তো তারা শুদ্ধ ভাব নিয়ে সৎসঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাদের জন্য কাজ করা মানেই জন জনার্দ্দনের সেবা করা—এতে পরমার্থ পথের সহায়তা হয়। এক যদি হতো যে তুমি অখণ্ড ভাবে জপে মগ্ন, তাহলে এ জাতীয় সেবার প্রশ্ন আসত না। বৃথা সময় নষ্ট না করে যেটুকু সময় জপ-ধ্যান পূজা করলে, বাকী সময় যারা এখানে আসে তাদের জন্য কাজ করা, তাদের সেবায় ব্রতী হওয়া শ্রেয়ঃ। জাগতিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত বলে, এ কাজ করব না, ও কাজ করব না, এ ভাব মনে না আনা। যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত থাকা। সন্ন্যাসীরা ভাঁড়ারের কাছ থেকে আরম্ভ করে কত কাজ করছে। বুনি একটা বড় সুন্দর কথা বলেছে যে অনেকে মা, আমায় বলে যে তুমি এই যে বসে বসে অসুস্থ শরীর নিয়ে এর জন্য তার জন্য রান্না কর—এতে তুমি কাকে সন্তুষ্ট করছ। বুনি উত্তরে বলেছে যে আমি তাদের বলি যে মা'র কাজ, মা যে রকম চান আমি তাতে সাহায্য করবার চেষ্টা করি মাত্র। এ কথাটা বেশ সুন্দর নয় কি? "মুখে নাম, হাতে কাম"। লোকের ভালমন্দ বিচার করা তোমার কাজ নয়। পরমহংসদেব বলতেন—

"আমার মা নাচছে।" কে ভাল লোক, কে খারাপ লোক সে বিচার না করে, সাময়িক তো সে শুদ্ধভাব নিয়ে এখানে এসেছে ;—তার সেবা কল্লা মানে ভগবৎ সেবাই হয়ে যাচ্ছে।

২৬শে জুন, ১৯৬২।

আজিও মা সকালের সৎসঙ্গে আসিয়া বসিলে ডাঃ পান্নালালজীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন—"খেল্‌না হ্যয় তো ভগবৎ ক্রিয়া যো হ্যয় উয়োহী লেকে খেল্‌না। হরি খেল্‌মে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হো যায়গা—যো খেল্ খেল্‌নে মে, যো খেল খেলকে পার মে যাওগে।"

"ভগবৎ ক্রিয়া থেকে খেলনা।"

২৭শে জুন, ১৯৬২।

আজকের সৎসঙ্গে ভাইজী ও শচীবাবুর কথা উঠল। একবার ভাইজী মাকে বলেছিল,—"আচ্ছা আপনি যে অন্যেরটা খান এতে ঋণ হয় না?" মা বল্লেন—"এ শরীর তার উত্তর দিয়েছিল, 'এ শরীর কারোটাই খায় না, কারো ঘরে যায় না, কারো দিকে তাকায় না।"

"এ শরীর কারোটাই খায় না।"

"একবার কলিকাতা হইতে কাশীর গঙ্গা-মাকে কে জানাইয়াছিল যে মা'র হরিদ্বার কুম্ভে সন্ন্যাস হইয়াছে। তা শুনে এ শরীর হাসিয়া বলিয়াছিল,—"ঠিক ব্রহ্মনগরে আত্মানন্দের সন্ন্যাস হইয়াছে। এ শরীর জন্মের সময়ও যা এখনো তাই—কাপড়ও সাদা—না পিলা না গেরুয়া।"

ইহার পর শচীবাবুর কথা উঠিল। মা বলিলেন,—"শচীবাবার ইচ্ছা ছিল কল্যাণবনে একশতটী ছেলে থাকিবার বন্দোবস্ত করিবে। ছেলেরা বাগান করিবে, যাহার থেকে একজন আর একজনকে জল তুলিয়া দিবে, এই ভাবে বাগানে জল দিবে, এ শরীর তখন সোলনে। শচীবাবার ইচ্ছা ছিল যে কল্যাণবনে মা'র জন্য কুটিয়া বানাবে। মা আসবেন তাই সৎসঙ্গের ব্যবস্থা, তাবু খাঁটান সব করে রাখলো। ভিত্তি স্থাপনের নীচে গীতা, উপনিষদ, ভাগবৎ রাখা ছিল। এ শরীর সে বিষয় জানে না। ৮৷১০ বছর পরে—এ শরীরের খেয়াল হ'ল যে ভাগবৎ যেখানে রাখা রয়েছে তার উপর দিয়ে হাঁটা হচ্ছে। পরমানন্দকে বলে মাটী খুঁড়ে বই সত্য সত্যই পাওয়া গেল। এর পর ঐ স্থানে শিব মন্দির তৈরী করা হ'ল। শচীবাবার ইচ্ছা ছিল মা'র কুটিয়া করা—শিবমন্দিরই এ শরীরের ঘর।"

"শিবমন্দিরই এ শরীরের ঘর।"

২৮শে জুন, ১৯৬২।

মা আজকের সৎসঙ্গে এক আগন্তুক ভদ্রলোককে বলছিলেন,—"মন্ত্রকে অপবিত্র কেউ করতে পারে না। মন্ত্ররূপে ভগবানকেই তুমি পেয়ে গেছ। এ শরীরকে ছেড়ে গেলেও, এ শরীর তোমাকে ছাড়বে না।"

"মনকে শুদ্ধ ভোজন দাও। তার দিকে বেশী সময় মন দিলে সকলের মধ্যে ভগবৎবুদ্ধি হওয়ার আশা থাকে। চিত্ত দর্পণ নির্মল হ'লে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ। শেষ নিশ্বাসে যে স্থিতি, বর্ত্তমান ঐ স্থিতি অনুসার প্রাপ্তি হয়।"

২৯শে জুন, ১৯৬২।

আজিকার সৎসঙ্গে প্রণাম করিবার রীতি সম্বন্ধে কথা উঠিল। এ বিষয়ে মা বলিলেন,—"বিগ্রহ প্রণাম বা মহাপুরুষ প্রণাম করার সময় প্রথমে চরণ ধ্যান ধরা। ধীরে ধীরে প্রণম্যের সমগ্র শরীর ও মুখমণ্ডল ধারণায় আনা। খুব ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নিতে ভাবনা করা যে আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁর শক্তিতে ভরপুর হয়ে আমাকে মহাবলশালী করে দিচ্ছে। দণ্ডবৎ অর্থাৎ দণ্ডের যেমন মাটিতে পড়ে থাকলে নিজের কোন সত্ত্বা থাকে না; দণ্ডবৎ প্রণামেও নিজের সমগ্র সত্ত্বার পূর্ণ সমর্পণ।"

প্রণাম করিবার রীতি।

"সর্বশক্তি পাত চরণ থেকে হয়। মস্তক তা ধারণ করে। তিনি আমাকে কৃপা করে তাঁকে প্রণাম করবার অধিকার দিয়েছেন। তারপর শ্বাস ফেলতে ফেলতে ভাবা যে তিনি আমার সব অবগুণ গ্রহণ করে নিয়ে, আমাকে পবিত্র করে দিচ্ছেন।"

"গঙ্গাজল ঘটি ভরতে গেলে প্রথমে তো অল্প গঙ্গাজল দিয়ে লোটা ধুয়ে, সেই জল গঙ্গাতেই ফেলে দাও, তেমনি তুমিও তাঁর শক্তি গ্রহণ করে নিজের সব অবগুণ তাঁকে দিয়ে দিচ্ছ। ঘটিতে জল ভরে উপর থেকে,—তেমনি মস্তকই শক্তিপাত ধারণ করে।"

"হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা শক্তিপাত হয় সেজন্য হাত দিয়ে মস্তকে ও পিঠে আশীর্বাদ করা হয়। আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে বিদ্যুৎ নির্গত হয় সেজন্য পরিপক্ক ফলসহ বৃক্ষের দিকে আঙ্গুল দেখালে অনেক সময় সেই ফল পড়ে নষ্ট হয়।"

"মস্তক শক্তিপাত গ্রহণ করে সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তা ছড়িয়ে দেয়,—যেমন মূলে জল সেচন করলে সমস্ত বৃক্ষে সেই জল পৌঁছায়।"

২রা জুলাই, ১৯৬২।

গতকাল রাত্রিতে মায়ের হঠাৎ খেয়াল হইল যে আমাকে চিকিৎসার জন্য বম্বেতে যাইতে হইবে। ৭ বৎসর অসুস্থতার পর গত ২ বৎসর আমি বেশ ভালই ছিলাম। পূর্বের ন্যায় মায়ের সেবার কাজও কিছু কিছু করিতে ছিলাম; কিন্তু গত মার্চ্চ মাস হইতেই শরীরটা পুনরায় অসুস্থ বোধ করিতেছি। কাশীতে ও দিল্লীতে ডাক্তারও দেখান হইয়াছে। মা'র জন্মোৎসবের সময়ও তো পূর্ণ বিশ্রামেই ছিলাম, তবুও শরীরের অবস্থার উন্নতি হইল না। কিছুদিন যাবৎ আহারে একেবারেই রুচি নাই, বমি বমি ভাব, আর দুর্বলতাও খুব।

আজ ২।৩ দিন যাবৎ শরীর একটু বেশী অসুস্থ বোধ করিতেছি, কাজেই মা বম্বেতে Dr. Sethকে দেখাইবার জন্য আমাকে বম্বে যাইতে বলিলেন। সঙ্গে কমল, মালা, অরুণা ও হেমিদিকে যাইতে বলিলেন।

বম্বে যাইতে হইবে, কাজেই মাকে ছাড়িয়া যাইব, ইহা ভাবিতেই মন আমার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আমার দিকে চাহিয়া মা বলিলেন:—

"দিদি, তুমি ঘাবড়াইও না। ঘাবড়ান অর্থাৎ স্ব ইচ্ছা প্রধান রাখা। তাঁর উপর নির্ভর রাখা সর্বাবস্থায়।"

৪ঠা জুলাই, ১৯৬২।

আজ সকালেই মাকে আনন্দচকে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে কাহারো উদ্দেশ্যে সোয়া লক্ষ্য মহামৃত্যুঞ্জয় জপ মা গোপনে করাইতেছিলেন। আজ তাহার পূর্ণাহুতি। এই হইল সেই আনন্দচক যেখানে মা যখন প্রথমবার দেরাদুনে আসিয়াছিলেন তখন থাকিতেন। তখন মা'র সঙ্গে ছিল ভোলানাথ ও ভাইজী।

সেখানে মহামৃত্যুঞ্জয় জপের পূর্ণাহুতি হইল। পরে মা লক্ষ্মীজীর বাড়ীতে গিয়া ভোগ নিলেন এবং একটু বিশ্রামের পর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

আজ রাত্রিতে কথা প্রসঙ্গে মা'র সাধনার খেলার কথায় মা বলিলেন,— "নয় বছর শোয়া কাকে বলে এ শরীর তা জানতও না। কখনো সেজন্যে হাইও ওঠেনি। তখন শরীরে ঘামও হ'ত না।"

আবার অন্য কথা প্রসঙ্গে পরমানন্দ স্বামিজীকে কৈলাশ যাত্রার স্বপ্নে দেখার কথা উঠলো—"কৈলাশ থেকে যখন ফেরা হচ্ছে, একটা ব্রীজের ওপর এ শরীর দাঁড়িয়ে দূরে ভাইজীর আসা দেখছে। হঠাৎ এ শরীরের চোখের সামনে একটি মুখ জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠল। তখন কিছু কেউ বুঝল না, পরে বোঝা গেল যে তখন যে মুখটি দেখা হয়েছিল তা পরমানন্দের। ভাইজী তো কৈলাশ থেকে ফিরে দেহ রাখল—পরমানন্দ তার পরেই এলো। এ শরীর তখন দেরাডুন কিশনপুর আশ্রমের নীচের ঘরে বসা। হঠাৎ ভোলানাথ পরমানন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।"

পরমানন্দ স্বামিজীর মায়ের নিকট আগমন।

স্বামীজী তখন মা'র ঘরেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিঃশব্দে নিজের কথা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ বলিলেন যে তিনি তখন কাশ্মীর ফেরৎ কিশনপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলেন। বাবা ভোলানাথ মৌনাবস্থায় তাহাকে রাস্তায় দেখিয়া মা'র কাছে নিয়া আসেন।

৭ই জুলাই, ১৯৬২।

আজ সকালে মা এবং হরিবাবা এখানকার Col lector-এর বাড়ীতে ঘুরিয়া আসিলেন।

৯ই জুলাই, ১৯৬২।

আজ বৈকালে হরিবাবা চলিয়া যাইবেন। রাসপার্টিও আজ তাঁহার সহিত চলিয়া যাইবে। আজ ২॥০ মাস ধরিয়া হরিবাবার পাঠ ও কীর্ত্তন এবং রাসপার্টির রাসলীলা দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দ হইতেছিল, কাজেই হরিবাবার বিদায়ের সংবাদে সকলে একটু দুঃখিত হইল। এদিকে আবার আজ হইতেই অমৃতধারার বড় জামাতা শ্রীবাসুদেবের ভাইয়ের আত্মার সদ্‌গতি কল্পে এখানে ভাগবৎ সপ্তাহ আরম্ভ করাইলেন। পাঠক আসিলেন বৃন্দাবনের শ্রীনিত্যানন্দ।

বৈকাল ৫॥০টায় মা হরিবাবার সঙ্গে দেখা করিতে কল্যাণবন রওনা হইলেন। তখন বাবা যাইবার পূর্বে সান্ধ্যকীর্ত্তন করিতেছিলেন। কল্যাণবনে পৌঁছিয়া, মা গাড়ী হইতে যেমন নামিতে যাইবেন অমনি হাঁটুর শিরাতে এমনভাবে টান লাগিয়া গেল যে মা আর গাড়ী হইতে নামিতেই পারেন না। সুতরাং গাড়ী চালাইয়া কীর্ত্তন মণ্ডপের কাছে নেওয়া হইল। মা গাড়ীতে বসিয়া বসিয়াই কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ সেঁক দিবার পর হাঁটুর টান একটু কমল, কিন্তু আশ্রমে মাকে চেয়ারে বসাইয়াই নামাইতে হইল। হরিবাবা যাইবার সময়ও মা গাড়ীতে বসিয়াই 'ওঁ নমো নারায়ণায়' জানাইলেন।

১১ই জুলাই, ১৯৬২।

আজ মা সৎসঙ্গে বসিয়া একটী আশ্চর্য ঘ ন ঃকথা বলিলেন।

মা বলিলেন,—"দেখিতেছিলাম, একটা জায়গা। তার একদিকে

বস্তী। বাস ট্রেন চলার রাস্তা রহিয়াছে; এ দেশ ও বিদেশের লোকজন দেখা যাইতেছে। বেতারে খবর শুনিয়ে যাচ্ছে—শুনতে শুনতে শ্রোতারা কাষ্ঠবৎ স্তম্ভিত জড় হয়ে যাচ্ছে। ঐ জনতার মধ্যে এ শরীর যেন দাঁড়িয়ে শান্তভাবে। দেখা যাচ্ছে নীচে থেকে এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী উপরে উঠছে। সূর্যকে ঢেকে ফেলছে এই কুণ্ডলী। অগ্নি বর্ষণ সুরু হয়ে গেছে। নীচে অবশ্য অগ্নি বর্ষণ হচ্ছে না। বেতার গাড়ীতে খবর দিয়ে গেলো তিন বার, "এসে গেছে, এসে গেছে।" তারপর ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলী এঁকে বেঁকে চলে বাকী জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।"

একটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

মা এই পর্যন্ত বলিতেই মিসেস সভরওয়াল বলিলেন,—"মনে হচ্ছে এটম্ বমের প্রতিক্রিয়া এইগুলি। আজকের কাগজে দিয়েছে যে অ্যামেরিকাতে সব চেয়ে বড় এ্যাটমিক্ টেষ্ট, প্যাসিফিক্ আইলেণ্ডে করা হয়েছিল যার প্রভাব, প্যাসিফিকের পূর্ব উপকূলের লোকেরাও নাকি দেখতে পেয়েছে। মনে হয় এটাই মা সূক্ষ্মে দেখে থাকবেন।"

উপস্থিত সকলে ত ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য।

১৫ই জুলাই, ১৯৬২।

গত কয়েকদিন ধরিয়াই মা কল্যাণবনেই থাকিতেছেন। কোন কোন দিন বেলা ১১টায় মা আশ্রমে আসিতেন, আবার রাত্রি ১০টায় কল্যাণ-বনে ফিরিয়া যাইতেন। মায়ের শরীরের ব্যথা বেদনা লাগিয়াই আছে। একদিন ভুপেনের শ্বশুর, ডাঃ মুখার্জী, মায়ের পায়ে ইন্‌ফ্রা-রে দেন।

১৬ই জুলাই, ১৯৬২।

আজ ভাগবৎ সপ্তাহ সমাপ্ত হইল। গতকাল রাত্রি হইতেই মা আশ্রমে চলিয়া আসিয়াছেন। মাকে অমৃতবেন শ্রীকৃষ্ণের বেশে সাজাইয়া পূজা করিলেন। সন্ধ্যায় চিত্রাও মাকে পূজা করিল।

১৭ই জুলাই, ১৯৬২।

আজ গুরু পূর্ণিমা। সকাল হইতেই মায়ের খুব সর্দ্দি কাশীর ভাব, কথা অস্পষ্ট। চক্ষু দেখিয়া মনে হয় যেন জ্বর জ্বর ভাব।

মা'র ঘরেই বীণা সকাল হইতেই মা'র পূজার আয়োজন করিয়াছে। মা একবার উঠিয়া একটু সময় বিছানায় বসিয়াই আবার শুইয়া পড়িলেন। ঐ অবস্থাতেই মা'র পূজা হইল। পূজা করিল যোগেনদা, পূজার ঘণ্টার শব্দে বহু লোকই আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে মাকে অঞ্জলি দিল। একটু বেলা হইলে মা নীচে নামিয়া আসিলেন।

কিশনপুরে গুরুপূর্ণিমা

নীচে হলে দিদিমার শিষ্যেরা দিদিমার পূজার আয়োজন করিয়াছে। পরে অত্যধিক ভীড়ের কারণে, মা'র নির্দ্দেশে শিব মন্দিরেই দিদিমার পূজা হইল। পূজা করিল ব্রহ্মচারী হীরু। পূজাতে বহুলোক উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে টিহরীর রাজা ও রাজমাতা, কুচামনের রাজা, সুকেতের রাজমাতা, অম্বের রাজা, মাইশোরের রাণী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিল। পূজার সঙ্গে সঙ্গেই হলে অখণ্ড নাম কীর্ত্তনও আরম্ভ হইল।

আজ যেন এখানে এক মহামেলা লাগিয়া গিয়াছে। আশ্রমে, আশ্রমের সামনের প্রাঙ্গনে ও আশ্রমের সামনের রাস্তায় একেবারে জনারণ্য হইয়া গিয়াছে। আর ভক্তরা এত অধিক পরিমাণে ফুলফল মিষ্টি আদি

লইয়া আসিয়াছে যে তাহা যেন আর রাখিবার স্থান সংকুলন করা যাইতেছে না। ইহার মধ্যে আবার নামিয়া বসিল বৃষ্টি। লোক-জনে, ফল-ফুলে আশ্রম একেবারে থৈ থৈ করিতে লাগিল।

ভোগের ঘরেও আজ একই অবস্থা। এত অধিক পরিমাণে লোক হইয়াছে যে তাহাদের আর খাওয়াইয়া কূল পাওয়া যাইতেছে না। চড়ার পরে চড়া রান্না নামিয়াই যাইতেছে। আর প্রতি ঘরে ও বারান্দায় পংক্তির পর পংক্তি লোক খাইয়া যাইতেছে—এইরূপে ভোজন পর্ব সমাপ্ত করিতেই প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর হইতেই আরম্ভ হইল বিদায়ের পালা। বহুলোককেই কালই কর্মস্থলে যোগদান করিতে হইবে। কাজেই বহুলোকই একে একে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া গেল।

২৩শে জুলাই, ১৯৬২।

আমি বম্বেতেই আছি। ডাক্তাররা বলিতেছেন যে আমার লিভারে ফুলা আছে। তাহারা আরও নানাবিধ পরীক্ষা-নিরিক্ষা করিয়া আবার সব দেখিয়াছে এবং ২৫শে দিল্লী যাইতে অনুমতি দিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়াই মা বুনিকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

২৫শে জুলাই, ১৯৬২।

সংবাদ পাইলাম মা'র শরীর কিছুদিন যাবত-ই খুবই খারাপ যাইতেছে। সকলে বলিতেছে ইনফ্রা-রে নিবার জন্যই এইরূপ হইতেছে। মা'র শরীরে কোন ঔষধের প্রভাবইত সহ্য হয় না।

২৬শে জুলাই, ১৯৬২।

আজ দেরাদুনের পত্র পাইলাম। সংবাদ পাইলাম মা একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ললিতাকে দিয়া মা যাহা লেখাইয়াছেন তাহা নাকি তুলিয়া রাখা হইয়াছে। মা নাকি বলিয়াছেন,—"যদি কারও ইচ্ছা হয় নিবে, এ শরীর ত কারো সেরকম নেবার আগ্রহ দেখে নাই, তাই দিবার খেয়ালও হয় নাই।"

আজ বৃহস্পতিবার। আজ মা সকালে বারবেলার পূর্বে বড় মেয়েদের একত্রিত হইতে বলিলেন এবং বলিলেন,—"ইচ্ছা হইলে এই শরীরকেও ডাকিয়া নিতে পার।" কিশনপুর আশ্রমের দোতালার বারান্দায় সকলে একত্রিত হইল। ধুপ জ্বালাইয়া, মা'র আসন পাতিয়া, পাঠের জায়গা করা হইল। মা আসিতেই রূপাল মাকে মাল্য চন্দনে সাজাইয়া আসনে বসিতে বলিল। মা-ও সকলকে চন্দনের ফোঁটা দিয়া দিলেন।

পরমার্থ ভাগবতী সংঘ।

প্রথমে একটু গীতা পাঠ হইল। পরে সকলে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রণাম মন্ত্র পাঠ করিল।

প্রণামের শেষে মা বলিলেন,—"সিদ্ধেশ্বরীতে ভাইজীরা পরস্পরে এরূপ মিলিত হইয়া আপোষে নিজেদের আধ্যাত্মিক অনুভবের কথা আলোচনা করিত। তোমরাও এরূপ আধ্যাত্মিক মিলন সপ্তাহে ১ বার বা মাসে ২ বার করিতে পার। এই চতুর্মাস মনে মনে ঠিক করা,—'আমরা কারো দোষ দেখব না। ছোটবড় কথা বলবো না, বড়কে সম্মানসূচক বাক্য বলা, ছোটকে স্নেহ দৃষ্টিতে দেখা। মনে মনে কারোও ওপর রাগ বিরক্ত ভাব পোষণ না করা।'—এই সব এই চার মাস পালন করতে করতে ভাগ্যগুণে ১২ মাসই হয়ে যেতে পারে তো।"

মা আরও বলিয়াছেন—"তোমরা এ পথে এসেছ, এই কজন-ও

যদি একপ্রাণ না হও, তা হ'লে বিশ্বপ্রাণ হবে কী করে? সকলের মধ্যে ভগবৎ ভাব রাখার চেষ্টা। এক আত্মা—এই বোধে, কারও মনে আঘাত লাগে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা নয়। ছোটদের প্রতি বড়দের স্নেহ দৃষ্টি; যদি ছোটরা কিছু বলেও থাকে, ভাবা আমারই ত ছোট বোন। তারপর সরলভাবে বলে ফেলে মিটমাট করে নেওয়া। এই "মন-মিলন" সভায় তোমরা একে অপরকে 'ভগবান'—এই সম্বোধন করবে। ইচ্ছা হ'লে বলা,—"ভগবান! তোমার অমুক দিনের অমুক কথাটা আমার ভাল লাগে নাই...... ইত্যাদি। এইভাবে খোলাখুলি নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি ব্যাপার ঠিক করে নেওয়া। আর যদি তোমরা মনে কর যে এসব গত কথার উত্থাপন আর করা ঠিক নয়, তা হ'লে আজ থেকে সংকল্প নেওয়া যে আমরা, সব মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলে ভগবান তোমার চরণে আমাকে অর্পণ করলাম।" মা আরো বললেন, —"এ সব সাধনার পথে বড় বিঘ্ন করে। জীব-স্বভাব; যখনই এসব গত কথা আবার মনে আসবে তখনই বলা,—'হে ভগবান, আবার তুমি এইরূপে এসে আমার সামনে প্রকাশ হয়েছ, তুমি অপসারিত হও।' বলে প্রণাম করা।"

"তোমরা ভগবৎ-প্রীতি বন্ধনে এখানে ধর্মের সম্বন্ধে একত্রিত হয়েছ। সকলের উপরে সাম্য ভাব রাখা।—কাউকে দেখে খুশী হওয়া আর কাহাকেও দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া নেওয়া, এ যেন না হয়। কারও দোষ দেখা মানেই, যদি এ শরীরকে ভালবাস, এ শরীরের দোষ দেখা। কার-ও উপর রাগ করা মানে, এ শরীরের উপর রাগ করা। জীব স্বভাব ত, শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও এসে পড়ে!! "পাপকে ঘৃণা করা, পাপীকে নয়"—এ সব কথা রক্ষা করার চেষ্টা মানেই "আমাকে রক্ষা করা।"

এইসব কথাবার্তার শেষে মা সকলকে মিশ্রী ও এলাচি প্রসাদ দিলেন। মা বলিলেন,—"এই যে সভা হ'ল এর নাম হ'ল "পরমার্থ ভাগবতী সংঘ।"

২৮শে জুলাই, ১৯৬২।

আজ রাত্রিতে কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—"ভাইজীর কন্যাপীঠ ও বিদ্যাপীঠ গঠনের মূলে কতগুলি মৌলিক ধারা ছিল, ধারণাও ছিল। ভাইজী তখনই বলেছিল যে যদি কারো সৌভাগ্য হয়, তবে সে এসে করবে। ভাইজী এ শরীরের গৃহস্থাশ্রমে থেকেও সাধনার খেলার স্বয়ং প্রকাশের স্বাভাবিক ধারা দেখে মনে করেছিল যে কন্যাপীঠ ও বিদ্যাপীঠের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও স্বাভাবিক রীতিতে যার যার মধ্যে যে যে সংস্কারের প্রাধান্য দেখা যাবে, তার সেদিক অনুকূল করে দেওয়া। যেমন,—যার অদ্বৈত ভাব—যার শৈব, বৌদ্ধ, কৃষ্ণ ভাব তাকে সেদিকে সহায়তা করা। জাগতিক পড়াশোনার মধ্যেও ধর্মের প্রাধান্য রাখা—এ সবই ভাইজীর ইচ্ছা ছিল। যারা কুমারী সেবা করবে তাদেরও শিক্ষার ধারার সঙ্গে সাধনা হয়ে যাবে, যেমন,—সত্য রক্ষা, সত্য পালন, সত্য পথে থাকার শিক্ষা দেওয়া মানে নিজেকেও তা পালন করতে হবে। এই ভাবে যার যেটুকু কাজ সেটুকু করে বাকী সময় সে নিজস্ব সাধনায় ব্রতী থাকবে। এতে মন বাজে চিন্তার ফাঁক পাবে না। আর যদি দেখা যায় যে কেউ সাধনায় মগ্ন তাকে অন্যান্য কাজ থেকে ছুটি দেওয়া।"

বিদ্যাপীঠ ও কণ্যাপীঠের মৌলিক ধারা।

"এ শরীর কি ইচ্ছা করলে বলে কয়ে এ রকম গড়তে পারত না?

কিন্তু এ শরীরের তো এটা করব, সেটা করব, এরূপ খেয়াল হয় না—তা হ'লে তো কত কিছু হয়ে যেতো। কোন সংকল্প নাই, কোন বন্ধন নাই—উড়া পাখী ঢুকে যায়—তোমাদের আশ্রমে, বেরিয়ে যায় আবার। ভাইজীও বলে গেছে, কারুর সৌভাগ্য থাকলে সে করবে। ভাইজী আরো বলত যে এসব মেয়েদের মধ্যে যদি কেউ গৃহস্থাশ্রমেও যায়, ধর্মের শিক্ষার একটা ছাপ নিয়ে যাবে।"

৩০শে জুলাই, ১৯৬২।

আজ "পরমার্থ-ভাগবতী সংঘের" দ্বিতীয় অধিবেশন। রাত্রি প্রায় ১০টা বাজে। প্রথমে একটু পাঠ ও ধ্যান হইল। আজ সকলেই গম্ভীর কেহই মাকে কোন বিষয় প্রশ্নও করিল না; মা-ও কিছু বলিলেন না। কিছুক্ষণ এই ভাবে বসার পর মা উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় মা বলিলেন, "কাহারো মধ্যেই আনন্দ নাই।"

৩১শে জুলাই, ১৯৬২।

আজিও 'পরমার্থ-ভাগবতী-সংঘের' আসরে বসিয়া মা বলিলেন,—"বন্ধুরা সব গম্ভীর থাকে, আনন্দ নাই, হাসি নাই।" এই বলিয়াই মা চুপ করিলেন।

৬ই আগষ্ট, ১৯৬২।

গোপীবাবু এখানেই আছেন। বেশ কিছুদিন হইতেই তাঁহার হাতে একটা ব্যথা চলিতেছে। আজ মা বলিলেন,—"বাবাকে একবার কনখলে

নিয়ে গিয়ে দেখা যাক। এখানকার আবহাওয়া বড়ই স্যাঁৎসেতে।” সকলে আশা করিয়াছিল মা ঝুলনে এখানে থাকিবেন, কাজেই মায়ের এই কথা শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইয়া পড়িল। সকলের এই ভাব দেখিয়া মা বলিলেন যে মা চতুর্দ্দশীর দিন ফিরিয়া আসিবেন এবং পূর্ণিমাতে এখানেই থাকিবেন। মা গোপীবাবুকে নিয়া বৈকাল ৪টায় রওনা হইয়া গেলেন।

১৪ই আগষ্ট, ১৯৬২।

আজ বৈকালে মা কনখল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কালই ঝুলন পূর্ণিমা। কিশনপুর আশ্রমের হলের পিছন দিকের বারান্দায় ঝুলা সাজান হইয়াছে। গত ১১ই আগষ্ট হইতেই ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, ঠাকুরদের সেইদিন হইতেই ঝুলায় বসান হইয়াছে। তবে মা'র অনুপস্থিতিতে যেন সব প্রাণহীন মনে হইতেছিল। আজ মা আসিয়াছেন কাজেই সকলের মনেই দ্বিগুণ উৎসাহ। সন্ধ্যাবেলা মা আসিয়া ঝোলার নিকট বসিলেন, যোগেশদা আরতি করিলেন। পরে মা ঠাকুরদের একটু দোলাইয়া দিলেন।

কিশনপুরে ঝুলন পূর্ণিমা।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬২।

আজ ঝুলন পূর্ণিমা—রাখী-বন্ধন—মায়ের দীক্ষার দিন।

আমি দিল্লীতেই আছি, পত্র পাইয়াছি পরমানন্দ স্বামিজীও কাজে কলিকাতা গিয়াছেন। কাজেই কী ভাবে কী হইতেছে কে জানে।

১৬ই আগষ্ট, ১৯৬২।

আজ লোকমারফৎ দেরাদুনের পত্র পাইলাম। সেখানে ঝুলন পূর্ণিমা খুব ভালো ভাবেই হইয়া গিয়াছে। দিল্লীর এক ভক্ত, পুষ্প ভাডোয়ারার দীক্ষাও হইয়াছে। অনেক ভক্তই ঝুলন উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। বহু ভক্ত মায়ের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিয়াছিল।

এই উপলক্ষে নাকি সেখানে বিরাট ভাবে ভাণ্ডারারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বহু লোক প্রসাদ পাইয়াছে।

আশ্রমের নিয়ম মত রাত্রি বেলায় ১১॥ টা হইতে ১২॥ টা পর্যন্ত ধ্যানও হইয়াছে। প্রতি বছরই মায়ের সন্নিধানে এই পবিত্র সময়টীতে ধ্যান ও মৌন পালন করা হয়। এই রাতেই মায়ের শরীরে দীক্ষার খেলা হইয়াছিল —এই পবিত্র স্মৃতির স্মরণার্থেই এই নিয়মের প্রচলন। মা শিবমন্দিরের বারান্দায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নাকি ছিলেন, আর বহু ভক্ত ঐ সময় মায়ের সন্নিকটে বসিয়া ধ্যান করিয়াছে।

আজই বৈকালে মা পুনরায় কনখলে ফিরিয়া যাইবেন। গোপীবাবু ও মৌনিমা সেখানেই আছেন।

১৮ই আগষ্ট, ১৯৬২।

আজ বেলা ১॥ টায় মা পুনরায় কিশনপুর আশ্রমে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিশনপুর আশ্রমের গেট হইতে বাচ্চুকে গাড়ীতে তুলিয়া নিয়া মা সোজা কল্যাণবনে চলিয়া যান। সেখান হইতে নিবারণ বাবুকে দেখিতে গেলেন। নিবারণ বাবু কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ।

ইতিপূর্বে মা যখন দেরাদুন গিয়াছিলেন তখন মাসীমার খুব ইচ্ছা ছিল যে মাকে চালতা দিয়া ডাল রাঁধিয়া খাওয়ান। কিন্তু সেবার তাহা

হইয়া ওঠে নাই। কাজেই এবার তিনি মাকে পাইয়া তাহার মনের ইচ্ছা মিটাইয়া নিয়াছেন।

দিন কয়েক হয় আমার শরীরটা আবার একটু খারাপের দিকে যাইতেছে। মুখ ও পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। মায়ের নিকট এ সংবাদ পৌছিতেই মা বাচ্চুকে দিয়া দেরাদুন হইতে নিসিন্দা পাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহা কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও বিস্তারিত ভাবে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। করুণাময়ী মায়ের করুণার ত সীমা নাই।

এইসব কাজ সারিয়া সেইদিনই মা হরিদ্বার ফিরিয়া গেলেন। হরিদ্বার ফিরিয়া সোজা ভোলাগিরি আশ্রমে শ্রীমহাদেবানন্দ গিরিকে দেখিতে গেলেন। মা'র কাছে সংবাদ আসিয়াছিল যে মহাদেবানন্দজী প্রকৃতিস্থ নহেন, মস্তিস্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে—নিদ্রা আহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কেবল একই স্থানে বসিয়া আপনমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিবার ঢং-এ কি সব বলিয়া যাইতেছেন।

মা তাহার নিকট হইতে অনেক রাত্রিতে কনখল ফিরিলেন।

২২শে আগষ্ট, ১৯৬২।

আজ জন্মাষ্টমী। কনখলেই এবার জন্মাষ্টমীর উৎসব করা হইয়াছে।

কনখলে জন্মাষ্টমী ও উৎসব।

সকাল হইতেই জন্মাষ্টমীর জন্য আশ্রম সাজান আরম্ভ হইয়াছে। মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখা শোনা করিতেছেন।

সন্ধ্যার একটু পরেই মা বেলগাছের নীচে "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" গান গাহিতে লাগিলেন।

একটু পরে আশ্রমের বড় বড় মেয়েরা মাকে বেনারসী শাড়ী পরাইয়া, গলায় ১০৮ শ্বেত পদ্মের মালা দিয়া মাকে পূজার আসনে বসাইয়া

দিল। ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দ পূজা আরম্ভ করিল। পূজা স্থলে গোপীবাবুও আসিয়া বসিলেন। মায়ের আদেশে নির্মল ও ভাস্কর শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময়ে ভাগবৎ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-অধ্যায়টী পাঠ করিল।

যথাসময়ে পূজা শেষ হইয়া গেলে সকলে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেল।

২৩শে আগষ্ট, ১৯৬২।

আজ নন্দোৎসব। নন্দোৎসবের আয়োজন হইতেছে। নিতাই মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া গোয়ালা সাজিয়াছে। লক্ষ্মী তংকা, নন্দরাণী আর রায়পুরের মিসেস পুরী সাজিয়াছেন নন্দবাবা। গোকুল নৃত্য চলিতেছে, মা'ও তালে তালে হাত তালি দিতেছেন। নাচিতে নাচিতে যেমন বিধান আছে, নিতাই দইয়ের হাড়ি মাটিতে ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া, দইয়ের ওপরেই গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ওদিকে মায়ের কাছে হল্‌দি মাথান দই নিয়া গেলে মা সকলের মুখে দই ছিটাইয়া দিলেন। এই সময় গোপীবাবু তার ঘরেই ছিলেন। মা সেখানে গিয়া তাঁহাকেও দই খাওয়াইয়া দিয়া আসিলেন। পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া মা "ধরো লও" "ধরো লও" গান গাহিতে গাহিতে দই মাথানো চত্বরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মা'র চোখে মুখে তখন এক দিব্যোজ্জল ভাব। পরে 'হরি বোল' করিয়া উৎসব শেষ করা হইল।

পুনরায় রাত্রি বেলা রোহিনী নক্ষত্রযুক্ত সন্ধিক্ষণে মা বলিলেন 'সকলে একত্রিত হইয়া বস।' কহিনুর মাকে বলিয়াছিল মধ্য রাত্রিতে ধ্যানের কথা। বোধহয় সেজন্যই মা এ কথা বলিলেন। গোপীবাবুও এই সমবেত ধ্যানে যোগদান করিলেন। পরে সকলে যার যার ঘরে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেল।

৩০শে আগষ্ট, ১৯৬২।

মা ঘুরিয়া ফিরিয়া এই দিকেই আছেন। এদিক ওদিক হইতে বহু ভক্ত আসিয়া মা'র দর্শন করিয়া যায়। মা আপন ভাবেই আছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

কথা হইয়াছে মা নিউ আলিপুরে মাখন লাল ঘোষের বাড়ীতে ৩০শে সেপ্টেম্বর যাইবেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত হয়ত মা এ দিকেই থাকিবেন। মা'র শরীর এক প্রকার ভালই আছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

আজ মা নিউ আলিপুরে মাখন লাল ঘোষের বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। মাখনবাবু বাড়ীর তিন তলায় ফ্লাটের একদিকে মায়ের ঘর করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বের কথা—মাখনদার এই বাড়ীর একতলার ঘরগুলি মোজেক করা। একদিন দেখা গেল সেই একতলা ঘরের সিঁড়িতে দেবীর পায়ের ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সুস্পট ছাপযুক্ত পাথরটী উঠাইয়া আনিয়া ইহারা পূজার ঘরে রাখিয়া দিয়াছে। ইহার পূর্বেও মা এই বাড়ীতে আসিয়াছেন।

একটী বিচিত্র ঘটনা ও মায়ের বিচিত্র ভাব।

মা এইবার আসিয়াই ঘরে ঢুকিয়া কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া ১৫ মিনিট বসিয়া রহিলেন। স্বাভাবিক ভাবে কথা-বার্তা বলা, হাসি প্রভৃতি যেন কমিয়া গিয়াছে, মা বসিয়া আছেন যেন পাথরের মূর্ত্তি। যাহারা মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল সকলেরই যেন একটু ভীত ভাব। মা-ও একেবারে নীরব।

কিছুক্ষণ পরে কানপুরের জয়পুরিয়াদের কাশীরাম মাকে প্রণাম করিতে আসিল। এইবার মা তাহাকে দেখিয়া প্রথম কথা বলিলেন—"আচ্ছা হয়?" ইহার একটু পরেই মা শুইয়া পড়িলেন। ইহার পর মা বেলা ১১ টায় উঠিলেন। এখন মাকে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া গেল। মা অনেকের সঙ্গেই কথা বলিলেন। মায়ের ঐ ভাবান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে মা বলিলেন,—"এ শরীর তো ইচ্ছা করে কিছু করে না—আজকাল কথা বেশী না বলাটা এসে যাচ্ছে। তোমরা রাগ করো না তোমাদের এই ছোট মেয়েটার ওপরে—তোমরা সকলে আসিও—তোমাদের ছাড়া তো এ শরীরটার চলে না।" সকলে এক এক করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

১লা অক্টোবর, ১৯৬২।

আজ মাখন ও শান্তি মা'র পূজা করিল। মা নীরবে বসিয়া তাহাদের পূজা গ্রহণ করিলেন। সমস্তক্ষণই মা চক্ষু বন্ধ করিয়া হাত দুইটী জোড় করিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৩রা অক্টোবর, ১৯৬২।

মা আজ কনকদাদার বাড়ীতে গেলেন। যাইবার পূর্বে মা তাঁহার পায়ের খড়ম জোড়াটী উহাদের বাড়ীতেই রাখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া শান্তি বলিয়া উঠিল, "মা তুমি সত্যই অন্তর্যামী। খড়মটী দেখিয়া অবধি আমার মনে হইতেছিল যে যদি এ জোড়াটী পেতাম তবে ঠাকুর ঘরে রাখিয়া রোজ পূজা করিতাম।" কথা শুনিয়া মা নীরবে হাসিলেন আর শান্তির দুই চোখে জল উছলিয়া উঠিল।

মা অন্তর্যামী।

৫ই অক্টোবর, ১৯৬২।

মা কনকবাবুর বাড়ীতে ২ দিন থাকিয়া আজ আগরপাড়া আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। অন্যান্য বারের মত এবারও আশ্রমে দুর্গাপূজা হইতেছে। আজই বোধন। পূজাতে মা কখন কোথায় থাকিবেন কোন ঠিক নাই।

কলিকাতায় দুর্গা পূজা।

আজই বোধন। বোধনের সময় হইয়া আসিতেই মা রেখার বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রেখার বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইবে। প্যাণ্ডেল তৈরী হইয়াছে। ইতিমধ্যেই মা'র আগমন বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সংবাদে এখানে অকল্পনীয় ভীড় হইয়া গিয়াছে। মা প্রথমে আসিয়া পূজা মণ্ডপেই গেলেন, পরে ঘরে গিয়া বসিলেন।

রাত্রি প্রায় ১০৷৷টায় মা উঠিয়া মাখনের গাড়ী করিয়া লেকের পাড়ে চলিয়া গেলেন। সেখানে পৌছিয়া মা চিত্রাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাকার জামাই কি এখানে আসিয়াছে?" এই ছেলেটীর স্ত্রী বিবাহের ১ বৎসরের মধ্যেই মারা যাওয়ায় ছেলেটী খুবই শোকগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ছেলেটী আসিতেই মা তাহাকে নিরালায় লেকের পাড়ে অনেক কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন। মনে হইল মা বোধহয় ইহার জন্যই এইখানে আসিয়াছেন।

৭ই অক্টোবর, ১৯৬২।

৺দুর্গাপূজা সুন্দর ভাবেই হইতেছে। মা আজ উপস্থিত লোকেদের মধ্যে গীতা ও চণ্ডী বিতরণ করিলেন।

৮ই অক্টোবর, ১৯৬২।

আজ মহাষ্টমী। এখানে পূজা ভাল ভাবেই চলিতেছে। এখানে নিতাইয়ের পৈতৃক বাড়ীতেও শতচণ্ডী চলিতেছে। আজ সে উপলক্ষে সেখানে কুমারী পূজা। মাকে সে পূজায় নিয়া আসা হইল। পরে আরো কয়েক জায়গায় এবং ভবানীর বাড়ীতে ঘুরিয়া মা রেথার বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

৯ই অক্টোবর, ১৯৬২।

আজ নবমী। পূজা চলিতেছে। পূজার পরে ভোগ নিয়া মা রঞ্জিতের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। এই পূজার তিন দিন ধরিয়াই মা ভবানী ও রঞ্জিতের বাড়ীতে গিয়া বিশ্রাম করেন। ভবানীর ছেলে অজয় এবার ওর মা বাবাকে বলিয়াছিল,—"মা এবার আমাদের বাড়ীতে পূজা কর, তবে মা আসবেন।" ভবানী ভাবিল, "একবার ৺দুর্গাপূজা করা অর্থাৎ উপর্যুপরি তিনবার ৺দুর্গাপূজা করা। সে সামর্থ্য কোথায়?" কাজেই মা তাহার মনোবাঞ্ছা ঐ ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন। মা যে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু।

১০ই অক্টোবর, ১৯৬২।

আজ বিজয়া দশমী। মা সকালে ঠাকুরকে সিন্দুর পরাইয়া দিলেন। তারপরে বিসর্জ্জনাদির সব ব্যবস্থা করিয়া মা আগরপাড়া আমাদের আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

১৪ই অক্টোবর ১৯৬২।

আজ লক্ষ্মীপূজা, এবার আমাদের আগরপাড়া আশ্রমে মা'র উপস্থিতিতে লক্ষ্মীপূজা হইতেছে। বিরাট আয়োজন। একে লক্ষ্মীপূজা তদুপরি মায়ের উপস্থিতি, আশ্রম লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের অট্টালিকায় ঢুকিতেই, সামনেই বারান্দা তাহাতে বহু পদ্মফুল দিয়া একটী বিরাট আকারের পদ্মফুল তৈয়ারী করিয়া রাখা হইয়াছে। আশ্রমের প্রেসিডেন্ট ডাঃ সর্বাধিকারী মাকে বিশেষ অনুরোধ করায় মা সেই পদ্মফুলটীর উপর একটু বসিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী মায়ের রূপ যেন তাহাতে ঝলসিয়া উঠিল। অপূর্ব সুন্দর। ক্রমে পূজা হইয়া গেলে, সকলে প্রসাদ পাইয়া বিদায় নিতে লাগিল। মা-ও উপরে চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতা আশ্রমে লক্ষ্মীপূজা।

আজই বৈকালে মা চলিয়া যাইবেন। মায়ের পরবর্তী প্রোগ্রাম এইরূপ স্থির হইয়াছে।

১৫	হইতে	২০শে অক্টোবর	—	হাজারীবাগ।
২০	,,	২৯শে ,,	—	রাঁচী।
৩০	,,	১৭ই নভেম্বর	—	দিল্লী।
১৮	,,	২৮শে ,,	—	দেরাদুন, হরিদ্বার।

মা ঐ প্রোগ্রাম অনুসারে ঘুরিতেছেন। সঙ্গে কয়েকজন আছে। এই ঘোরাঘোরিতে মায়ের বিশ্রাম একেবারেই হইতেছে না। মায়ের শরীরের জন্যই চিন্তা হয়।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৬২।

আজ মা হরিদ্বার হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে মায়ের অনুমতি অনুসারে মাইশোরের রাণী তাঁহার মাতার কল্যাণে ভাগবৎ পাঠ করাইবেন। আবার এখানে শান্তার বাবা-মা, গীতাজয়ন্তীও করাইবেন। গীতা

বৃন্দাবনে মায়ের উপস্থিতিতে গীতাজয়ন্তী।

জয়ন্তী হইবে ৭ই ডিসেম্বর। মা এখানে আসিয়া তাহার সব আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬২।

আজ ভাগবতের ৫ম দিন আর গীতাজয়ন্তীর আরম্ভ। খুব সুন্দর ভাবেই সব হইতেছে। আজ সকাল ১১ টায় আসিয়া মা নিতাই গৌর মন্দিরের জগমোহনে আসিয়া বসিলেন। নানান কথা প্রসঙ্গে মা বলিতে লাগিলেন,—"সৎ অনুষ্ঠান যে করায় এবং যারা তাতে যোগ দেয়, উভয়েরই শক্তি ও তেজ বাড়ে। এই যে কিছুটা সময় তাহারা খেয়াল অন্যদিকে দিতে পারে না, এই যে এত ঘণ্টা নিয়মিত ভাবে বসা, সংযমিত খাওয়া এতে শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যেমন যে ডাক্তার বা ইন্‌জিনিয়র তার ঐ দিকে কাজ করতে করতে ঐ সব কাজে মাথা খুলে যায় বা প্রোফেসর বছরের পর বছর পড়াতে পড়াতে ক্রমে আরো ভালো পড়ান।

কিন্তু যদি নিজের অজ্ঞাতসারে মনের ভেতর কাহারো প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব, রাগ বা অভিমান থাকে তবে এই যে নিষ্কণ্টক পথে, ভাগবৎ ভাব নিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা, তাতে যেন কাঁটা ফুটে থাকে অর্থাৎ বাধা পড়ে।

"তোমরা এ পথে এসেছো—সবার সঙ্গে মৈত্রীভাব রাখা। সাম্যভাব, সত্যভাব রাখা—কারো সঙ্গে বিরোধ ভাব না রাখা।"

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬২।

আজ ভাগবৎ সপ্তাহ ও গীতাজয়ন্তীর সমাপ্তি দিন। মা এইজন্য সকাল হইতেই ব্যস্ত। একই সঙ্গে এতগুলি অনুষ্ঠানের পারিপাট্য একা

মায়ের দ্বারাই সম্ভব। প্রায় অখণ্ড ভাবেই প্রোগ্রাম চলিতেছে—বিগত তিন দিন ধরিয়া। সকালে মূল ভাগবৎ পাঠ। একটা ভাগবৎ পাঠ হইতেছে মহাপ্রভুর মন্দিরের হ'লে, ইহা ছাড়াও এখানে আরো দুইটী ভাবগৎ পাঠ হইতেছে। একটি করাইতেছে জটুর দাদা তার স্ত্রীর কল্যাণার্থে, আর অপরটী করাইতেছে উষার মেয়ে রেণুকা তার কন্যার আত্মার সদগতি ইচ্ছায়। এই দুই ভাগবতের মূল পাঠ হইতেছে গীতাভবনে। ব্যাখ্যা হইতেছে বৈকালে। মাইশোরের পাঠক ভক্তমালজী পাঠ চালাইতেছিলেন। তাঁহার গলার স্বর প্রায় ২ দিনেই ভয়ানক ভাঙ্গিয়া গেল এমন ভাবে যে কথা প্রায় বোঝাই যাইতেছিল না। অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া মা'র কাছে বলা হইল। আশ্চর্যের বিষয়, সকাল বেলা মা'র নিকট এ কথা বলা হইল, আর দুপুর বেলা হইতেই পাঠকের গলা একেবারে স্বাভাবিক হইয়া গেল। বুঝাই যায় না যে ইহার গলা এই কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও এত খারাপ ছিল।

গীতা-জয়ন্তীর উৎসবও মন্দিরের জগমোহনে হইতেছে। মা ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতি জায়গায়ই কিছু সময় উপস্থিত থাকিতেছেন। গীতাপূজা বাটুদা করিতেছেন।

ওদিকে আবার দুপুর বেলা মা'র বাড়ীর সামনে রাসলীলা হয়। বিকালে গীতা ও ভাগবৎ ব্যাখ্যা চলে। সমস্ত আশ্রমটীই যেন ভাগবৎ পরিবেশে ভরপুর হইয়া গিয়াছে।

আজ ভাগবৎ পাঠ শেষ হইয়া গেল। আগামীকাল পূর্ণাহুতি হইবে। গীতাজয়ন্তীরও আজ ১৮ অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত হইল, তাহার পর পূজা ও আরতি হইল। শ্রদ্ধেয় গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের রীতি অনুযায়ী ১৮টী থালায় ১৮ রকম ফল, মেওয়া বিবিধ প্রকারের মিষ্টান্ন সাজাইয়া দেওয়া হইল। ১৮টী প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক একটা প্রদীপ ও এক একটা নৈবেদ্য এক একটী অধ্যায়ের জন্য নিবেদিত। এই বিরাট ব্যাপার মায়ের উপস্থিতিতে অতি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬২।

গীতা জয়ন্তী শেষ হইয়া গিয়াছে। এখনো নিত্য রাত্রিতে মায়ের কথা অনুসারে দিদিমার ঘরে পৌন ঘন্টা ভাগবৎ পাঠ হয়, মা-ও আসিয়া বসেন।

প্রথম কয়েকদিন পাঠ করিলেন নারায়ণ স্বামী, এখন বাটু পাঠক।

একদিন পাঠের পরে মায়ের মুখে আমলকী দেওয়া হইতেছে দেখিয়া বাটু বলিল,—"ঋষিরাও আমলকী খাইতেন।"

মায়ের মুখে মায়ের সাধনার খেলার কথা

মা এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"বাবার মুখে নতুন কথা শোনা গেলো। খেয়াল হলে, আমলকিই খাব।"

এই প্রসঙ্গেই মা বলিতে লাগিলেন,—"এ শরীরের সাধনার খেলার সময় এমনই হয়েছিল। কৃচ্ছ সাধনার ফলে যেমন ঋষিদের কৃশ শরীর হয়ে যেতো, সেরূপ এ শরীরও অস্থিচর্ম্মসার; কিন্তু কোন ক্লান্তি নাই, হাঁফ ধরা নাই। সোমবার ও বৃহস্পতিবার শুধু আহার, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় খাওয়া।"

মায়ের মুখে মায়ের সাধনার খেলার কথা।

এই কথা শুনিয়া বাটু বলিল, মহাভারতে পড়েছি কোন কোন ঋষি মাসান্তরে, পক্ষান্তরে আহার করতেন।"

মা বলিলেন,—"কেউ হয়ত বলবে মা মহাভারত পড়ে এ সব করতেন।"

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬২।

আজ সকালে কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—"এ শরীর আগেও যা পরেও তা—মাঝে তোমাদের জন্য তোমরা খেলিয়ে নিচ্ছ। একটা স্থিতি গেছে যখন মাটীতে শোয়া, আর খাটে শোওয়ার তফাৎ

বোধই থাকত না। পরমার্থ কথায় ও ব্যর্থ কথায় বিশেষ ভেদ মনে হত, এমন কি জাগতিক আলাপ শুনলে বিদ্যুতের শকের মত এ শরীর অবশ হয়ে যেতো।"

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬২।

আজ মা'র সাধনার খেলার কথা উঠিলে, মা বলিলেন,—"অন্ত, অনন্ত। শরীরের ওপর দিয়ে অন্ন গ্রহণেরও বহু খেলা গিয়েছে। একবার খেয়াল হ'ল তিন দানা অন্ন গ্রহণ। ঐ সময় যদি চার দানা অন্ন মুখে দেওয়া হ'ত তবে ঠিক ফেলে দেওয়া হ'ত।"

"আবার একটা স্থিতি গেছে, 'মাটিতে শোওয়া আর গদিতে শোওয়া একদম বরাবর। শীত উষ্ণ বরাবর। শীতে রোদে পড়ে থাকলেও শরীর রোদের তেজ নিত না।

"আবার একটা স্থিতি গেছে যখন পরমার্থ বিষয় ও ব্যর্থ বিষয় শোনার মধ্যে কোন প্রভেদই ছিল না।"

আবার একটা স্থিতিতে অন্ত ও অনন্ত অন্ন গ্রহণেরও পার্থক্য নাই। "আউর লাও" "আউর লাও" বলে ২-১/২ মন দুধের পায়েসও সে অবস্থায় খাওয়া সম্ভব।

"আবার একটা অবস্থাতে রূপ-রস—গন্ধ-স্পর্শ—কিছুরই বোধ নাই। মুখে মাছি মশা বসেছে, তাড়ানর দিক নাই। স্পর্শ বোধই নাই। এ অবস্থায় এ শরীরের উপর দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে পিঁপড়া চলে যেতো।"

"আবার একটা অবস্থায় এই শরীরের কাপড় বদলান ২/৩ দিন অন্তর অন্তর হইত। নক্ষত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকত। তখন ২ সেট কাপড় জামাও ছিল না—১ সেট কাপড় বালিশের কাজ করিত।"

"আঙ্গুলের নখ নিজে কখনো ফেলা হয়েছে কিনা সন্দেহ, দিদি এসে তবে নখ ফেলে দিত।"

"গাছ থেকে ফল ছিঁড়লে গাছের কষ্টটা এ শরীরে বিঁধত। এ কারণে টক্ আম, লিচু জলপাই, যা ঝড়ে পড়ে থাকত গাছের নীচে, তাই খাওয়া হত।"

"আর এ ভাবে ২।১ দিন নয় ৯ বছর চলেছে।"

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৬২।

এইবার বেশ কিছুদিন মা বৃন্দাবনে রহিয়া গেলেন। আজ মা হরিদ্বার যাইবেন। সেখানে আমাদের আশ্রমের প্রবীণ সাধু ছোট শংকরানন্দ স্বামিজী সম্প্রতি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার ভাণ্ডারা হরিদ্বারে হইবে এই কারণেই মা হরিদ্বার যাইতেছেন। সেখান হইতে দেরাদুন হইয়া পুনরায় বৃন্দাবনেই আসার কথা হইল। দ্বিপ্রহরে ভোগের পরে মা হরিদ্বার রওনা হইয়া গেলেন।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬২।

আজ মা হরিদ্বার-দেরাদুন ঘুরিয়া পুনরায় বৃন্দাবন আসিয়া পৌছিলেন। এখানে কয়েকটা দিন থাকিয়া মা বম্বে যাইবেন এইরূপ কথাই হইয়াছে।

———

LIST OF PUBLICATIONS

BENGALI

Mātri Darshan—"Bhaiji"	3 00
Sad Vani	1·50
Amar Vani	10·00
Mātri Vani	0·75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	
Vol. I to XV	41·50
Akhanda Mahayajna	2·50
Kirtan Rasa Swarupa	6·00
Matri Lila Sankirtan	0·30
Anandamayi Ma—'Ganga Samiran'	2·50
Namavali	0·50
Shree Shree Ram Gita	2·00
Vivek Churamani	3·50

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji" (New Edn.)		6·00
Mother as Seen by Her Devotees		5·50
"	(Rexin bound)	6·50
Matri Vani (Sayings) 2·00	(Board Bound)	2·50
Words of Sri Anandamayi Ma 5·50	(Rexin bound)	7·50
From the Life of Sri Anandamayi Ma		10·00

PHOTOS

Photos—Various sizes ranging from	0·50 to 36·00
Lockets	Re. 1/- and Rs. 6/-

To be had of :

The General Secretary

Shree Shree Anandamayee Sangha

Bhadaini, Varanasi-1 (U. P.)

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
"আনন্দবার্ত্তা"
নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়ান

'আনন্দবার্ত্তা' বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী এই তিন ভাষায় পৃথক পৃথক্ ভাবে একই সময়ে প্রকাশিত হয়। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা — জেনারেল সেক্রেটারী, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ, ভাদৈনী, বারাণসী-১

* বার্ষিক চাঁদার হার *

কেবল বাংলা সংস্করণ (ভারতে)— ৭৲ টাকা (ডাক ব্যয় সহিত)
বাংলা ও ইংরাজী উভয় সংস্করণ (ভারতে)— ১১৲ টাকা ,,
বিদেশে—(সি মেলে) — ১০৲ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১৫ শিলিং অথবা ২ ডলার
—(এয়ার মেলে) — ২৫৲ টাকা অথবা ১ পাউণ্ড ১০ শিলিং (ইউরোপ)
— ,, — ৩৫৲ টাকা অথবা সাড়ে পাঁচ ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

লেখিকা—ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া দেবী

১৯৫০ সন হইতে সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসর কাল শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য একমাত্র লেখিকার জীবন ভিন্ন খুবই বিরল। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে লেখিকার ব্যক্তিগত ডায়েরী পুস্তকাকারে এই পর্য্যন্ত ষোড়শভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের নানা কাহিনী, নানা সূক্ষ্ম দর্শনাদির বিবরণ, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং শ্রীমুখনিঃসৃত নানা অমূল্য উপদেশাবলীর সমষ্টি লইয়া এই সকল ভাগের রচনা। ভক্তবৃন্দের নিকট এই সকল পুস্তক এক অমূল্য সম্পদ।

[মূল্য ১ম ভাগ হইতে ষোড়শ ভাগ]
একত্রে—৪৫.৫০ টাকা